এমফিল অভিসন্দর্ভ

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০)"

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এমফিল গবেষক

মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
রেজি নং : ১৫০/২০০৯-২০১০
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এমফিল অভিসন্দর্ভ আগস্ট,২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমফিল গবেষক জনাব মুহাম্মদ খোরশেদ আলম কর্তৃক দাখিলকৃত "বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথায়ও এবং কোন ভাষাতে এমফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এমফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন

তত্ত্বাবধায়ক এবং অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাক্ষর : ____________________

তারিখ : ১২.০৮.২০১৫

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, “বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০)” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম যা অধ্যাপক ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ইতঃপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লাভ করার বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়নি।

স্বাক্ষর :

তারিখ : ১২.০৮.২০১৫

মুহাম্মদ খোরশেদ আলম

এমফিল গবেষক

রেজি নং : ১৫০/২০০৯-২০১০

শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়

বাবা মুহাম্মদ আবদুল খালেক ও

মা আয়েশা বেগম এর উদ্দেশে,

যাদের দোয়া ও অকৃত্রিম ভালবাসার

ডোরে বাঁধা আমার এ জীবন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যার অশেষ মেহেরবানীতে এ অভিসন্দর্ভটি লেখা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন ম্যামের প্রতি। আল্লাহর মেহেরবানী, ম্যামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ছাড়া এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন ম্যাম কর্তৃক গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ ও এর যাবতীয় বিষয়ে গাইড লাইন না পেলে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা ছিল সত্যিই খুব দুরূহ। কেননা যে আবেগ-উচ্ছাস ও প্রত্যাশা নিয়ে এম.ফিল গবেষণা কর্মটি শুরু করেছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে মনে হয়েছে গবেষণার পরিধি আসলে অনেক ব্যাপক, অনেক বেশী কঠিন। তাছাড়া গবেষণার যোগ্যতায় আমি বলতে গেলে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। বিভিন্ন লাইব্রেরী, সেমনিার থেকে শুরু করে তথ্য প্রাপ্তির সুদীর্ঘ দৌরাত্ম গবেষণার পরিধি নির্ধারণে জটিলতায় বার বার মনে হয়েছে আর বুঝি সামনে এগোনো সম্ভব নয়। তবে এই সম্ভব অসম্ভবের দোলাচলের মাঝ থেকে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীন ম্যামের অকুণ্ঠ সাহায্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক দিক নির্দেশনাতে অনেক আশান্বিত হয়েছি। শুরু থেকেই শেষ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় তার বহুমুখী দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মাঝেও আন্তরিকতার সাথে, মাতৃস্নেহে তত্ত্বাবধান, উপদেশ, নির্দেশ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, শাসন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সার্বিকভাবে পান্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে সহায়তা করেছেন। প্রিয় এ শিক্ষকের কাছে আমার এ ঋণ অতুলনীয় অপরিশোধ্য।

আমি কৃতজ্ঞ আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মুহাম্মদ আবদুল খালেক ও মা আয়েশা বেগম এর প্রতি যারা আমার গবেষণা কর্মের মূল অনুপ্রেরণাদানকারী, যারা আমাকে প্রতিনিয়ত এই কর্মের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস যুগিয়েছেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, যারানানাবিধ মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, যাদের প্রত্যেকের নাম এ ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

গবেষণা কাজে ব্যবহৃত লাইব্রেরী এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী,

Dhaka University Institutional Repository

বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, এডাব লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের সহায়তায় আমি কৃতার্থ।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার পরিবার পরিজনের কাছে যারা কেবলমাত্র আমার গবেষণা কর্মের স্বার্থে নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাদের ত্যাগ ও সহযোগিতা না পেলে গবেষণার এ কাজে পা বাড়ানো আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না।

সর্বোপরি মহান আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করে সবার জন্য দোয়া করছি যারা আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম

সারাংশ

"আমাদের রাজনীতির আকাশ এখন ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। এ মেঘে যে বর্ষণ হবে তা হবে গাঢ় গভীর এবং জনজীবনে ঝড় বন্যার মতো আনবে বিপর্যয়। এতে কেবল অর্থ সম্পদ বিনষ্ট হবে না, প্রাণহানীও হবে অনুমানাতীত। যা চলছে, সত্য কথা বলতে কি তা রাজনীতি নয়, নিতান্ত রেষারেষি এবং জেদাজেদি মাত্র। দুপক্ষেরই অব্যক্ত সঙ্কল্প 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমতার দন্ড'। .... রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার রাজনীতিতেই আসক্ত। গদি দখল করে এমনকি সাংসদ হয়ে ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট অর্জন করে সপরিবারে ও স্বজন-সমাজে অর্থ-সম্পদে পদে-পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়াই এদের লক্ষ। তারা দেশপ্রেমী বা জনদরদী নন, তাদের আদর্শে-উদ্দেশ্যে-নীতিতে-বিবেচনায় গণমানবের স্বার্থ ঠাঁই পায় না। বিরোধী দলগুলো ও সরকারি দল যদি এমনি জেদাজেদি করতে থাকে, তা হলে পরিণাম হবে মারাত্মক সবারই পক্ষে (গণতন্ত্রের পক্ষে)"[১]

আহমদ শরীফ

গণতন্ত্র এমন একটি আদর্শ ব্যবস্থার নাম যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারসহ সর্বপ্রকার অধিকার সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেও জনগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারছে না। এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায় সরকার ও বিরোধী দলের সাঁপে-নেউলে সম্পর্ক গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে রুখেই দিচ্ছে না বরং এর মূল্যবোধ ও বিশ্বাসগুলোকে গলাটিপে হত্যা করছে। গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের সাথে গণতান্ত্রিক চেতনা-বিশ্বাস-মূল্যবোধ অপরিহার্য শর্ত যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপস্থিত। এই মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ গণতন্ত্রের সূতিকাগার ব্রিটেন। অথচ সেখানে লিখিত সংবিধান নেই। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা মূলত প্রথা ভিত্তিক। এসব প্রথার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এগুলো আদালতে বিচার্য নয়। তবুও এগুলোকে মান্য করা হয়। কেন মান্য করা হয়? এর পিছনে কি কারণ নিহিত আছে? এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা। শেষ পর্যন্ত পন্ডিতরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এটি ব্রিটিশ জাতির ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রশ্ন। ব্রিটেনের জনগণ মনে

[১]শরীফ, আহমদ, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা রাজনীতির সঙ্কট, মহাকাল, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৬৪।

করে প্রথাগুলো সমাজের জন্য কল্যাণকর। তাই কেউ এগুলো ভঙ্গ করার চিন্তাও করে না। যদি কেউ করে তাহলে জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আহত হয়।

গণতন্ত্র তথা সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও আন্দোলন দীর্ঘ দিনের। **১৯৭১** সালের স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিা লাভের পর বাংলাদেশর জনগণ প্রত্যাশিত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই প্রথম যাত্রা শুরু করে। কিন্তু **১৯৭৫** সালের **২৫** জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে **১৯৭৭** সালের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হলেও **১৯৮১** সালের সামরিক অভ্যূত্থানের ফলে আবার গণতন্ত্রের যাত্রা রুদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর দীর্ঘ আন্দোলনের পর **১৯৯১** সালে অবাধ, নিরেপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সম্মিলিত ভাবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণ করতে গিয়ে সংসদের ভেতর ও বাইরে রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেটিই ছিল এ দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ভিত্তিমূল। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থায়ীভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের পথে আরেক ধাপ অগ্রগতি হয় বাংলাদেশের। তারপর **১৯৯৬** সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং ২০০১ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে অষ্টম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন **চারদলীয় ঐক্যজোটের** সরকার ক্ষমতায় আসে। ২০০৮ এর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন **মহাজোট** সরকার। রাজনীতির এ পালাবদলেরর মাঝে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জোট যাই হোক মূলত প্রধান দুটি দলই ক্ষমতায় এসেছে এবং কোনো দলই সংসদীয় রাজনীতির মৌলিক চেতনা ও বিশ্বাসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল না । যে কারণে গণতন্ত্র বিকাশের পথকে কুলষিত করেছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন দোষে। ফলশ্রুতিতে জনপ্রতিনিধিগণ ব্যহ্যত নিবার্চিত সেবক হলেও কার্যত শাসক-শোষক, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি আর লোভ-লাভে-স্বার্থ-বিত্ত-বেসাত অর্জনকারী প্রভুমাত্র[২]। আমাদের রাজনৈতিকগণ ক্ষমতার গদী দখলের লক্ষ্যেই প্রধানত রাজনীতির আসরে নামেন। এতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন হয় বটে কিন্তু তাদের দ্বারা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়নি এবং সরকার ও বিরোধী দলও গণতন্ত্র তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশ প্রক্রিয়ায় তেমন সুসামঞ্জস্যশীল ভূমিকা পালন করতে অদ্যবদি সক্ষম হয়নি। তবে আমাদের দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও ভোটতন্ত্র মজবুত ভিতের উপর দাড়িয়ে আছে যা ক্ষমতা দখলের ব্যয়বহুল একটি সহজসাধ্য উপায়।

[২] শরীফ, আহমদ, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা রাজনীতির সঙ্কট, মহাকাল, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৬৪

এর জন্য প্রার্থীর কোনো নৈতিক আদর্শিক চারিত্রিক গুণ গৌরবের কিংবা পরিচিতির প্রয়োজন হয় না । অর্থ ও দলের সমর্থন থাকলেই ভোটযুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন হয় না। ফলে আমরা গণতন্ত্রের নামে এক প্রকার স্থুল ও অনুকৃত ভোটতন্ত্রকেই গণতন্ত্র হিসেবে উপহার পেয়েছি যা অনেকটা দইয়ের সাধ ঘোলে মেটানোর মত বা টবের গাছে বাগানের রূপ উপভোগের মত কৃত্রিম। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। গণতন্ত্র হলো অর্জন ও অনুশীলনের বিষয় যা আমাদের নেতা-নেত্রীদের এবং সরকার ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার মাঝে অনুপস্থিত। এর কারণ মূলত দু'টি;

১. আচরণগত বা সাংস্কৃতিক সমস্যা।

২. আদর্শিক বা সাংবিধানিক সমস্যা

গণতন্ত্র সম্পর্কে সরকারী দলের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনলে মনে হবে গণতন্ত্র ষোল আনাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপরপক্ষে বিরোধীদলের সমালোচনায় মনে হবে গণতন্ত্র আতুর ঘরে মৃত্যুবরণ করেছে। উভয়ের এরকম চরম প্রান্ত সীমায় অবস্থান এবং পরস্পর বিরোধীতা আচরণগত সমস্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র অথচ গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বশর্ত আইনের শাসন অথচ এর জন্য প্রয়োজনীয় বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা এখনও প্রশ্ন বিদ্ধ যা আদর্শ বা সাংবিধানিক সমস্যার উদাহরণ।

এরকম অসামঞ্জস্যশীল সরকার ও বিরোধীদলীয় সম্পর্কের টানাপোরনের পরিস্থিতিতেসুসামঞ্জস্যশীল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুণগত উন্নয়নের উপাদানগুলো নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণী ঃ ০১ [৩]

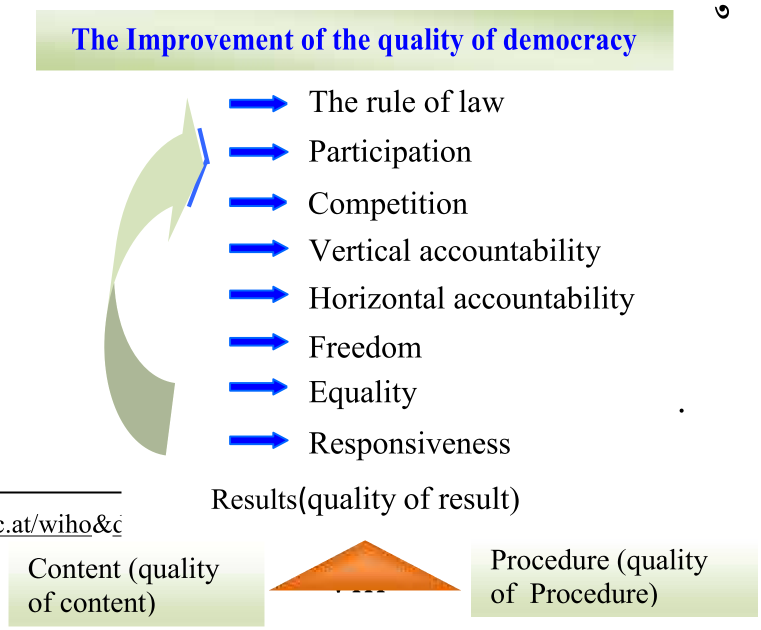

সূত্র: Diamond & Morline (2004). The quality of Democracy. An overview. Journal of democracy, 15 (4), 20-31. আলোকে প্রস্তুত।

[৩] http://www.nui-klu.ac.at/wiho&c

গণতান্ত্রিক বিকাশর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উভয়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি সরকারের জন্য একটি উপায়। চিত্রে সাহায্যে তুলে ধরা হলো:

সারণী ঃ ০২ [৪]

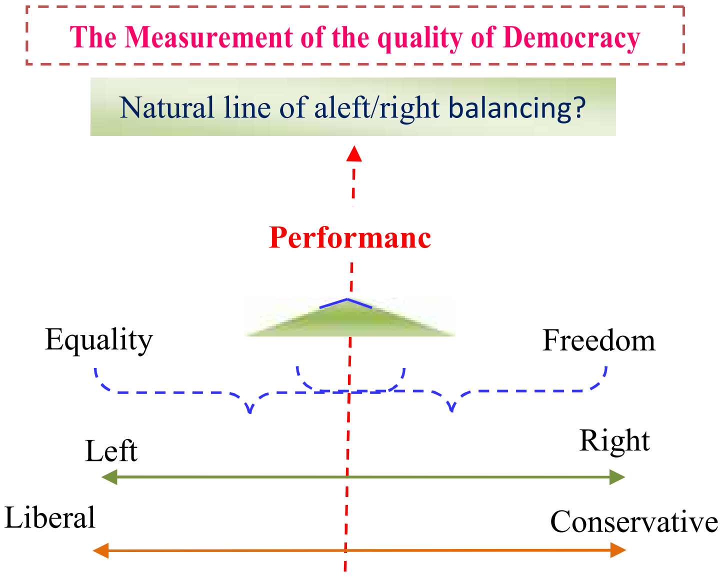

সূত্র: Campbell, David F. J. (2008) The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy. আলোকে প্রস্তুত।

গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা, পারস্পরিক সম্মানবোধ, যৌক্তিক ও গণমূখী দাবির প্রতি সমর্থনের সৎসাহস,পারস্পরিক আপোষকামি মনোভাব, দলের অভ্যান্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা, সংসদীয় রাজনীতির লালন, জাতীয় ইস্যু গুলোতে সরকারের একচেটিয়াত্ব বর্জন, সরকারের দমননীতির পারবর্তে নমনীয়তা গ্রহণ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অহেতুক বিরোধতা করার মনসিকতা পরিহার করে গঠনমূলক সমালোচনা সচেষ্ট হওয়া ও সর্বপোরি সংসদের প্রাধান্য এবং রাজনৈতিক দলসমূহের সময়োচিত, সুচিন্তিত পদক্ষেপ এবং সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা এ দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে

[8] প্রাগুক্ত।

পারে এবং রাজনৈতিক দলগুলো যদি চলনে-মননে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারে তাহলে এ দেশে সংসদ-সংসদীয় ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ কোনোভাবে সম্ভবপর হবে না। সারাংশ হলো সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার পথ অনুসরণ করে আসবে গণতান্ত্রিক বিকাশ তথা পূর্ণতা। অর্থ্যাৎ ঃ–

Quality of Politics = Quality of Democracy

বাংলাদেশের মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ ভবন

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

সূচি		পৃষ্ঠা নং
ক.	প্রত্যয়নপত্র	I
খ.	ঘোষণা পত্র	II
গ.	উৎসর্গ	III
ঘ.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	IV
ঙ.	সারাংশ	VI
চ.	বাংলাদেশের মানচিত্র	X
ছ.	জাতীয় সংসদ ভবন	XI
জ.	সূচিপত্র	XII
ঝ.	সারণী	XIX

প্রথম অধ্যায়			পৃষ্ঠা নং
	গবেষণা বিষয়ক		১-১১
১.১	ভূমিকা		২
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য		৫
১.৩	গবেষণার পদ্ধতি		৫
	(ক)	ঐতিহাসিক পদ্ধতি	৫
	(খ)	তুলনা মূলক পদ্ধতি	৫
	(গ)	ডকুমেন্ট স্টাডি	৬
	(ঘ)	ইন্টারনেট ব্যবহার	৬
	(ঙ)	দেশী বিদেশী পুস্তক ও সাহিত্য পর্যলোচনা	৬
	(চ)	পত্রপত্রিকা ব্যবহার	৭
১.৪	গবেষণারসময়কাল		৭
১.৬	অনুমান গঠন		৭
১.৭	গবেষণারযৌক্তিকতা		৮
১.৮	গবেষণা সমস্যা		১০
১.৯	গ্রন্থপঞ্জি		১১

দ্বিতীয় অধ্যায়			পৃষ্ঠা নং
বাংলাদেশের পরিচিতি			১২-১৮
২.১	প্রাচীন বাংলাদেশের পরিচিতি		১৩
২.২	প্রাচীন বাংলার প্রকৃতি		১৩
	(ক)	প্রাচীন বালার ভৌগলিক অবস্থান	১৩
	(খ)	বাংলার প্রাচীন জনপদ	১৩
	(গ)	অখন্ড বাংলার আত্মপ্রকাশ	১৪
	(ঘ)	প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক গতি-ধারা	১৪
২.৩	স্বাধীন বাংলাদেশের পরিচিতি		১৫
	(ক)	বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাম	১৫
	(খ)	বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন	১৬
	(গ)	ভৌগোলিক সীমানা ও অবস্থান	১৬
	(ঘ)	বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	১৬
	(ঙ)	বাংলাদেশের জলবায়ু	১৭
	(চ)	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১৭
	(ছ)	বাংলাদেশের নদ-নদী	১৭
২.৪	বাংলা নামের উৎপত্তি		১৮
	(ক)	মোগলপূর্ব আমল	১৮
	(খ)	মোগল আমল	১৮
	(গ)	ইংরেজ শাসনামল	১৮

তৃতীয় অধ্যায়			পৃষ্ঠা নং
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি			১৯-৩০
বাংলাদেশের অভ্যুদয়			২০
৩.১	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ		২০
	(ক)	লাহোর প্রস্তাব	২০

	(খ)	ভাষা আন্দোলন	২১
	(গ)	পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় গণপরিষদ	২১
	(ঘ)	১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন	২২
	(ঙ)	১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল	২২
	(চ)	১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন	২২
৩.২	বাঙ্গালীদের স্বাধীকার আন্দোলন		২৩
	(ক)	মৌকিল গণতন্ত্র ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচন	২৩
	(খ)	আঞ্চলিক বৈষম্য	২৩
	(গ)	অর্থনৈতিক বৈষম্য	২৪
	(ঘ)	প্রশাসনিক বৈষম্য	২৪
	(ঙ)	ছয় দফা কর্মসূচী	২৫
	(চ)	আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা	২৬
	(ছ)	ছাত্র সমাজের এগারো দফা	২৭
	(জ)	১৯৬৯ এর গণআন্দোলন	২৭
	(ঝ)	ইয়াহিয়ার শাসনামল	২৮
	(ঞ)	১৯৭০ সালেরনির্বাচনওফলাফল	২৮
৩.৩	স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়		৩০

চতুর্থ অধ্যায়			পৃষ্ঠা নং
	গণতন্ত্র		৩১-৫০
৪.১	উৎপত্তি ও বিকাশ		৩২
৪.২	গণতন্ত্র কি?		৩৪
৪.৩	গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য		৩৭
৪.৪	গণতান্ত্রিক সরকারের প্রকারভেদ		৩৮
	(ক)	বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র	৩৮
	(খ)	পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্র	৩৮
৪.৫	গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ		৩৯
৪.৬	গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী		৪১
৪.৭	গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে অন্তরায়		৪৩

পঞ্চম অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
	রাজনৈতিক দল ও বিরোধীদলীয় গতি-প্রকৃতি	৫১-৭১
৫.১	রাজনৈতিক দল	৫২
৫.২	রাজনৈতিক দলের পরিচয়	৫৩
৫.৩	রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য	৫৪
৫.৪	রাজনৈতিক দলের উৎপত্তিগত উৎস	৫৫
৫.৫	রাজনৈতিক দলের শ্রেণীভাগ	৫৬
৫.৬	রাজনৈতিক দলের উপাদান	৫৭
৫.৭	বাংলাদেশে দল ও বিরোধী দলীয় ব্যবস্থা	৫৭
৫.৮	বাংলাদেশে দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	৬৩
	(ক) দলীয় কাঠামোয় গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি	৬৩
	(খ) রাজনৈতিক সুবিধাবাদ	৬৩
	(গ) মনোনয়ন প্রক্রিয়া	৬৪
	(ঘ) অস্বচ্ছ দলীয় তহবিল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৬৪
	(ঙ) নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অভাব	৬৫
	(চ) প্রান্তিক নারী প্রতিনিধিত্ব	৬৫
	(ছ) পৃষ্ঠপোষক-অধস্তন সম্পর্ক	৬৬
	(জ) বহুদলীয় ব্যবস্থা	৬৬
	(ঝ) দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দিকে প্রবণতা	৬৭
	(ঞ) ব্যক্তি ও পরিবারিক প্রভাব	৬৭
	(ট) ফ্রন্ট সংগঠনের উপর নিভরশীলতা	৬৭
	(ঠ) জোটবদ্ধতা	৬৭
	(ড) দলত্যাগ প্রবণতা	৬৭
	(ঢ) ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল	৬৭
	(ণ) অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত	৬৮
	(ত) দলের মধ্যেই ভাঙন এবং ভাঙা দল থেকে নতুন দলের সৃষ্টি	৬৮
৫.৯	গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব	৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং

সরকার ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট			৭২-৯৪
৬.১	সরকার ব্যবস্থা		৭৩
৬.২	সরকার কি?		৭৩
৬.৩	সরকারের শ্রেণী বিভাগ		৭৪
৬.৪	বাংলাদেশের সরকার ও শাসনামল		৭৭
	(ক)	মুজিব শাসন আমল	৭৭
	(খ)	জিয়ার শাসন আমল	৭৯
	(গ)	এরশাদের শাসনামল	৮২
	(ঘ)	খালেদা শাসনামল ঃ ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৮ম সংসদ	৮৩
	(ঙ)	হাসিনা শাসনামল ঃ ৭ম এবং ৯ম সংসদ	৮৬
৬.৫	সরকারগুলোর নিকট জনগণের প্রত্যাশা , নিরাশার কারণ ও প্রাপ্তি		৮৯
	(ক)	জনগণের প্রত্যাশা	৮৯
	(খ)	জনগণের নিরাশার কারণ	৯১
	(গ)	জনগণের প্রাপ্তি	৯৪

সপ্তম অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
রাজনৈতিক সংস্কৃতি: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা		৯৫-১০২
৭.১	রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচিতি	৯৬
৭.২	রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ	৯৮
৭.৩	তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপ	১০০
৭.৪	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি	১০২

অষ্টম অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি ও প্রবণতা		১০৩-২৭৫
৮.১	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবাদ	১০৪

৮.২	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছবি ও ছবির রাজনীতি	১১০
৮.৩	সরকারি দল ও বিরোধী দল ঃ পারস্পরিক দোষারোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতি	১১৩
৮.৪	আইন শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি	১১৮
৮.৫	সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি	১২৩
৮.৬	রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও বাংলাদেশের রাজনীতি	১৩১
৮.৭	বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংসদ বর্জন সংস্কৃতি	১৩৭
৮.৯	বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র	১৪২
৮.১০	বাংলাদেশ রাজনীতিক সংস্কৃতি ঃ নির্বাচনে মনোনয়ন কেনা-বেচা	১৫০
৮.১১	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ নেতাদের গণতান্ত্রিক মনোভাব ও পরিভাষার অভাব	১৫৬
৮.১২	বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব	১৬০
৮.১৩	বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতিকদের দলবদলের রাজনীতি	১৬৭
৮.১৪	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সেনাবাহিনী	১৭০
৮.১৫	দলবাজি ও আমলাতন্ত্র	১৭৭
৮.১৬	বাংলাদেশে ব্যক্তিপ্রাধান্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি	১৮৪
৮.১৭	বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল	১৮৮
৮.১৮	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হরতাল	১৯১
৮.১৯	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাস	১৯৬
৮.২০	বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ বিভিন্ন স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষা	২০৬
৮.২১	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব	২১৩
৮.২২	বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব	২২০
৮.২৩	বাংলাদেশের জোট রাজনীতি	২২৫
৮.২৪	নামকরণ ও নাম কর্তনের রাজনীতি	২৪৬

৮.২৫	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি	২৫০
৮.২৬	জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিক গতিধারা	২৫৮

নবম অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দল সমূহের ভুমিকা ও দায়িত্ব		২৭৬-২৮২
৯.১	গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকার ও রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান যেমন হওয়া উচিত !!!!	২৭৭
৯.২	গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা	২৭৯
	(ক) সরকারি দলের সহনশীলতা	২৮০
	(খ) বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা	২৮০
	(গ) উভয়ের সার্বিক পালনীয় দায়িত্ব	২৮১

দশম অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
১০.১ উপসংহার	২৮৩

একাদশ অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
গবেষণা সহায়ক সমূহ		২৯০-৩১৮
১১.১	সহায়ক গ্রন্থাবলী	২৯১
১১.২	জার্নাল	৩০৯
১১.৩	নির্বাচনী ইশতিহার	৩১২
১১.৪	পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী	৩১৩
১১.৫	জরিপ,রিপোর্ট ও প্রতিবেদন	৩১৭
১১.৬	অভিধান এবং প্রবন্ধ	৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণী

সারণী	নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
সারণী	০১	The Improvement of the quality of Democracy	VIII
সারণী	০২	The Measuerment of the quality of Democracy	IX
সারণী	০৩	প্রাচীন বাংলার ভৌগলিক অবস্থান	১৩
সারণী	০৪	প্রাচীন বাংলার জনপদ	১৪
সারণী	০৫	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যয়ের বৈষম্য	২৪
সারণী	০৬	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশাসনিক বৈসম্য	২৫
সারণী	০৭	পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল (পূর্ব পাকিস্তান)	২৯
সারণী	০৮	পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল (পশ্চিম পাকিস্তান)	২৯
সারণী	৯	রাজনৈতিক দলে নারী অবস্থান	৬৫
সারণী	১০	এ্যারিস্টটল এর সরকারের শ্রেণীবিভাগ	৭৪
সারণী	১১	লিকক এর শ্রেণী বিভাগ	৭৫
সারণী	১২	আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সরকার শ্রেণীবিভাগ	৭৬
সারণী	১৩	বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ	৭৬
সারণী	১৪	তিন বছরে বাংলাদেশে সহিংসতার চিত্র	১২২
সারণী	১৫	২০০২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী খাত ওয়ারী দুর্নীতি তথ্য	১৩২
সারণী	১৬	টিআইবি পরিচালিত ২০০৫ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী খাতওয়ারী দুর্নীতির তথ্য	১৩৪
সারণী	১৭	দুর্নীতির বিভিন্ন ধরণ	১৩৫

সারণী	১৮	জাতীয় সততা ব্যবস্থা	১৩৬
সারণী	১৯	সংসদে বিরোধী দলের ওয়াক আউট	১৩৯
সারণী	২০	নবম সংসদের সদস্যদের শিক্ষারমান	১৫২
সারণী	২১	নবম সংসদের সদস্যদেরপেশাগত প্রতিনিধিত্ব	১৫২
সারণী	২২	বাছাইকৃত পাঁচটি সংসদে পেশাগত প্রতিনিধিত	১৫৩
সারণী	২৩	পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নমব জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	১৬৪
সারণী	২৪	নবম জাতীয় সংসদ সদস্যদের পেশা	১৬৫
সারণী	২৫	বাছাইকৃত পাঁচটি সংসদে পেশাকৃত প্রতিনিধিত্ব	১৬৫
সারণী	২৬	বাংলাদেশে হরতালের একটি সমীক্ষা (১৯৯১ হতে ২০১৩ মার্চ পর্যন্ত)	১৯৩
সারণী	২৭	জঙ্গীদল কর্তৃক হত্যার পরিসংখ্যান	১৯৭
সারণী	২৮	বিচার বহির্ভূত হত্যা কান্ডের শিকার	২০৩
সারণী	২৯	আখতার হোসনের জোট চিত্র	২২৫
সারণী	৩০	গোলাম মোস্তফার জোট	২২৬
সারণী	৩১	বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে জোট	২২৬
সারণী	৩২	১৯৫৪ সালের নির্বাচনের জোট ও দলওয়ারী ফলাফল	২২৮
সারণী	৩৩	১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল	২২৯
সারণী	৩৪	১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল	২৩০
সারণী	৩৫	১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	২৩০
সারণী	৩৬	বিভিন্ন সময় নাম বদলের ধরণ	২৪৮
সারণী	৩৭	তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থান ও কর্মসম্পাদন	২৫৫
সারণী	৩৮	এক নজরে ১৫টি নির্বাচন	২৬০
সারণী	৩৯	১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল *(দলীয় অবস্থান)	২৬১
সারণী	৪০	১৯৮৯ সালের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)	২৬৩
সারণী	৪১	১৯৮৬ সালের তৃতীয় সংসদ নির্বাচন, দলীয় অবস্থান	২৬৪
সারণী	৪২	১৯৮৮ সালের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন, দলীয় অবস্থান	২৬৫
সারণী	৪৩	১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)	২৬৬
সারণী	৪৪	১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন	২৬৮
সারণী	৪৫	১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)	২৬৯
সারণী	৪৬	২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নিবার্চনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)	২৭০
সারণী	৪৭	২০০৮ সালের নবম সংসদ নিবার্চনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)	২৭২
সারণী	৪৮	আদর্শিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মডেল	২৮২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা

æEverybody's for democracy in principle it's only practice that the thing give rise to stiff objections"

(Meg Greenfield)

প্রতিটি গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতেই সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলো বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দলের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তাত্ত্বিক বিচারে বিরোধী দল হচ্ছে সরকারেরই একটি অংশ। সরকারকে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা। সংসদের কাছে জবাবদিহি করা, সরকারের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরে সরকারের বিরোধী জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব হচ্ছে বিরোধী দলের। অপর দিকে সরকারী দলের দায়িত্ব হলো সরকারের প্রতিটি কর্মসূচী ও সিদ্ধান্তের সাথে বিরোধী দলগুলোকে তাদের ভূমিকা রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনের ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। যাত্রাটা শুরু হয়েছিল গণতন্ত্র-বিনির্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু সেই গণতন্ত্র বার বার মুখ থুবড়ে পড়েছে। ১৯৯১ সালের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী- পাশের মধ্যে দিয়ে যে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ রীতিমত প্রশ্নের সম্মুখীন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সরকার এবং বিরোধী দলেরর মাঝে সমঝোতা যেখানে প্রয়োজন, সেখানে বাংলাদেশে এই সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে দুরুত্বের, যা সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর ও স্থায়ী ভিত্তি দিতে কোন ভূমিকা পালন করছে না, প্রশ্ন হচ্ছে এই রাজনীতি কি ন্যায় সঙ্গত? সমর্থনযোগ্য? এই রাজনীতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে কতটুকু রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হবে ? এসব কিছু বিশেষণের নিমিত্তে বর্তমান গবেষণার বিষয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ার সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০)।

গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য যে সব জাতির খ্যাতি রয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধিকার, স্বাধীনতা, এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব জাতি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং রক্ত দিয়েছে সে সব দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম শ্রদ্ধার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে মূলত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

১. বিট্রিশ পদ্ধতির সংসদীয় গণতন্ত্র

২. রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ ধারা বিশেষণ করলে দেখা যায় এদেশের মানুষ যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করেছে তা হলো সংসদীয় গণতন্ত্র বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা। এর ঐতিহাসিক কারণ হলো বাংলাদেশের এবং উপমহাদেশের অপর দুটি প্রধান রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানে সুদীর্ঘ কাল ব্রিটিশ শাসনের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে বিট্রিশ গণতন্ত্রের ধারণাটি লাভ করে। এই ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের মানুষ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে এবং এটি তুলনা মূলক অধিকতর বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য।

১৮৫৭ সালে এই উপমহাদেশের জনগণের দ্বারা প্রথম প্রতিরোধের কবলে পতিত হয়ে বিট্রিশ সরকারের উপলব্ধি হয় যে, ধাপে ধাপে শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্য কে সামনে রেখেই ১৮৬১,১৮৯২,১৯০৯, ১৯১৯ এবং সর্ব শেষ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। উলেখিত আইনগুলোতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করারই প্রয়াস নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিলে প্রথমে ভারত এবং পরে পাকিস্তান তাদের দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করে। ভারত তাদের সরকার ব্যবস্থা চালু রেখেছে এবং আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে খ্যাতি লাভ করেছে। অন্য দিকে শাসন ব্যবস্থায় অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপের কারণে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং পরিবর্তীকালে ১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যতগুলো গণ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে তার পিছনেও মূল দাবি ও অনুপ্রেরণা ছিল একটি সত্যিকারের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জনগণ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে রায় দেয় এবং জনগণের সেই রায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে তদানীন্তন পাক- সামরিক সরকারের অনীহাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষনিক কারণ। অবশ্য এর পূর্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য এবং গণতন্ত্র চর্চায় বার বার প্রতিবন্ধকতা থেকে সৃষ্ট পুঞ্জিভূত ক্ষোপ মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার মূল কারণ।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই নতুন করে যাত্রা শুরু করে কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা অর্জন কারী দেশে ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে ব্যহত করা হয় । তার উপর দুঃভাগ্য বশতঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট অসংবিধানিক হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে সরে যায় এবং ১৯৭৫ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সালের গোড়া পর্যন্ত দেশে কার্যত সামরিক ও বেসামরিক আমলা শাসন কায়েম থাকে। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে সংসদীয় নির্বাচনের পর সংসদীয় গণতন্ত্রের ফেরার চেষ্টা চলে। কিন্তু আবার দ্বিতীয় বারের মত

১৯৮১ সালের মে' তে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে ১৯৯০ সালের শেষ দিক পর্যন্ত দেশে একটি অগণতান্ত্রিক অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের এই ধারা আজও বহমনা। সংসদীয় গণতন্ত্রের এই বহমান ধারাকে আরো বেগবান করার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার দেশ পরিচালনা করছে এবং বিরোধী দলও জনগণের ম্যান্ডেটের বলেই সরকারের বিভিন্ন নীতি যথাযথ সমালোচনা ও বিরোধীতা করেন। জনগণের রায় নিয়ে সরকার দেশ পরিচালনা করুক এটা যেমন জনগণ চায় ঠিক তেমনি চায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে বিরোধী দল সরকারের দোষক্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সরকারকে সঠিক পথে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করুক। এক্ষেত্রে বিরোধীদলের সমালোচনা নিছক বিরোধীতার জন্য নয়, বরং যথাযথ হতে হবে এবং তাদের বক্তব্যের পুরো দায়- দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করতে হবে। অপর দিকে সরকারকেও বিরোধী দলের সমালোচনাকে একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং সব সময় স্মরণ রাখতে হবে বিরোধী দলের সমালোচনার মূল উৎস জনগণের ম্যান্ডেট।

বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখ জনক। উভয় পক্ষই নিজ দলীয় স্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রীক এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিষয়টি শুধু সভা, সমিতি, বক্তৃতার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যে কারনে বাংলাদেশের গনতন্ত্র এ পর্যন্ত বহুবার শৃংখলিত হয়েছে আবার বহু ত্যাগ তিক্ষিকার মধ্য দিয়ে শৃংখল মুক্তও হয়েছে। অবশ্য ১৯৯১ সালের একটি সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল গণতন্ত্রের সেই পথকে কংকট মুক্ত পথ আমাদের দেশের সরকার ও বিরোধী দল তৈরী করতে পারেনি।

তবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অতিক্রম করছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এই চড়াই উতরাই এর পথে বর্তমান গবেষণার বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০) একটি জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ অর্জিত হবে। যার মাধ্যমে দেশ ও জাতি বর্তমান ও ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা পাবে। অতএব উক্ত গবেষণা কর্মটি তাৎপর্যপূর্ণ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

উক্ত গবেষণার দ্বারা বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তবে গবেষনার প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ নিন্মরূপঃ-

১) সরকার ও বিরোধী দলের অসহিষ্ণু মনোভাব রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের পথে কতটা অন্তরায় তা নিরূপণ করা।

২) বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রকৃতরূপ নিরূপন করা।

৩) ১৯৭১-২০১০ এই দীর্ঘ সময়ে সরকার ও বিরোধী দল গণতন্ত্রের স্বার্থের চেয়ে স্বার্থ গোষ্ঠির স্বার্থকে কতটা প্রাধান্য দিয়েছে তা নিরূপণ করা।

৪) রাজনৈতিক গণতান্ত্রের চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা অনুসন্ধান করা।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নিন্ম পদ্ধতি সমূহ অনুসরন করা হয়েছে।

(ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঃ

গবেষণার সময় ১৯৭১ হতে ২০১০ হওয়ায় এই সময়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পটভুমিকা, ঘটে যাওয়া ঘটনার কার্যকারণ সূত্র এবং এর সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের পথে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয় সমূহ উৎঘাটনে ঐতিহাসিক দলিলপত্র, রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণাদি, ইতিহাসবীদদের বিভিন্ন তথ্যের বিশেষণ ও পরামর্শ, পথ-মত, আদেশ-উপদেশ ইত্যাদি ইতিহাস অধ্যায়ন অপরিহার্য হয়ে পরেছিল। আর সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার হলো বর্তমান সম্পর্কে সম্যক ধারার জন্য অতীত অধ্যয়ন অপরিহার্য।

(খ) তুলনা মূলক পদ্ধতি ঃ

গবেষণা কর্মটি বিশেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের আমলে কতটুকু গণতন্ত্রের চর্চা হয়েছে? তার ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা কোথায় অবরুদ্ধ হয়েছে এবং কিভাবে এর যাত্রা পথে আবার প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে তা মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে তুলনা মূলক পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে চলমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি, গোষ্ঠি, দল, ক্ষমতায় এসেছেন এদের কেউ নির্বাচনের মাধ্যমে, কেউ

রাজনৈতিক উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী এদেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল ক্ষমতায় বসেন এং বিভিন্ন দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। তাই কোন সরকারের আমলে গণতন্ত্রের কতটুকু চর্চা হয়েছে এবং বিরোধী দল বা দলগুলো কতটুকু গণতান্ত্রিক কর্মসূচী পালন করেছে এদের তুলনা মূলক বিশেষণের জন্য উক্ত গবেষণায় তুলনা মূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

(গ) ডকুমেন্ট স্টাডি ঃ

যেহেতু গবেষণার বিষয়বস্তু ১৯৭১-২০১০ সময়ের মাঝে সরকার ও বিরোধী দলের কার্যক্রম গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে এর বিশেষণ। এই ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট পরিসংখ্যান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার অধ্যায়ন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশ ধারা, জাতীয় সংহতি, জাতীয় রাজনীতির প্রতি মানুষের মনোভাব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্তরায়, বাংলাদেশ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জণগনের মাঝে সম্পর্ক-দূরত্ব বাংলাদেশের সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচীর মূল্যায়ন, সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলেরর কার্যকর ভূমিকা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলো বর্তমান গবেষণার সাথে ওতপ্রোত জড়িত। আর এই বিষয় গুলো মূল্যায়ণে ডকুমেন্ড স্টডির গরুত্ব অপরিহার্য ছিল। গবেষণা সাথে সংশিষ্ট প্রচুর ডকুমেন্ট রয়েছে যেমন- আত্মজীবনী গ্রন্থ, বিভিন্ন ধরনের স্মৃতি চারণ মূলক ডকুমেন্ট। যেমন- আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - লেখক আবুল মনসুর আহমদ। উপরন্ত বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় পর্যায়ে গড়ে উঠেছে তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র। যেমন বি আই ডি এস, জাতীয় আর্কাইভস ইত্যাদি। সুতরাং গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আলোচ্য গবেষণা কর্ম সম্পাদনে ডকুমেন্ট স্টাডি পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

(ঘ) ইন্টারনেট ব্যবহার ঃ

বর্তমান বিশ্ব প্রায় সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে? কেন হচ্ছে? কি উদ্দেশ্যে হচ্ছে? কোন বিষয়ের অতীত, বর্তমান। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত ইত্যাদি জানার ক্ষেত্রে ইন্টারন্টে ব্যবহার অপরিহার্য। স্বল্প কথায় বললে ইন্টারন্টে তথ্য ভান্ডার। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। এদেশের ও বিভিন্ন জাতীয় আর্ন্তজাতিক বিষয় ইন্টারনেট পাওয়া যায়। তাই গবেষণার সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়েছে।

(ঙ) দেশী বিদেশী পুস্তক ও সাহিত্য পর্যলোচনাঃ

গবেষণার বিষয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়া সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা ১৯৭১-২০১০ । উক্ত বিষয়ের সাথে প্রয়োজনীয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, সংজ্ঞায়ন ও তত্ত্বীয় বিশেষণ, যেমন- সরকার ও বিরোধী দল কি? রাজনৈতিক গণতন্ত্র কি? সরকার বিরোধী দলের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন তথ্যের উৎস ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেশী বিদেশী পুস্তক ও সাহিত্য পর্যালোচনা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে।

(চ) পত্রপত্রিকা ব্যবহার ঃ

অতীত ও বর্তমান সময় বিশেষনের জন্য পত্রপত্রিকা একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর মাধ্যমে বিষয়ের খুটিনাটি, সমালোচনা মূলক বিশেষন, বিশেষজ্ঞ মতামত ইত্যাদির ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকা অধ্যায়ন ও পর্যালোচনায় অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল।

১.৪ গবেষণার সময়কাল ঃ

গবেষণার সময় ১৯৭১-২০১০ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে ৯টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে । এর মধ্যে ৪টি নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিন অনুষ্ঠত হয় । ২ বার সামরিক অভ্যুাথানের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সময় বেশ কবার জাতীয় সংসদ নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গণতন্ত্রের বিকাশ সরকার ও বিরোধী দলের ভুমিকার একটি তথ্য সমৃদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছে এই গবেষণায়।

১.৫ অনুমান গঠন ঃ

স্বাধীনতা উত্তর বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সরকার ও বিরোধী দলের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈকিত চর্চাই গণতন্ত্র বিকাশ ধারার পথে অন্তরায় সৃষ্টির মূল কারন । কেননা সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক এক কথায় শত্রুতার সম্পর্ক , সরকারের যেন মূল কাজ বিরোধী দলকে দমন করা এবং বিরোধী দলেরও মূল কাজ বিরোধীতা করা, অহেতুক সরকারের সমালোচনায় মুখর থাকা। এসবের ফলাফল গনতন্ত্রের জন্য সুখকর হয়নি। যেমন-অতি সম্প্রতি ১/১১ উদ্ভূত্ব পরিস্থিতিতে প্রায় দুই বছর একটি অগণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত ছিল এবং তারা দেশে ভিন্ন ধারার রাজনীতি চালুর জন্যও চেষ্টা করেছিল । সেটি সফল হলে তা কতটা মঙ্গল জনক হতো সেটি গবেষনার বিষয় তবে উদ্ভুত্ব পরিস্থির শতভাগ দায় দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় সরকার ও বিরধীদল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে নিজেদের সার্থকে বড় করে দেখেছে। এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে গবেষণায় নিম্মোক্ত অনুমান গুলো তথ্য-উপাত্ত সহ উপস্থাপিত হয়েছে।

১। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার ও বিরোধী দলের গণতন্ত্রের চর্চা নিম্ন মানের।

২। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার ও বিরোধী দলের কর্মসূচীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক উপাদান দুর্বল ।

৩। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চেয়ে দল বা ব্যক্তির প্রাধান্য বেশী ।

১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসা লাইনচ্যুত ও অসুস্থ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক অত্যন্ত তেঁতো। অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠ কার্যকারিতার জন্য অত্যাবশকীয় শর্তের মাঝে অন্যতম প্রধান শর্তই হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা। উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে সরকার ও বিরোধী দল উভয়কে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হয়। সরকার ও বিরোধী দলগুলোকে যেহেতু সব সময় জনগনের সামনে জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা থাকে তাই তারা সব সময় উভয় দলই অন্যায় আচারণ অসঙ্গত কার্যকলাপ বিধি বর্হিভূত বা প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতি বিরোধী কোন কিছু ঘটার আগেই নিজেদের মাঝে নিজেরাই সেল্ফ সেন্সরশিপ নিয়ে আসেন। ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে অযৌক্তিক ও কান্ডজ্ঞানহীন বিরোধ ও গুরুতর সম্পর্কাবনতির কোন ঘটনা তেমন ঘটতে দেখা যায় না। ফলশ্রুতিতে উন্নত বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংহত। সেখানে সরকার ও বিরোধী দলের সাথে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব, জ্বালাও পোড়াও, বোমাবাজি, হরতাল, ভাংচুর, অবরোধ, ঘেরাও, বিরোধীতার জন্য বিবোধিতার ঘটনা সেখানে বিরল। বিশেষ করে ব্রিটেনে এ বিষয়ে তেমন কোন লিখিত বিধি বিধান বা আইন না থাকলেও যে সকল দেশে লিখিত আইন, সংবিধান রয়েছে সে সকল দেশের চেয়ে বহুগুন সুষ্ঠভাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত । এর কারণ একটি আর তা হলো সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে পারস্পারিক সমঝোতা, বোঝাপড়া ও গণতান্ত্রিক প্রাধান্য। সর্বোপরি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা দুঃখজনক। পূর্বের অবস্থা বাদ দিলেও ১৯৯০ সালে স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর প্রায় ২৫ বছরের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা চরম বৈরি, শত্রু ভাবাপন্ন, ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক, যা কিনা আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কুলষিত করেছে এর অগ্রযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করেছে। অথচ ইতিহাস বিশেষণে দেখা যাবে যখনই সরকার ও বিরোধী দল একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করেছে তখনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। যেমন- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা থেকে সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ব্যবস্থায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনের বিরল ঘটনা টি উলেখ যোগ্য।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে Give and take policy অনুপস্থিত। যে কারণে সরকার যেমন বিরোধী দলের যথাযথ সমালোচনা গ্রহণ করতে পারছে না, ঠিক তেমনি বিরোধী দলও সরকারের সঠিক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পথে এবং কল্যাণ মূলক পদক্ষেপের সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পারছে না। এখানেই গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিকাশের অন্তরায়। যা আমাদের ইতিহাসে ধারাবাহিক ভাবে চলছে। যে সব রাষ্ট্রে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পারিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণুতা আপোষকামিতা, আদান প্রদানের মানসিকতা ক্ষতবিক্ষত সেখানেই রাজনৈতিক গণতন্ত্র কল্যাণের পথ হতে সন্ত্রাসের পথে, প্রতিযোগিতা, বৈরিতার তপ্ত কংকরময় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ পথ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশেষণে দেখা যাবে সামারিক অভ্যুত্থান, পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক সরকার গঠন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বন্ধ, তাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা, জনস্বার্থ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপেক্ষিত হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে। এসব কারণেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র কিবাশের পথে গণতন্ত্রের অনুকুল ও প্রতিকুল পরিবেশ মূল্যায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯১ সালে সংসদে দ্বাদশ সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের নতুন করে যে যাত্রা শুরু করে প্রায় ২০ বছর অতিক্রম করলেও তাতে গণতন্ত্র চর্চা ও অনুশীলনে কোন আশানুরূপ ফলাফল দেখা যায় না। কেননা এই সময়ের মাঝে ৫টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচন গুলোতে জনগণের অংশ গ্রহনে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এর বাহ্যিক বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্বের নামই গণতন্ত্র নয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, জাতীয় প্রশ্নে ঐক্যমত্য ইত্যাদি সব মিলিয়ে গণতন্ত্র। কিন্তু বাংলাদেশের এসবের প্রকৃত অবস্থা কি? গণতন্ত্রের ব্যক্তি অধিকার রক্ষিত কিন্তু বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে সেখানে বিভিন্ন গডফাদারদের জন্ম হয়েছে। যারা প্যারালাল প্রশাসনের জন্ম দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধ্বংস উলাসে মত্ত।

বাংলাদেশে বিকাশমান গণতন্ত্রের একটি রূপ হচ্ছে ঘন ঘন হরতাল আহবান করে দলীয় মত ও ইচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া। এই হরতাল সংস্কৃতির কারণে ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। আবার অন্য দিকে বিরোধী দলের সমর্থণের তোয়াক্কা না করে জনগণের জনমত যাচাই না করেই সরকার বিভিন্ন ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা গণতন্ত্রের বিকাশ পথকে দুর্বল করে দিচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সরকার ও বিরোধী দলের

ভূমিকা কতটা উপযুক্ত ছিল এবং তাদের সংঘাতময় রাজনীতির কারণে গণতন্ত্র কতবার আহত হয়েছে ইত্যাদি জাতীয় স্বার্থ সম্মলিত বিষয় গুলো উৎঘাটন হয়েছে যা ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র বিকাশের পথকে সহজতর করবে। বিশেষ করে যারা রাজনীতির সাথে জড়িত এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশ নেন, একই সাথে রাজনৈতিক কর্মী, রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র- ছাত্রী, সংসদ সদস্যসহ আপামার জন সাধারণের গণতন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সুতরাং গবেষণার বিষয় হিসেবে বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

১.৭ গবেষণা সমস্যা ঃ

গণতান্ত্রিক উন্নয়নের সাথে সরকার ও বিরোধী দলের সর্ম্পক গভীরভাবে সম্পৃক্ত হলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা কর্মের অপর্যাপ্ততা হেতু সংশিষ্টি বিষয়ে খুব বেশী গবেষণা পত্র ও সাহিত্য পাওয়া যায়নি। এ কারণে আমাকে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে বেগ পেতে হয় এবং খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয়ে গঠন মূলক পর্যায়ে পৌছতে।

গবেষণা বিষয়ের সময়কাল যেহেতু ১৯৭১-২০১০ তাই তথ্য-উপাত্ত্ব সংগ্রহ কল্পে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, ডকুমেন্ট স্টাডি, ইন্টারনেট ব্যবহার, দেশী বিদেশী পুস্তক ও সাহিত্য পর্যলোচনা, পত্র-পত্রিকা ব্যবহার মাধ্যমগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, পক্ষপাতমুক্ত, নিরেট তথ্যের স্বল্পতার সম্মুখিন হতে হয় বার বার। উপরন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইহিতাসে গণতন্ত্রের যাত্রা পথ সকল সরকারের আমলে প্রায় একই রকম হওয়ায় বিভিন্ন সরকারের আমলে গণতন্ত্র বিকাশে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা যথাযথ ভাবে নিরুপণ ও চুলড়ো বিশেষণে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

তারপরও দীর্ঘ পথ পেড়িয়ে গবেষণাকর্ম সু-সম্পন্ন হয়েছে যেখানে প্রতিটি তথ্য-উপাত্তের উৎস উলেখ করা হয়েছে যা পরবর্তী গবেষকদের সহায়তা করবে।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

- ✓ Al Masud Hasanuzzaman, Rol of Opposotion in Bangladesh politics, UPL, P-49
- ✓ Talukder Maniruzzaamn, the Bangladesh Revolution and its Aftermath, Dhaka, UPL, 1988.
- ✓ আহাদ জাতীয়, রাজনীতি ১৯৭৪ থেকে ৭৫, খোজরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ২০০২।
- ✓ ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমদ, গণতন্ত্রের বিকাশঃ বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মৌলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি
- ✓ ২০১০; পৃষ্ঠা : ১৬-১৭।
- ✓ তালুকদার মনিরুজ্জামান , বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০১।
- ✓ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, গণতন্ত্রের বিশ্বাস ও প্রয়োগ, গোব লাইব্রেরী, ঢাকা।
- ✓ সিরাজুল ইসলাম, গণতন্ত্রের সন্ধানে, বিজয় প্রকাশন, ঢাকা ।
- ✓ আবুল মুনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোজরোজ কিতাব মহল, দশম সংস্করণ, জুলাই-২০০২
- ✓ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০। নিউ এজ

Dhaka University Institutional Repository

- পাবলিকেশন্স,প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

২.১ প্রাচীন বাংলাদেশের পরিচিতি

বিধাতার অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বিশাল ভারতবর্ষের প্রতি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময় দু'দিক থেকে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে ।

- ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে[৫] ।
- রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের মাধ্যমে[৬] ।

ঐতিহাসিকদের মতে-এই দুটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই দ্রাবির, শক, হুন, আর্য, আরব, পাঠান, মোগল, এবং সর্বশেষ ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের আগমন ঘটে এদেশে। বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচিতিকে দু'ভাবে উপস্থাপন করা হলো।

- বাংলার প্রাচীন পরিচিতি।
- স্বাধীন বাংলাদেশের পরিচিতি।

২.২ প্রাচীন বাংলার প্রকৃতি

(ক) প্রাচীন বালার ভৌগলিক অবস্থান ঃ

ভৌগলিক পরিবেশ প্রত্যেক জনপদ তথা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এদের একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।[৭] চিত্রের সাহায্যে প্রাচীন বাংলার জনপদ বা অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থানের বর্ণনা করা হলোঃ

সারণী ঃ ০৩

প্রাচীন বাংলার ভৌগলিক অবস্থান

প্রাচীন বাংলার সীমা	সীমানাবর্তী অঞ্চল / নগর সমূহ
উত্তরে	হিমালয় পর্বত, নেপাল, ভূটান ও সিকিমরাজ্য
দক্ষিণে	বঙ্গোপসাগার
পূর্বে	জৈন্ড়্পাহার, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী
পশ্চিমে	সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর, কেওঞ্জর- ময়ূরভঙ্গের শৈলময় অরণ্যভূমি
উত্তর-পূর্ব দিকে	ব্রক্ষপুত্র নদের উপত্যকা
উত্তর-পশ্চিমে	বিহারের দ্বারাভাঙ্গা পর্যন্ড় ভাগীরথী নদীর উত্তরে সমান্ড়্রাল এলাকা

রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা,গ্রন্থের ভিত্তিতে **গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত**

(খ) বাংলার প্রাচীন জনপদ ঃ

[৫]মোহাম্মদ ওয়ালিউলাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম (১৫৯৯-১৯৪৭), পৃষ্ঠাঃ ১৭, প্রকাশ-১ডিসেম্বর ১৯৬৯ প্রকাশক, নাসাস, ঢাকা।

[৬]প্রাগুক্ত-১৭

[৭] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে বাংলার জনপদ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। এর বিভিন্ন অংশের ভৌগলিক নাম ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং সেগুলো বিভিন্ন যুগের রাজ্যের নাম থেকে উদ্ভুত। বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে বঙ্গ, পুন্ড্র, হরিকেল, রাঢ়, সমতট প্রভৃতি উলেখযোগ্য এছাড়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদগুলোর নাম হলো চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, তাম্রলিপ্ত, সিংহপুর, পূন্ধর্ণ, কোটিবর্ষ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, কর্ণসুবর্ণ ও বিক্রমপুর।[৮] চিত্রের সাহায্যে জনপদ এবং অঞ্চলের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

সারণী ঃ ০৪

প্রাচীন বাংলার জনপদ

জনপদের নাম	প্রাচীন বাংলার জনপদ / নগর সমূহ
পৌন্ড্র	বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ
বরেন্দ্র বা বারিন্দ্রী	বগুরা, পাবনা ও রাজশাহীর অংশ বিশেষ
বঙ্গ	কুমিলা, যশোর, নদীয়া, শান্তিপুর, ঢাকা, ফরিদপুর এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ
গৌড়	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর
রাঢ়	পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চাল
সমতট	কুমিলা ও নোয়াখালি
হরিকেল	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট
আরাকান	কক্সবাজার, বার্মার কিয়দংশ, কর্ণফূলী নদীর দক্ষিণাঞ্চল
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল
বিক্রমপুর	মুন্সীগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল
কামরূপ	রংপুর, জলপাইগুড়ি, আসামের কামরূপ জেলা
সপ্তগাঁও	খুলনা এবং তীরবর্তী অঞ্চল

রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ড: এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা,গ্রন্থের ভিত্তিতে **গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত**

(গ) অখন্ড বাংলার আত্মপ্রকাশ ঃ

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। বাংলা কোনো অখন্ড ভূভাগ ছিল না। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রাজা শশাঙ্ক প্রথম স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজারা বাংলার জনপদগুলোর ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক রাজ্যসীমা একত্রিত করেন। এর ফলে অখন্ড বাংলার উত্থান ঘটে।

(ঘ) প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক গতি-ধারা ঃ

সুপ্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ গড়ে

[৮] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ড: এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

তুলেছিল সভ্যতার নিদর্শন। বাইরের জগতের সঙ্গে এর প্রথম সংঘাত দেখা দেয় আর্য অভিযানের ফলে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমের খাইবার গিরিপথ বেয়ে উপমহাদেশের মাটিতে পা রাখে আর্যজাতির মানুষ। শুর হয় তখন থেকে এ দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক সূত্রপাত। আর্যদের বাহুবল আর সংস্কৃতির কাছে এ দেশের আদি অধিবাসীদের সংস্কৃতি তথা জীবন ধারণ প্রণালী মার খেয়েছিল । তবে বাংলা অঞ্চলের আদিবাসীরা খুব সহজেই আর্যদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য মেনে নেয়নি। তারাও তাদের স্বাধিকার আদায়ে ছিল সোচ্ছার।[৯] খৃস্টজন্মের তিনশো বছর অর্থ্যাৎ বাংলাদেশে মৌর্যদের ক্ষমতা দখলের পাঁচশো বছর পর থেকে প্রাচীন বাংলায় ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময় কৌম সমাজ ভেঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[১০] ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ অঞ্চলে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সাথে নতুন রাষ্ট্রেরও পত্তন হয়। সপ্তম শতকে মহারাজা শশাঙ্কই প্রথম প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদকে এক সূত্রে গাঁথবার প্রচেষ্টা চলে। ৮০০- ১২০০ পর্যন্ত পাল ও সেন শাসনের প্রায় চারশত বছর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই চেষ্টা অব্যাহত থাকে।[১১] ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির কাছে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সেন রাজাদের বর্ণব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথার নির্মম শোষণে জর্জরিত বাংলার মানুষ নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল। দিলির মুসলিম সুলতানদের বাদ দিলে বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রায় দুশো বছরের ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসে একটি বড় ধরণের দৃষ্টান্ত। ১৩৪২-১৫৩৮ প্রায় দু'শ বছর ধরে সুলতানি আমল এই সময়ে প্রথম গৌড় ও বঙ্গ মিলে একটি রাষ্ট্র গঠন করে নতুন রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা করে। এর অধিবাসী ছিল বাঙালি এবং রাষ্ট্রের নাম ছিল বাংলাদেশ।[১২] ১৫৩৮-১৫৬৪ দীর্ঘ সময় পাঠান আমল বলে খ্যাত এই সময় ঐক্যবদ্ধ বাংলা মোগল বিরোধী শেরশাহ দিলি হতেই শাসন পরিচালনা করতেন ফলে এই অঞ্চল আবার স্বাধীনতা হারায়। এ অবস্থায় ১৫৭৬-১৭৫৭ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছর বাংলায় মোগল শাসনের আওতায় থাকে। এই সময় মোগল সম্রাট আকবরের আমলে বাংলাদেশের নাম করা হয় সুবা বাংলা আর ঢাকাকে করা হয় এর রাজধানী। ১৭৫৭ -১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশের শাসন পরিচালনা করেন।[১৩] ১৯৪৭ -১৯৭১ সাল পর্যন্ত এদেশ পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বপোরি গতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ চিত্রিত হয়।

---

[৯] হাননান, ড. মোহাম্মদ, হাজার বছরের বাংলাদেশ, ইতিহাস অ্যালবাম,সাহিত্য প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৪, মার্চ ২০০৮, ঢাকা। পৃষ্ঠা: ১০।

[১০] প্রাগুক্ত : ১৪

[১১] প্রাগুক্ত : ১৪-১৫

[১২] প্রাগুক্ত : ৩০

[১৩] প্রাগুক্ত : ১৮-২৫

২.৩ স্বাধীন বাংলাদেশের পরিচিতি

(ক) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাম ঃ

সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এতে রাষ্ট্রের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে- বাংলাদেশ **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ"** নামে পরিচিত হবে (অনুচ্ছেদ-১)[১৪]।

(খ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন ঃ

বাংলাদেশ এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি: মিটার বা ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল। বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক দেশ। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯০তম দেশ।[১৫] নদ-নদী অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৯,৩৮০ বর্গ কিলোমিটার এবং বনাঞ্চলের আয়তন ২২,৫৮৪ বর্গ কিলোমিটার। নদী ও বনাঞ্চল বাদ দিলে বাংলাদেশের আয়তন ১,১৫,৬০০ বর্গ কি: মিটার ।

(গ) ভৌগোলিক সীমানা ও অবস্থান ঃ

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ ২০°-৩০ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮° থেকে ৯২°-৫৬পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বাংলাদেশ উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মেঘালয় রাজ্য ও আসাম, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ দিকের বঙ্গোপসাগর বাদ দিলে বাংলাদেশের অপর তিনটি প্রান্ত ভারতের নানা রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ আসাম, উত্তর পূর্ব কোণ ঘেষে রয়েছে মায়ানমারের কিয়দংশ।[১৬] ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানে বাংলাদেশের সীমান্তরেখা স্থলভাগ ও সমুদ্র উপকূলসহ মোট ৩১৬১ মাইল।[১৭] ভূ-প্রকতিকগত অনুসারে এদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-

- পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল
- উপকূলীয় অঞ্চল
- নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল[১৮]

(ঘ) বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঃ

---

[১৪] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, প্রকাশ- সপ্তম মুদ্রণ- জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৮০।
[১৫]আব্দুল মান্নান তালিব, **বাংলাদেশে ইসলাম,** (ইফাবা , ১৯৮০ খৃ.) পৃ. ১৫।
[১৬]বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। ১৯৭১ খৃ. মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষাণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন -১৯৭৪ এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উলেখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উলেখিত এলাকা, তদবহির্ভীত বাংলাদেশের সীমাভুক্ত হইতে পারে। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান,**গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কর্তৃক প্রকাশিতা, ১৯৯৯ খৃ (প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র অংশ দ্র.)।
[১৭]মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, **বাংলাদেশের অর্থীনেতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল,** (ঢাকা-১৯৯৮ খৃ.) পৃ. ২২-৩১।
[১৮]মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, **অর্থনেতিক আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল,** (ঢাকা-১৯৯৪ খৃ.) খৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি আদ্র অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূখন্ড মূলত গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র-মেঘনা নদী গঠিত সুবৃহৎ ব-দ্বীপ গুলোর একটি। এ বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে দেশের মধ্য-অঞ্চলের মধুপুর গড়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্র ভুমি এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কিছু পবর্তসারি। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ ভূমিই সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র তিন মিটারের চাইতেও কম উঁচু এবং প্রতিনিয়ত বণ্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয় (তাজিং ডং) এর উচ্চতা ১,২৮০ মিটার। বিজয় শৃঙ্গটি বান্দারবান জেলায় রুমা উপজেলায় অবস্থিতি[১৯]

(ঙ) বাংলাদেশের জলবায়ু ঃ

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল ঠান্ডা ও শুষ্ক। এখানকার জলবায়ু পুরোপুরি মৌসুমী। এদেশে ছয়টি ঋতু আছে। ঋতুগুলো হচ্ছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫৪ সেন্টিমিটার (বর্ষাকাল), অন্যান্য ঋতুতে -২০৩ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশকে তিন ভাগে করা যায়। যথা-

- লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি
- পলি মাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি
- পলি মাটিতে গঠিত নিন্মভূমি।[২০]

(চ) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ষোল কোটি।[২১] অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান, শতকরা ১৫ ভাগ হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবসতি পূর্ণ দেশ। জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫ জন। মাথাপিছু আয় ২৮৩ মার্কিন ডলার। মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশী।

(ছ) বাংলাদেশের নদ-নদী ঃ

প্রধান নদীগুলোর শাখা ও উপ-নদীসহ মোট প্রায় ৭০০ নদী রয়েছে। এ নদী গুলো আবার তিনটি বৃহৎ নদী প্রণালীর অন্তর্ভূক্ত; যেমন-

- গঙ্গা-পদ্মা নদীপ্রণালী
- ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা নদীপ্রণালী
- সুরমা-মেঘনা নদীপ্রণালী।

---

[১৯] নলেজ ওয়াল্ড, বিসিএস প্রকাশন-ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ;২০০৬, পৃষ্ঠা-৭৩।

[২০] মোঃ জাকারিয়া, **বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ,** (ঢাকা, ১৯৭২ খৃ) পৃ.-১৮ ও **মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ,** বিশ্ব সাহিত্য ভবন (ঢাকা,১৯৭২ খৃ.) পৃ. ২৮।

[২১] আদমশুমারী রিপোর্ট ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১০,৬৩,১৪,৯৯২ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ৫,৪৭,২৮,৩৫০ জন, মহিলা ৫,১৫৮৬,৬৪২ জন। **বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো,** (আদমশুমারী রির্পোট ১৯৯১ খৃ.) মে ১৯০৪ খৃ. প্রকাশিত।

দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের পাহাড়ী এলাকার নদীগুলো সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদীপ্রণালী হিসেবে চিহ্নিত। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা, কর্ণফুলি, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তিস্তা, আত্রাই, গড়াই, মধুমতি, কপোতাক্ষ, রূপসা-পশুর, ফেনী ইত্যাদি অন্যতম নদী[২২]।

২.৪ বাংলা নামের উৎপত্তি

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ, ভৌগোলিক সীমারেখা, শাসক গোষ্ঠী এবং জনসাধারণের সামাজিক সংস্কৃতির যে ইতিবৃত্ত জানা যায়, তাতে অতটা সুস্পস্ট ভাবে বাংলা বা বাংলাদেশ নামের উচ্চারণ দৃষ্ট হয়না।[২৩] বাংলা নামের উৎপত্তিগত আলোচনায় ইতিহাসবিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধানে মতামতগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

❖মোগলপূর্ব আমল ❖ মোগল আমল ❖ ইংরেজ শাসনামল [২৪]

(ক) মোগলপূর্ব আমল ঃ

ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজ আফীফ এর মতে **বাঙ্গালা** নামের প্রচলন সুলতান শাম্স-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ এর সময় থেকে শুরু হয়েছে। এই সময় তিনি সমস্ত বাংলায় অর্থাৎ লাখনৌতী, সাতগাঁও ও সোনরগাঁও একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। যে কারণে তাকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। [২৫]

(খ) মোগল আমল ঃ

মোঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তাঁর আইনে আকবরী গ্রন্থানুযায়ী বাঙ্গালার আদি নাম ছিল **বঙ্গ** প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উচু ও ২০ গজ প্রস্থ প্রকান্ড **'আল'** নির্মাণ করতেন। এখান থেকে "বাঙ্গাল" বা "বাঙ্গালাহ" নামের উৎপত্তি। ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুরূপ মতপোষন করেন[২৬]

---

[২২] নলেজ ওয়াল্ড, বিসিএস প্রকাশন-ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ;২০০৬, পৃষ্ঠা-৭৩।
[২৩]আহমেদ শরীফ, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা ঃ বর্ণমিছিল,১৯৭৮ ইং) ১ম খন্ড,পৃ.১
[২৪]তোফায়েল আহমেদ,যুগে যুগে বাংলাদেশ (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতা বিস্তান, ১৯৭৭ইং) পৃঃ১৪
[২৫]রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতা বিস্তান, ঢাকা, পৃঃ ৩১।
[২৬]প্রাগুক্ত

(গ) ইংরেজ শাসনামল ঃ

ইংরেজদের বেঙ্গল' ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের বেঙ্গালা থেকেই **বাংলা নাম** নেয়া হয়েছে যা **১৯৪৭** পর্যন্ত প্রযুক্ত ছিল । ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপীয়দের লেখনীতে বেঙ্গালা নামে দেশের উলেখ পাওয়া যায়।[২৭] অতএব মুসলমান-পূর্ব যুগে, ব্যাপক অর্থে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'র ব্যবহার পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' দ্বারা বাংলার অংশ বিশেষকে নির্দেশ করা হতো। তাই 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহ্-এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে[২৮]।

[২৭]প্রাগুক্ত

[২৮] প্রাগুক্ত

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি

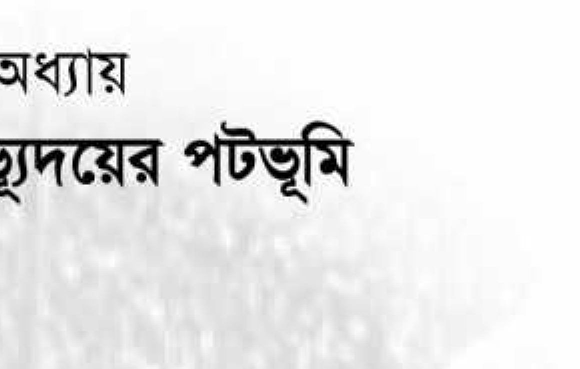

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘ।বহু বিচিত্র ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায় ভরপুর। এই ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হলো।

- বাঙ্গালীজাতীয়তাবাদেরক্রমবিকাশ
- বাঙ্গালীদেরস্বাধীকার আন্দোলন
- স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়[২৯]।

৩.১ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঃ

জাতীয়তা মূলতঃ মানসিক ধারণা। তবে সত্য যে সেই মানসিক ধারণা হঠাৎ করে গড়ে উঠে না। এর পশ্চাতে কতগুলো শক্তিশালী শর্ত কাজ করে। যেমন- সংস্কৃতি, নিরাপত্তাবোধ, আস্থার অভাব, ভাষা, ন্যায্য দাবী আদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ধর্ম এবং আরও কতগুলো সাধারণ উপাদান[৩০]। বৃটিশ ভারতে ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের যৌথ স্বার্থের প্রথম পদক্ষেপ। বাঙ্গালী মুসলমানদের মুখপাত্র শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন সোহ্রাওয়ার্দী এবং হিন্দুদের মুখপাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বাঙ্গালীদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্প্রাদায়িক বিষ বাষ্পে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয়ে পড়ে এবং স্বতন্ত্র জাতীয় চিন্তার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। যার আংশিক অভিব্যক্তি ১৯৪০ সালের লাহোর **প্রস্তাব** [৩১]।

(ক) লাহোর প্রস্তাব ঃ

১৯৩৭-৩৯ সালের কংগ্রেস শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভুমিতে ভারতবর্ষে মুলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার কৃতি সন্তান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রস্তাব পেশ করেন যে, ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী সন্নিহিত স্থান সমূহ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং অঞ্চলকে প্রয়োজন মত সীমা পরিবর্তন দ্বারা এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব অঞ্চল সমূহে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়[৩২]। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে দিলীর মুসলিম

---

[২৯] দেওয়ান, মোঃ ইউনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৯৪।
[৩০] প্রাগুক্ত।
[৩১] ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশকাল; প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৯৫।
[৩২] রশীদ, ড. হারুন-অর, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭ - ২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা-১২২-১২৩।

লীগ কনভেসনে এক পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে ভারত বর্ষে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়[৩৩]।

(খ) ভাষা আন্দোলন ঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকে উর্দূ বনাম বাংলা নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভাষা বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান পূর্ব ভাষা বির্তক বাদ দিলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। **প্রথম পার্যায়-** ১৯৪৭-৪৮। এসময় ভাষা প্রশ্ন বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা প্রতিবাদ বিক্ষোভে রূপ নেয়। **দ্বিতীয় পর্যায় ছিল-** ১৯৫২ সাল এসময় সংঘঠিত হয় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি[৩৪]। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিলার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকে পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রথম আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করেন[৩৫]। কিন্তু তা প্রত্যাখাত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে আন্দোলনের কেন্দ্র স্থল। জিন্নাহ ঢাকায় আগমনের পর ২১ মার্চ ১৯৪৮ রেসকোর্স ময়দানে এক সভায় ভাষা প্রশ্নে জিন্নাহ ঘোষণা করেন **"উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"**। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫১ সালে আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হন এবং খাজা নাজিমুদ্দীন নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে তিনি উর্দুকে পাস্তিানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন [৩৬]। তার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আন্দোলনের চুড়ান্তপর্ব। ১৯৫২ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট ও সভা-সমাবেশের তীব্র আন্দোলনের সময় শহীদ হন সালাম, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেকে। এরপর ১৯৬৫ সালে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃত দেয়া হয়। সামাজের সর্বস্তরের জনগণের এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য গড়ে উঠে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে[৩৭]। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে ধাপে ও স্তরে স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

(গ) পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় গণপরিষদ ঃ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর একটি সংবিধান উপহার দেয়ার জন্য ৬৮ সদস্যের একটি গণপরিষদ কমিটি গঠন করা হয়। পরে কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৬ জনে উন্নিত করা হয়। এ কমিটি দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে ১৯৪৭-৫৪ কোন সংবিধান উপহার দিতে পারেনি। ফলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি

---

[৩৩] প্রাগুক্ত ।
[৩৪] প্রাগুক্ত।
[৩৫] প্রাগুক্ত-১৬৩।
[৩৬] উমর , বদরুদ্দীন, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৪।
[৩৭] ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশকাল; প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৭৫।

রচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট। কমিটি যখন সংবিধান উপহার দেয়ার কর্মকাঠামো স্থির করেন, তখন গভর্ণর জেনারেল অকর্মন্যতা, অযোগ্যতা, দুর্নীতি এবং দুষ্কর্ম এর অভিযোগ এনে কমিটি বিলোভ করেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেন জনগণ কমিটির প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন[৩৮]। ফেডারেল কোর্টের নির্দেশে গভর্ণর জেনারেল ১৯৫৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করেন। এ গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়ন এবং তা অনুমোদন করে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সংবিধান ধ্বংস করেই ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ বাতিল করা হয়[৩৯]।

(ঘ) ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ঃ

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নানা টালবাহানা সে নির্বাচনকে অহেতুক বিলম্ব করে। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার গণদাবির চাপে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠীত হবে বলে স্থির করা হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই -ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এবং আর কতিপয় ক্ষুদ্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় নির্বাচনী ফ্রন্ট যার নাম করণ করা হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ২১ দফা সম্মিলিত এক নির্বাচনী ইশতিহার প্রণয়ন করেন। নির্বাচনী ইশতিহারের মুসাবিদা রচনা করেন জনাব আবুল মনসুর আহমেদ[৪০]। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় মূলত পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকারের দাবিকে সুসংহত করে পরবর্তীতে মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করে।

(ঙ) ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঃ

সুদীর্ঘ নয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণিত হয় যা ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ কার্যকর হয়। এ সংবিধান পাকিস্তানের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে[৪১]। কিন্তু এ সংবিধান সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় পর্যাপ্ত ছিল না বলে অনেকের অভিমত[৪২]। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নেমে আসে ঘোর রাজনৈতিক সংকট। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করে ১৯৫৬ সালে সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করলে দেশে গণতান্ত্রিক এবং সংসদীয় সরকারের অবসান ঘটে এবং রচিত হয় আমলাতান্ত্রিক শাসনের লৌহ শৃঙ্খল।

(চ) ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ঃ

---

[৩৮] চৌধুরী, সরদার আলী, কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি অব পাকিস্তান (১৯০৯- ১৯৭২) দ্বিতীয় খন্ড, এডুকেশনাল বুক কোম্পানি, পৃষ্ঠা- ৩৭

[৩৯] শফিক, মাহমুদ, বাংলাদেশের সংবিধান ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, বর্ণবীনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ; মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৭।

[৪০] আহমেদ, আবুল মনসুর , আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা,

[৪১] ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশকাল; প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৮২।

[৪২] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১০৪।

১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর আই. আই. চুন্দ্রীগড় রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করেন। তার সরকার দু মাসের কম সময় (১৮ অক্টোবর - ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭) স্থায়ী হয়। এরপর আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে রিপাবলিকান পার্টির সংসদীয় দলের নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন সরকার গঠন করেন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭) । এদিকে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনা চলাকালে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এমনই এক অবস্থায় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। একই সঙ্গে কতিপয় পদক্ষেপ ঘোষণা করেন-

১. সংবিধান বাতিল।
২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত।
৩. জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক সরকার আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া।
৪. সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং
৫. জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ।

৩.২ বাঙ্গালীদের স্বাধীকার আন্দোলন

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের ফলে সারা দেশে কালো অশুভ অভিপ্রায় তৎপর হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি গলা টিপে হত্যার অভিপ্রায়ে ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যে সংবিধান প্রনয়ণ করেন তাতে স্বায়ত্ত্বশাসনের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করা হয়[৪৩]। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে বিরাজ করতে থাকে তীব্র অসন্তোষ। সাধারণ মানুষের সুপ্ত আক্রোস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনল প্রবাহের সৃস্টি করে[৪৪]।

(ক) মৌকিল গণতন্ত্র ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচন ঃ

পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক দলগুলো একত্রিত হয়ে “সম্মিলিত বিরোধী দল” গঠন করে এবং আইয়ুব খানের কনভেশন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু নির্বাচন শেষে দেখা যায় যে, মৌলিক গণতন্ত্র এর অভিশাপে বিরোধী দলের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়। আইয়ূব নির্বাচনে জয় লাভ করে বটে, তবে জনসমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হন। এই সময় বাঙালিদের মধ্যে ভিন্ন ও কঠোর রাজনেতিক কর্মসূচি এবং অবস্থান গ্রহণ সম্বন্ধে দ্রুত চিন্তা ভাবনার উদ্রেক ঘটে।

(খ) আঞ্চলিক বৈষম্য ঃ

[৪৩] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১০৪।
[৪৪] প্রাগুক্ত

পাকিস্তান সৃস্টির পর হতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিমাতা সূলভ দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়। সামজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের সুউচ্চ প্রাচীর রচনা করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়। আইয়ূব খানের সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্রের অধীনে সেই বৈষম্য আরও তীব্র আকার ধারণ করে। আঞ্চলিক বৈষম্যের পাহাড় ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রামে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ

পাকিস্তানের জন্মের পর হতে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়ে ওঠে। ১৯৪৭-৪৮ সাল হতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যয়ের যে বৈষম্য ঘটে তা নিন্ম ছক আকারে দেওয়া হলো-

সারণীঃ ০৫

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যয়ের বৈষম্য

বিষয়	সাল	মোট আয়	মোট ব্যয়	পূব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
বৈদেশিক আয়	১৯৪৭ -৪৮ হতে ১৯৬৭- ৬৮ সাল	৩৯৯৯ কোটি টাকা		২২৪০ কোটি টাকা	১৭৫৯ কোটি টাকা
বৈদেশিক আমদানি	”		৫৪২৯ কোটি টাকা	১৬৩০ কোটি টাকা	৩৭৯৯ কোটি টাকা
শাসনখাতে ব্যয়	১৯৪৭ -৪৮ হতে ১৯৬৭- ৬১ সাল		২২১৬ কোটি টাকা	২৬৯ কোটি টাকা	১৯৪৭ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	১৯৫০ -৫১ হতে ১৯৬৯ - ৭০ সাল		৭৫০৯ কোটি টাকা	২১১৪ কোটি টাকা	৫৩৯৫ কোটি টাকা
সামরিক খাতে ব্যয়	১৯৪৭ -৪৮ হতে ১৯৬৮- ৬৯ সাল		২৪৪৪ কোটি টাকা	২৪৪ কোটি টাকা	২২০০ কোটি টাকা
মাথাপিছু আয়	১৯৬৭- ৬৮ সাল			৩৫২ টাকা	৫৩০ টাকা

উৎসঃ দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১১২।

উলেখিত ছক হতে সহজেই বুঝা যায় যে, ১৯৪৮ সাল হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে কি পরমিাণ আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল।

(ঘ) প্রশাসনিক বৈষম্য ঃ

পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা হতে শুরু করে নিম্ন পদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত সকল স্তরে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল নিতান্ত নগণ্য। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক স্বার্থ দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়। পাকিস্তানের শাসনামলে বিভিন্ন স্তরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রসরকারি কর্মচারীদের পরিসংখ্যান নিন্মে দেয়া হলোঃ

সারণী ঃ ০৬

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশাসনিক বৈসম্য

শ্রেণী	মোট	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রথম শ্রেণী	২৮১৬ জন	৭৩২ জন	২০৮৪ জন
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫৯৬১ জন	১২৪০ জন	৪৭২১ জন
তৃতীয় শ্রেণী	৭০০০০ জন	১৯৩০০ জন	৫০৭০০ জন
চতুর্থ শ্রেণী	২৬০০০ জন	৮০০০ জন	১৮০০০ জন

উৎসঃ দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১১৩।

(ঙ) ছয় দফা কর্মসূচী ঃ

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে ফলে গণতন্ত্র প্রত্যাশী বাঙালীরা উপলবদ্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাদেরই। এরূপ একটি নিরাপত্তাহীন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণ লাভের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন দানা বেধে উঠে। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবির রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করেন। ৬ দফা কর্মসুচি ছিল সংক্ষেপে নিন্মরূপ[৪৫]

দফা-১ :লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উলেখিত দু'টি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে।

[৪৫] আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রজো, ২১ দফা থেকে ৫ দফা , পৃষ্ঠা- ১৩৬-৩৯।

দফা-৩ : পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি ফেডারেল ব্যাকের অধীনে কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা-৫ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলেরর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক সরকার বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যে কোনো চুক্তি সম্পদন করতে পারবে।

দফা-৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

৬ দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে বাঙালি জনগণকে জাতীয় মুক্তির চুড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায়- **“৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক মুজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকতর ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম-হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি.... ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন মরণো সংগ্রাম”**[৪৬]। ৬ দফা কর্মসূচী জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করলে পাকিস্তানী সরকার এর অপব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।[৪৭] ফলশ্রুতিতে ৬ দফা সহজেই গণমানুষের মনকে স্পর্শ করেছিল এবং এর ভিত্তিতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

(চ) আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঃ

৬ দফা আন্দোলনকে সরকার পূর্ব হতেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে এবং এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য চক্রান্ত মূলক মামলার আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ

[৪৬] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৭৫-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১; পৃষ্ঠা- ২৬৪।
[৪৭] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১১৩।

মুজিবুর রহমানকে ১ নম্বর আসামী করে আরও ৩৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে আইয়ূব-মোমেন চক্র এক মামলা দায়ের করে। আর এই ষড়যন্ত্র ভারতের আগরতলায় করা হয়েছে। তাই এই মামলার নাম দেওয়া হয়েছে আগরতলা মামলা[৪৮]। আইয়ূব-মোমেন চক্রের দমন-নীতি ও চক্রান্তের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ মানুষের মনে উত্তেজনার তীব্র মনোভাব গড়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ও গণ অভ্যূত্থান সংগঠিত হয় এবং গণআন্দোলনটি ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে[৪৯]।

(ছ) ছাত্র সমাজের এগারো দফা ঃ

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনটি ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন এর একাংশ সম্মিলিত ভাবে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এ ফ্রন্টের নাম করণ করা হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন এর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ এ পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি ১১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং আইয়ূব শাসনের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে[৫০]।

(ঝ) ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন ঃ

ক্ষমতাসীন আইয়ূব সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন এতদিন মূলত ছাত্রসমাজ ও প্রাধানত ঢাকা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য গোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করলে দেশের ছোট শহর ও পলী এলাকায় আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। স্বল্পকালের মধ্যেই উক্ত আন্দোলন গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যূত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। এটিই ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যূত্থান বলে অভিহিত। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থান যে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে সূচিত হয়েছিল সেগুলো হলো।[৫১] -

- গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন;
- স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা;
- পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ;
- সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব লোপ;

---

[৪৮] প্রাগুক্ত
[৪৯] প্রাগুক্ত
[৫০] ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশকাল; প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৮২।
[৫১] প্রগুক্ত পৃষ্ঠা-২৩৪।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেন। উক্ত গোল টেবিল বৈঠকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ[৫২]

- প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা
- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন
- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের প্রবর্তন

ফলে সাধারণ আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ূব খান তদানীন্তন সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতির অঙ্গন হতে বিদায় নেন।

(জ) ইয়াহিয়ার শাসনামল ঃ

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি মাধ্যমে ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল সহ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন। জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে ব্যারেকে ফিরে যাবার প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর আরও ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ভিত্তি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য তিনি ১৯৭০ সালের ৩০ শে মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন[৫৩]। এর মাধ্যে ছিল-

- **নির্বাচনসংক্রান্ত বিধান**[৫৪]
  - নির্বাচনের ভিত্তি হবে সার্বজনীন ভোটাধিকার
  - সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি
  - জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব প্রদান
- **জাতীয় পরিষদেরগঠনসংক্রান্ত বিধান**[৫৫]
  - জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে
  - ৩০০টি সাধারণ আসন ও ১৩টি মহিলাদের সংরক্ষিত আসন
  - জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হবে[৫৬]।

[৫২] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১১৩।

[৫৩] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১২২।
[৫৪] প্রাগুক্ত
[৫৫] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(ঞ) ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ফলাফল ঃ

১৯৭০ সালের নির্বাচনই স্বাধীনতা উত্তর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রথমে ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলা উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত আনলে ঐ সব এলাকার নির্বাচন পিছিয়ে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ এ নেয়া হয় এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ২৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এবং বেশকিছু নির্দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বিন্দ্বিতা করেন। এর মাঝে ১০টি রাজনৈতিক দল ছিল সুসংগঠিত । এর মধ্যে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল হচ্ছে জনগণের প্রিয় সংগঠন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম পার্টি জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি[৫৭]।

সারণী ঃ ০৭

পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল (পূর্ব পাকিস্তান)

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	আসন	ভোট প্রাপ্তি (শতকরা হার)
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	৭২.৫৭
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	৩৬	-	১.৮৩
ন্যাপ (পিকিং পন্থী)	১৫	-	.৩০
ইসলাম পছন্দ দলসমূহ	৫১৫	১	১৭.৮৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৩৯	১	৭.৭২
সর্ব মোট	৮৬৭	১৬২	১০০

ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১; পৃষ্ঠা- ২৮২।

সারণী ঃ ০৮

পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল (পশ্চিম পাকিস্তান)

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	আসন	ভোট প্রাপ্তি (শতকরা হার)
পাকিস্তানপিপলস পার্টি	১১৯	৮১	৪২.২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১৫৮	১১	১০.২
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৬৯	৭	১০.৮
পাকিস্তানডেমোক্রেটিক পার্টি	২৭	-	১.৮
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৯	৪	৬.৫

[৫৬]অলি আহাদ, রাজনীতি ১৯৭৪ থেকে ৭৫, খোজরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ২০০২। পৃষ্ঠা- ৪৩০-৩৮।
[৫৭] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১; পৃষ্ঠা- ২৬৪।

অন্যান্য ইসলামী দল	১৪৭	১৪	১০.২
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	১৯	৬	
ন্যাপ (পিকিংপন্থী)	৪	-	
আওয়ামী লীগ	৯	-	
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	২২৩	১৫	
সর্বমোট	**৮৫৪**	**১৩৮**	**১০০**

ড. হারুন-অর-রশিদ, বাঙলাদেশ রাজনতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০,
নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১; পৃষ্ঠা-২৮২।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে ১৯৭০ সালের ৯ ডিসেম্বর সংখ্যা লন্ডন টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয় ছিল The Frist and Perhaps Last Election" প্রকৃত অর্থেই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন[৫৮] ।

৩.৩ স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারাবার ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই কূটকৌশল হিসেবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার দু'দিন পূর্বে ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করণের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র জনতা রাজপথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এসময় বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে হরতালের ডাক দেন। কার্যত ১ মার্চ থেকে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২ মার্চ রাতে কার্ফূ জারি করা হয়। ছাত্র জনতা কার্ফূ ভঙ্গ করলে সেনাবাহিনী গুলি চালায় এতে প্রতিদিন শতশত লোক আহত হয়। চারদিকে বিদ্রোহ আর গগন বিদারী শোগান। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জনতার সমাবেশ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি তে ছাত্র সমাজের স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ, স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন। ১৯৭১ মালের ৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবস্মিরণীয় দিন । এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

[৫৮] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাঙলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১; পৃষ্ঠা- ২৮২।

রহমান তার জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন । বঙ্গবন্ধুর তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনীতি ও বাঙালিদের বঞ্চনার ইতিহাস ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ, ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরার পর ঘোষণা দেন **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম**। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব বাংলার সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন বাঙালির জাতীয় উত্থানের স্বাক্ষর করেন। ১৯৭১ সাল ২৫ মার্চ পর্যন্ত সারা বাংলায় সর্বাত্মক অহযোগ পালিত হয়। ২৫ মার্চ সারাদিন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সন্ধ্যায় কোনোরূপ ঘোষণা ছাড়াই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। এই দিন রাত প্রায় ১১ টার দিকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার লেলিয়ে দেয়া বাহিনী অতর্কিত নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ট্যাঙ্ক, কামান, ভারী মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্বিচারে আক্রমণ চালায়। ২৫ মার্চ বাঙালির ইতিহাসে একটি কালো রাত্রি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত্রিতে শেখ মুজিবুর গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। কিন্তু তার সেই স্বাধীনতার ঘোষণা ঐ মুহূর্তে শোনা যায়নি। তবে ২৬ শে মার্চ রেডিও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কেন্দ্র হতে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করেন[৫৯]। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী গৌরবোজ্জল ও বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যূদয় ঘটে স্বাধীন সর্বাভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ।

[৫৯] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১২২।

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্র

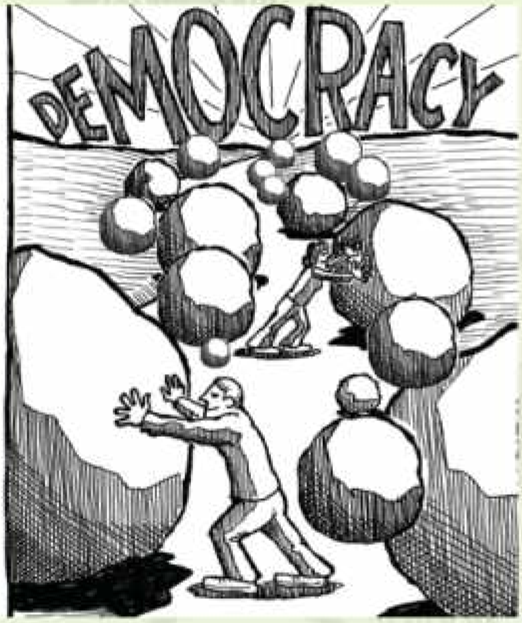

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ উৎপত্তি ও বিকাশ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্র একটি বহুল আলোচিত বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অপর কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বেশী আলোচনার ঝড় বা এত বেশী বিভ্রান্তীর সৃষ্টি হয়নি[৬০]। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরীতেই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। গ্রীক ঐতিহাসিক থুসাইডিডেস তার **পেলোপোনেসীয়** যুদ্ধের ইতিহাসে গণতন্ত্র শব্দটি উলেখ্য করেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হেরোডোটাস নামে এক গ্রীক ঐতিহাসিক গণতন্ত্রের ধারণার আলোচনায় বহুজনের শাসন এবং সমাজে সম অধিকারের কথা বলেছেন। এই সময় **ক্লিওন** নামে আর একজন গ্রীক পন্ডিত গণতন্ত্রকে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন বলে উলেখ করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে **পেটো এ্যারিষ্টটলের** আমলে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এই সয় গণতন্ত্র বলতে জনগণতন্ত্র কে বোঝানো হত। এবং তা নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হত। গ্রীসে বহুজনের শাসনকেই গণতন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হত। বিখ্যাত গ্রীক **দার্শনিক পেরিক্লিস** এর মতানুসারে যেখানে সরকারি কর্মচারিগণ গুণগত বিচারে নিযুক্ত হয় এবং আইনানুসারে যেখানে সকলে সমান, তেমন এক সরকারই হল গণতন্ত্র। বস্তুত পক্ষে প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের নগর রাষ্ট্র গুলিকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়[৬১]। গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলোতে কিন্তু গণতন্ত্র বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পেরিকিসের পর সেখানে বিশেষ করে এথেন্সে যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার ফলে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। অপরদিকে রোমে অবশ্য **প্যাট্রিসিয়ান** এবং **পিবিয়ানদের** সাথে সংঘর্ষের ফলে সমানাধিকার ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেখানে তখন রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে এক ধরনের মিশ্র সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়[৬২]। গ্রীসের মত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও গণতন্ত্রের ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালে ভারত বর্ষের সমাজব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক সংস্থা ও রীতিনীতির অস্তিত্ব দেখা গেছে। বৈদিক যুগে এবং পৌরনিক যুগে সভা সমিতি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বর্তমান ছিল। সেই সময় প্রজাসাধারণের বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হত। এ বিষয়ে পৌরাণিক যুগের ধর্ম গ্রন্থসমূহে উলেখ আছে। প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ সমাজেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলণ দেখা যায়[৬৩]। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গণতন্ত্র সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা দেখা যায়নি। ইউরোপের কয়েকটি দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গণতান্ত্রিক ধ্যান- ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। যথার্থ বিচারে বর্তমান শতাব্দীতেই গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা দুনিয়া জুড়ে বিশেষ আলোড়ণের সৃষ্টি করে এবং অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভকরে। তবে মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের মহাসনদ (১২১৫) গৌরবময় বিপব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

[৬০] ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকাল;প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা;৫২০।
[৬১] প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা - ৫২১।
[৬২] ভুঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, আধুনিক সরকারের সমস্যাবলী, গোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড; প্রকাশ , প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১২৮।
[৬৩] ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকাল;প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা;৫২০।

১৭৭৬ এবং ফরাসী বিপব ১৭৮৯ আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশে সাহায্য করেছে। আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধনতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাতের সময় থেকে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে। তবে গণতন্ত্রের ধারণাটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে। বস্তুত গ্রীস ও রোম থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বান্ত্রবাদ, হিতবাদ ও উদারনৈতিক ধ্যান-ধারনার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে[৬৪]।

পশ্চিম ইউরোপে গণতন্ত্রের বিকাশ আর উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশের ধারাকে এক করে দেখা ঠিক নয়। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্স ও ব্রিটেনে গণতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাস অনেক পুরনো। বিপবের সাথে সাথে ফ্রান্সের রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার বিলোপ ঘটে, সেই সাথে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাও বিলোপ পায়। এদের পতনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় গণতন্ত্রের বিকাশের ধারা। অন্যদিকে ব্রিটেনে শিল্প বিপবের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় একটি কর্মজীবী শ্রেণী, যারা ব্রিটেনে গণতন্ত্রের বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখে। ১৮৭০ সালে যেখানে পশ্চিম ইউরোপের মাত্র একটি দেশ, সুইজারল্যান্ডে গণতন্ত্র ছিল, সেখানে ১৯২০ সালে প্রায় সবকটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে[৬৫]। হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন তার Democracy's Third Wave (1991) শীর্ষক বহুল আলোচিত একটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ভাবে গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি ধারা বা স্রোতের কথা উলেখ করেছেন । তিনি বলেন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে আবার পতন ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রথম ধারার পতনের পর জন্ম হয়েছে দ্বিতীয় ধারার এবং তার পতনের পর জন্ম হয়েছে তৃতীয় ধারার। তার মতে গনতন্ত্রের তৃতীয় ধারা বিশ্বে বর্তমানে বহমান। তিনি একবিংশ শতাব্দিতে নতুন একটি চতুর্থ ধারা বিকাশেরও ঈঙ্গিত দিয়েছেন[৬৬]।

ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই সময়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা সর্বাধিক। ২০০১-২০০২ সালে সম্পাদিত ফ্রিডম হাউজের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিশ্বের সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা ৬৫ ভাগ এখন বসবাস করছেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে। জাতিসংঘের ১৯২ সদস্য রাষ্ট্রের ১২১টি রাষ্ট্রের শতকরা ৯৩ ভাগ বিদ্যমান রয়েছে নির্বাচিত সরকার। অথচ ১৯৮৭ সালে ১৬৭ রাষ্ট্রের মাত্র ৬৬টি রাষ্ট্রের শতকরা ৪০ ভাগ ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। জাতিসংঘের একটি সংস্থা ইউএনডিপির এক রিপোর্ট এ বলা হয়েছে, ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বের ৮১টি রাষ্ট্রে গনতান্ত্রয়ণের প্রবাহ শক্তিশালী হয়েছে। ৫৩টি রাষ্ট্র সামরিক শাসকদের কবল

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫২১-৫২২।
[৬৫] Larry Dimond, Three Pradoes of Democracy, Journal of Democracy, Summer, 1990.
[৬৬] Samuel P. Huntington: Democracy's Third Wave (1991), Journal of Democracy, Spring , 1991.

থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ায়। ল্যাটিন আমেরিকায় গণতেন্ত্রর ধারা শক্তিশালী হয়। শক্তিশালী হয় মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে, বিশেষ করে বার্লিনের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার পরে। আফ্রিকা এবং এশিয়াতেও গণতন্ত্রের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রের প্রবাহ শুধু আরব বিশ্বে এখনো তেমন শক্তিশালী হয়নি। ১৭টি দেশের মধ্যে চারটি দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে[৬৭]। তবে আরবে বর্তমানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আরব বসন্ত বলে উলেখ করেছেন।

৪.২ গণতন্ত্র কি?

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিভাষায় গণতন্ত্র কথাটি অত্যন্ত আবেগময় এবং গণতন্ত্র বিভিন্ন মতবাদীরা বিভিন্নরুপে ব্যবহার করেছেন। এমন কি আমরা এও দেখতে পাই যে বামপন্থী একনায়কগণও নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক হিসাবে অভিহিত করে মর্যাদা বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমিউনিষ্ট চীন ও সাবেক পূর্ব জার্মানীর নাম উলেখ করা যেতে পারে। অবশ্য ফ্যাসিবাদী ও অন্যান্য অনেক ডানপন্থী গণতন্ত্রকে এবং সে সঙ্গে ইহার সকল নীতি পদ্ধতি গ্রহণ ও মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। বর্তমান সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নবোদ্ভুত দেশগুলি গণতন্ত্র অর্জন করাকে তাদের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। বলতে গেলে গণতন্ত্রকে প্রায় সর্বত্রই উত্তম হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।

Democracy হল গণতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ। Demos ও Kratos এই দুটি গ্রীকশব্দ থেকে ইংরেজী Democracy শব্দটি সৃষ্টি হয়। গ্রীক শব্দ Demos মানে হল জনগণ এবং Kratos মানে হল শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জনগণের শাসন[৬৮]।

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক গণতন্ত্রের যে সকল সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেইগুলিকে দুইটি প্রধান ভাবধারায় শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যথা- ১. গণতন্ত্র বলতে শুধু এক বিশেষ ধরণের সরকারকেই বুঝায়। যেখানে জনসাধারণ বা বহুব্যক্তি দেশে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন[৬৯]।

২. অপর ভাবধারা অনুযায়ী গণতন্ত্র বলতে শুধু এক ধরনের শাসন ব্যবস্থাকেই বুঝায় না বরং গণতন্ত্র সর্বাগ্রে মনুষ্য সমাজের দর্শন বিশেষ এক জীবনধারা এক ধরনের ধ্যান- ধারণা ও মনোভাব। এটি কেবল রাজনৈতিক

[৬৭] ড. আহমদ, এমাজউদ্দীন, গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মৌলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০; পৃষ্ঠা : ১৬-১৭।
[৬৮] ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকাল;প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা;৫২০-৫২১।
[৬৯] H. S. Maine, Popular Government, page : 59.

ক্ষেত্রেই নয় বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কোন সমাজের সদস্যগণের পারস্পারিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে[৭০]।

Lord Bryce গণতন্ত্রের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন- Democracy is that form of government in which the ruling of a state is legally vasted, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole[71].

Charles E. Merriam গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাপকতার ধারণা ব্যক্ত করেছেন- æDemocracy is not a set of formulas or a blueprint of organization but a cast of thought and a mode of action directed toward the commonweal as interpreted and directed by the common will" [72]|মেরিয়াম সাধারণ কল্যাণ বলতে কেবল রাজনৈতিক বিষয়াদিকেই বুঝান নাই' এতে ব্যাপক পরিমাণ বস্তুগত লক্ষ্য ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা অন্তর্ভূক্ত যেমন- নাগরিকগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, মানবিক ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটনা ও সমৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি।

অপর একদল লেখক মতামত ব্যক্ত করেন যে, গণতন্ত্র কেবল একধরণের শাসন ব্যবস্থাই নহে, বরং এটি এক ধরণের সমাজব্যস্থাও বটে। ইহা **Walter Lippmann**এর ভাষার, æIt is more intimate and more important than any theory of government" শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে কোন মতবাদের তুলনায় অধিকতর সুপরিজ্ঞাত এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ[৭৩]।

A. D. Lindsay গণতন্ত্রকে এক ধরণের শাসন ব্যবস্থা হিসাবে এবং একই সময় গণতন্ত্রকে এক আদর্শ রূপ হিসাবে গণ্য করেছেন। তার দৃষ্টিতে গণতন্ত্র যে কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন কিছু অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীন নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের উপায় বিশেষ[৭৪]।

Harold J. Laski এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে মানুষের নিজেদের আপন সত্ত্বা ঘোষনা করতে এবং এই সত্ত্বা ঘোষণার পথে সকল বাধা অপসারণ করত তাদের প্রচেষ্টাই গণতান্ত্রিক ধারণার মূলকথা। তিনি গণতন্ত্রের

---

[৭০] প্রাগুক্ত
[৭১]L. Bryce, Mordern Democracies, Vol. 1, Page 22.
[৭২]C. E. Marriam, The New Democracy and The New Desposition, Page 44.
[৭৩]Walter Lippmann , Public opinion, Page : 252.
[৭৪]A. D. Lindsay, Essentials of Democracy, Page : 25-27.

বিকাশের ভিত্তি হিসাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত অসাম্য বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষন পর্যন্ত সেখানে কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না[৭৫]।

Professor Maclver বলেন- æDecmocracy is not a way of governing, Whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly, to what ends"[76]. কাজেই ম্যাকাইভারের মতে, গণতন্ত্র প্রধানত শাসক নির্ধারণের উপায় মাত্র। আর জনমত যাচাই বা নির্বাচনের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

Abraham Lincolnমতে æ Democracy is a government of the people, by the people and for the people" | কিন্তু আসলে সমগ্র জনগণ কখনো শাসন করে না; জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ জন্য Abraham Lincoln এর উপরিউক্ত আংশিক ভাবে পরিবর্তন করে বলা হয় যে, æDemocracy is a government of the people, for the people and by an elite of the people".

Professor Seeley লিখেছেন গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সকলেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

Professor Diceyবলেছেন æDemocracy is such a governement in which the governement body is a comparatively large fraction of the total population"[77].

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকের কাছে গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক আদর্শ রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়। এ হল একটি জীবনধারা বা জীবন যাপন পদ্ধতি । গণতান্ত্রিক জীবনধারা বলতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গ, চিন্তা চেতনা ও আচার আচরণকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের ভিত্তি হিসাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর আস্থা, পারস্পরিক মত বিনিময় ও আলাপ আলোচনার উপর নির্ভলশীলতা, যে কোন রকম বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ, অপরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ প্রভৃতির কথা বলা হয়। **ম্যাক্সি** বলেছেন ঃ It is a search for way of life in which the voluntary free intelligence and activity of man can be harmonised and coordinanted with the least possible

[৭৫]H. J. Laski, Democracy, in Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 5, Page 76-85.
[৭৬]Professor Maclver, The Web of Government, Page : 148.
[৭৭] ভুঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, আধুনিক সরকারের সমস্যাবলী, গোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড; প্রকাশ , প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

coercion.গণতান্ত্রিক জীবনধারায় পারস্পারিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বলপ্রয়োগ একেবারে অস্বীকার করা হয়[৭৮]।

উপরিউক্তি আলোচানর প্রেক্ষিতে একথা বলা যেতে পারে যে, গণতন্ত্র হচ্ছে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে গঠিত ও পরিচালিত সরকার। এর অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর মতামত ও স্বার্থকে উপেক্ষা করবে। বরং গণতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। এই সরকার জনমতের ওপর ভিত্তিশীল। জনগণই গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রাণবিন্দু।

৪.৩ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল কথা হল এই যে, শাসন ক্ষমতার উপর জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান থাকে। এই ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগন। **জে এস মিল** বলেন-The whole people or some numberous protion of them exercise the gtoverning power through deputies periodically elected by themselves[79].গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উলেখকরা দরকার।

১. গণতান্ত্রিক শাসব্যস্থা বলতে বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বোঝায়। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সর্বসাধারণের সরাসরি শাসন এখন অসম্ভব। এই কারণে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।
২. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এই জনপ্রতিনিধিরাই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জনগণ এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন।
৩. গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশের সকল মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে না। তা ছাড়া যে সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তাদের সকেলই শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের

[৭৮] ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকাল;প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা;৫২৫।
[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা;৫২৭।

নিয়ে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়। সুতারং গণতন্ত্র জনগণের সমগ্র অংশের নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শাসন মাত্র।

৪. গণতন্ত্রে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু শাসনকার্য কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থেই নয়, সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য পরিচালিত হয়। এ ধরণের শাসনব্য ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. দেশবাসীর সংখ্যালঘিষ্ট অংশও গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করে। কারণ সর্বসাধারণের স্বার্থে এই সরকার পরিচালত হয়। এই কারণে একে জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার বলে।

৬. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত হল গণতন্ত্রের প্রাণ। গণতন্ত্রের জনমতকে উপেক্ষা করা যায় না। জনমতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৭. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

৮. রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলতে শাসনকার্যে সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ সুবিধাকে বোঝায়।

৯. দল ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য দলপ্রথার অস্তিত অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

৪.৪ গণতান্ত্রিক সরকারের প্রকারভেদ

শাসনকার্য পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতির ভিত্তিতে গণতন্ত্র দু ধরণের হয়;

- বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র
- পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র।

(ক) বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ঃ

প্রত্যক্ষভাবে গণতন্ত্রই হল বিশুদ্ধ গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ রকম শাসনব্যবস্থায় জনগণই সরকারি যাবতীয় কাজ নিজেরাই সম্পাদন করে। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের নগর রাষ্ট্রসমূহে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ান্তর নির্ধারিত স্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন করত, সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করত, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ করত, পররাষ্ট্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এমন কি তার বিচার বিভাগীয় কার্যাদিও সম্পাদন করত। এইভাবে নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই হল প্রত্যক্ষ

গণতন্ত্র। তাই এই শাসন ব্যবস্থাকে অংশ গ্রহণকারী গণতন্ত্র ও বলা হয়। নাগরিকরা আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকরার জন্য যে জায়গায় মিলিত হয় এথেন্সে তাকে বলা হত এক্লেসিয়া । রোমে এই স্থানটির নাম ছিল মিলিশিয়া।

(খ) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্র ঃ

বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিত্ব মূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই বোঝায়। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করে। জনগণ এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। একেই পরোক্ষ গণতন্ত্র বলে। **J.S. Mill**এর মতানুসারে It is a form of government where.... the whole people numerous portion of them exercise the governing power through deputies, periodically elected by themselves[80]. এ ধরণের শাসনব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের কাজকর্মরে জন্য জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন।

৪.৫ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গুণাগুণ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে গণতন্ত্রের যেমন অন্ধ সমর্থক আছেন, তেমনি ঘোরতর বিরুদ্ধবাদীদেরও অভাব নেই। গ্রীক পন্ডিত এ্যারিষ্টটল থেকে শুরু করে বেন্থাহম টকভিল বার্কার ব্রাইস ল্যাস্কি প্রভৃতি চিন্দাবিদগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করেছেন। আবার কার্লাইল লেকী হেনরী মেইন, নীটসে ট্রিটসে বুন্টসলি প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করেছন কঠোরভাবে। মার্কসীয় চিন্তাবিদগণ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গুণাগুণযথাযথভাবে অনুধাবন করা দরকার।

১. স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, প্রত্যেকেই তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এই স্বাভাবিক অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি।
২. **বেন্থাহম জেমস মিল** প্রমুখ হিতবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণও গণতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থক। হিতবাদী তত্ত্বে বলা হয় যে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক মঙ্গল সাধনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

---

[৮০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা;৫২৭।

৩. আদর্শবাদী তত্ত্বে গণতন্ত্রের স্বীকৃতি ও সমর্থন পাওয়া যায়। আদর্শবাদ বলা হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যক্তি আত্মবিকাশের সর্বাধিক সুযোগ পেতে পারে। গণতান্ত্রিক সকার জনগণের নিজস্ব সরকার। জনগণ নিজেরাই সরকার গঠন করে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে এবং স্বাধীনতা সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৪. গণতন্ত্র হল ন্যায়নীতি ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গণতন্ত্রে দেশের সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। আলাপ আলোচনার ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. **অধ্যাপক ল্যাস্কির** মতে জনকল্যাণ সাধন যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তবে রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব জনগণের হাতেই থাকা আবশ্যক। কারন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণীর স্বার্থেই সরকার পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রেই কেবল রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাই গণতন্ত্রে সর্ব সাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানের জন্য সরকারী ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।

৬. **জন স্টুয়ার্ট** মিলকে অনুসরণ করে বলা হয় যে সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে জনগণের মানসিক উন্নতি সাধনও দরকার। গণতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের অবাধ সুযোগ রয়েছে।

৭. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এতে জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। এর সুদুরপ্রসারী ফল হিসাবে জকল্যানমুখী দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮. গণতন্ত্রের স্বপক্ষে আরও একটি দাবী হলঃ এটি সংঘর্ষ বা বিপবের আশংকা থেকে মুক্ত। এ শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রতীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত। মূল কারণ - গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস হল ব্যালট এবং শাসনের ভিত্তি হল শাসিতের সম্মতি।

৯. জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ প্রীতির সৃষ্টি হয় এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। এই দেশপ্রেম কালক্রমে আন্তর্জাতিকার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

১০. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার আশংকা থাকে না। কারণ এ ধরনের শাসনব্যবস্থা হল জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। প্রকৃত প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসিতের প্রতি শাসকের দায়িত্বশীরতা সুনিশ্চিত হয়।

১১. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সরকারের পিছনে জনসাধারণের ব্যাপক সম্মতি বর্তমান থাকে। সেজন্য গণতান্ত্রিক সরকার স্থায়ী হয়।

১২. গণতন্ত্রে আইনের অনুসাশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল রকম বৈষম্যমূলক আচরণের পথ রুদ্ধ হয়। কেননা গণতন্ত্রের সকল ক্ষেত্রে জনগণই হল চূড়ান্ত বিচারক।

১৩. গণতন্ত্রে রাজনৈতিক জনগণের সার্বভৌমত্ব বাস্তবে কার্যকর হয়। গণতন্ত্রেই জনগন তাদের ইচ্ছানুসারে সরকার গঠন ও রদবদল করতে পারে এবং সরকার তার সকল কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে।

১৪. গণতন্ত্রে শাসিতের কাছে শাসক দায়িত্বশীল থাকে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। আবার রাষ্ট্রপতি শাসন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনসাধারণের কাছে দায়ত্বশীল থাকেন।

৪.৬ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী

গণতান্ত্রিক আদর্শ সর্বোৎকৃষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা জগতে স্বীকৃত। এর সাফল্যের জন্য কতকগুলি শর্ত পালন আবশ্যক।

জন স্টুয়ার্ট এর মতানসুসারে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন যথা ঃ ১) জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা থাকবে। ২) গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনে জনগণ ইচ্ছুক ও সক্ষম হবে। এবং ৩) গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপরিহার্য কার্য সম্পাদনে জনগণ সম্মত হবে।

১. মিল গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত হিসাবে বিশেষ লক্ষণ যুক্ত বা গুণান্বিত জনগণের কথা বলেছেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ভাবধারা সঞ্চারিত হওয়া দরকার। সাম্য ও সমানাধিকার হল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তাই গণতান্ত্রিক জনগণ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হবে। এর পরিবর্তে নাগরিকরাও সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান পাবে।

২. গণতান্ত্রিক জনগণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বিশেষ এক অবস্থা বা পরিবেশের। অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপক স্বীকৃতির ভিত্তিতে এই পরিবেশ গড়ে উঠেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সকল সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ।

৩. গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একান্ত ভাবে পরিহার্য । এর জন্য উৎপাদনের উপাদানসমূহে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে সকলের সমানধিকার থাকা আবশ্যক। **অধ্যাপক ল্যাস্কি** এর মতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতিরিকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থ হীন Political democracy is meaningless without economic democracy.

৪. দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হল গণতন্ত্রের প্রধান বাধা। অর্থনৈতিক সাম্য ও জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গণতন্ত্রের সাফল্যের সহায়ক।

৫. গণতন্ত্রে জনগণের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা একান্ত ভাবে কাম্য। গণতন্ত্রে সকল মতবাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। সেজন্য এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিরোধী মতবাদ গুলির প্রতিও সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করতে হয়।

৬. গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে অন্যতম শর্ত হিসাবে গণ্য করে থাকেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৭. রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবর্গের ন্যায়নীতি ও বিবেক বোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। অন্যথায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আদর্শ ভ্রষ্ট ও পক্ষপাত দুষ্ট হতে বাধ্য।

৮. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সৎ, সুদক্ষ, অভিজ্ঞ, উদ্যমশীল ও উৎসাহী সরকারী কমচারী আবশ্যক। তারাই হলেন রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ও কর্ণধার।

৯. শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারকে গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলমন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। জনগণের অধিকাংশ যদি অশিক্ষিত হয় তাবে তাদের পক্ষে যোগ্য ও বিজ্ঞ প্রতিনিধি নির্বাচিত করা সম্ভব হয় না। ফলে অজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সেজন্য বলা হয় প্রতিনিধি মূলক শাসনব্যবস্থায় সাফল্যের জন্য জনগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন।

১০. অনেকের মতে লিখিত সংবিধান গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দরকারী। ফলে জনগণ সতর্ক থাকে এবং সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না।

১১. গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বার্থে রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। সুস্থ ও সক্রিয় জনমত গঠন ও প্রকাশের জন্য এর অস্তিত্ব অপরিহার্য। একটি শক্তিশালী ও সুসংহত বিরোধী

দল থাকলে সরকার সব সময় সতর্ক থাকে জনস্বার্থ আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয় এবং স্বৈরাচারী হতে পারে না।

১২. অনেকে আবার গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বার্থে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে থাকেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ ও সার্থকতা সঠিক ভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য জনসাধারণকে সাহায্য করে।

১৩. মিল এর মতানুসারে গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার জন্য সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গণতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে না। তার ফলে জনগণের একটি অংশ সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে দুরে থাকে। তাই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৪. গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আর একটি অপরিহার্য শর্ত হল সুস্থ, সবল ও সদাজাগ্রত জনমত। সদাসতর্ক ও সক্রিয় জনমত সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে এবং সরকারকে গণমুখী করে।

১৫. জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। দেশবাসী নিজেদেরে সংকীর্ণ স্বার্থ সাধনের ব্যাপারে যত্নবান হবে। জনসাধারণের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীর বন্ধন থাকতে হবে।

১৬. গণতন্ত্রের জন্য জাতীয় সংহতি ও ঐক্য আবশ্যক । জনগণের মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যবোধ ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

বর্তমান বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর। তত্ত্বগত বিচারে আদর্শ ও সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা জগতে সর্বজন স্বীকৃত । সেইজন্য বর্তমান দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রেই গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। গণতন্ত্রের এই ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা এর সম্ভাবনাময় উজ্জ্বলতার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ।

৪.৭ গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে অন্তরায়

বিংশ শতাব্দীতেই গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। তাই আধুনিক যুগকে গণতন্ত্রের যুগ বলা হয়। আবার বর্তমান শতাব্দীতেই গণতন্ত্র গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়ছে। গণতান্ত্রিক ধারণা ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আজকাল বিরোধ বিতর্ক ও আপত্তিকর ঝড় উঠেছে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগ ও আশংকার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যাহতি পরেই অস্থির মানসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট স্বরূপ ফ্যাসিজিমের উৎপত্তি হয়। সংকটের অনুকুল আবহাওয়ায় মুসোলিনী ও

হিটলার গণতন্ত্রের কবর রচনায় প্রবত্তৃ হন। ইতালী, ফ্যান্স, ইংল্যান্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট দুনিয়া জুড়ে ক্রমশঃ তীব্রতর হতে থাকে। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি ক্ষমতাশীল হতে থাকে এবং বিপবের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বহুদলীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্বহেতু প্রশাসনিক স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা নষ্ট হতে শুরু করে। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্বল নীতি বিভিন্ন দেশে সংকটের সৃষ্টি করে। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দৃঢ়তা ও সাফল্যের সঙ্গে এই প্রতিকুল অবস্থার মোকাবিলা করতে পারেনি। তার ফলে ফ্যাসিজিম গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামারিক ও সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। স্পেনে ফ্রাস্কো ও দক্ষিণ রোডেসিয়ায় স্মিথের একনায়কতান্ত্রিক ও স্বৈরচারী সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯৪৭ সালের বৃটিশ শাসনের পতনের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। পূর্ববঙ্গ মুসলিম অধ্যুষিত বলে সঙ্গত কারনেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অঙ্গীভুত হয়। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল বৃটিশ শাসনের ভূত পাকিস্তানি শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। পুনরায় শুরু হলো নব্য উপনিবেশিক শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন । সর্বত্র সংকট কিন্তু সর্বোচ্চ সংকট মানুষের গণতান্ত্রিক মুক্তি। নিন্মে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকাররে আমলে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে অন্তরায় গুলো তুলে ধরা হলো।

রাজনৈতিক ঐক্যমতের অভাব

স্বাধীনতার পর অদ্যবধি মূলত এরশাদ শাসনামল বাদে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা করেছে অথচ কখনই এদের মাঝে রাজনৈতিক ঐক্যমত হয়নি। **এস. এম লিপসেট** বলেন-" স্থিতিশীল গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটা প্রয়োজন, যাতে সেখানে শাসকদের পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, ক্ষমতাসীন দলের প্রতি চ্যালেঞ্জ দেখা দেয় এবং শাসক-দলের রদবদল ঘটে। কিন্তু ঐক্য মত ব্যতীত কোন দল টিকতে পারে না। এই ঐক্য মত্যের অর্থ হচ্ছে; রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা শান্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হবে, ক্ষমতা বর্হিভূতরা ক্ষমতাসীনদের সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন এবং ক্ষমতাসীগণ ক্ষমতা বর্হিভূতদের অধিকার স্বীকার করে নিবেন"। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষা

- ✓ দেশে দারিদ্র ও অশিক্ষা যে কোন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেই বানচাল করে দিতে প্রবৃত্ত হয়।
- ✓ দরিদ্রতার ফলে জনগণ সরকারের প্রতি বা দেশের প্রতি বিদ্বেষভাবপন্ন হয় অথবা উদাসিন থাকে।
- ✓ ফলে তাদের উত্তেজিত করা এবং তাদের দিয়ে দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি সহজ হয়।

- ✓ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় জনগণের দরিদ্রতার সুযোগে তাদের নগদ টাকায় কিনতে পারে যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে।
- ✓ ম্যাকআইভারের মতে, কোন দেশে এক সময়ে কৃষিপ্রধান ও অত্যন্ত দরিদ্র হলে, সেখানে কোন ধরণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

আইনের শাসনের অভাব

- ✓ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন হলো আইনের শাসন, কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের শাসন নয়। এ ক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্যই হলো মূল কথা।
- ✓ আইনের প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পন্ন হয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সংসদে।
- ✓ প্রণীত আইন মেনে চলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। কোন আইন মন্দ হলে তা মেনে চলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিবর্তন না হচ্ছে।
- ✓ আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এগুলোর অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

রাজনৈতিক দলের বেহাল দশা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে প্রধানত একটি রাজনৈতিক দল শাসন ব্যবস্থা পরচিলনা করে। অন্যন্য দল বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে পথ নির্দেশ করে। ক্ষমতাসীন দলের নীতি ও কর্মসূচী জনগণের আস্থালাভে ব্যর্থ হলে বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুর হয়।

- ✓ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের অবস্থা অত্যন্ত করুন। যদিও এখানে শতাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে, দলীয় ব্যবস্থা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি।
- ✓ অনেক রাজনৈতিক দলের নেই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী। কোন কোন ক্ষেত্রে দলীয় সংগঠন অত্যন্ত আলগা।
- ✓ কোন কোন রাজনৈতিক দল নেতাকেন্দ্রিক কিছু সংখ্যক ব্যাক্তি কেন্দ্রিক। সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত সুসংহত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা মাত্র কটি।
- ✓ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল কোন সময়ই সরকারী নীতি নির্ধারণ বা বিকল্প নীতি প্রণয়ণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়নি।
- ✓ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম খুব কম সময়ই ছিল অবাধ, কেননা এ অঞ্চলে রাজনীতির প্রবাহ কোনদিনই অবাধ ছিল না।
- ✓ বাংলাদেশের রাজনীতির প্রবাহ বারে বারে বাধাগ্রস্থ হয় সরকারী নিষেধাজ্ঞার কঠোর শিলায়।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশই জনগণের আপনজন নয়

- ✓ সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় ক্ষমতাসীন হয়ে যেমন গণতন্ত্র বিকাশে কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়, তেমনি গণবিচ্ছিন্ন এবং সাধারণ মানুষ থেকে দুরত্বে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গেরও এক্ষেত্রে কোন অর্থপূর্ণ অবদান থাকে না।

- ✓ বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এখানকার শাসনকারী এলিটদের অধিকাংশই জনগণের আপনজন নয়। রাজনৈতিক নেতাই হোন আর প্রশাসনিক কর্মকর্তাই হোন, যারা এতদিন শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেছেন তারা সমাজের এক সংকীর্ণ গোষ্ঠী। জনগণ থেকে বহু দূরে তাদের অবস্থান।

- ✓ জনগণের নামে তারা ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতাই মুখ্য হয়ে দাড়ায়। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তাদের আকর্ষণ দুর্নিবার।

সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে স্পর্শকাতর

- ✓ সরকার বিরোধীআন্দোলনসম্পর্কেক্ষমতাসীনদলঅত্যন্ত স্পর্শকাতর। সরকারের অধিষ্ঠিত দল সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধী দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে উদ্যত হয়।

- ✓ সরকার নিজেদের মূল্যবান সময় এবং সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়েজিত হয় বিরোধী দলের অতীতকে কালিমা লিপ্ত করতে। তাদের বর্তমানকে বিশৃঙ্খলার আবরণে আচ্ছাদিত করতে। শুধু তাই নয়, সরকার তখন সরকারী ব্যয় ও শ্রমে নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমান করার জন্য সরকারী অর্থ অপব্যয়ে লিপ্ত হয়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমকে দলীয় মাধ্যমে রূপান্তরিত করে।

বিকৃত ছাত্র রাজনীতি, যাদের মৌলিক কাজ প্রশ্নবিদ্ধ

- ✓ চর দখলের মত হল দখল।
- ✓ সাধারণ ছাত্রদের শিক্ষাজীবনকে চরম আতঙ্ক, সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।
- ✓ মূল রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তি।
- ✓ মূল রাজনৈতিক দলের লাটিয়াল বাহিনী।
- ✓ হত্যা, সন্ত্রাস, খুন যখম, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করে ছাত্রনেতাদের ব্যাতিব্যস্ত সময় কাটে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন

- ✓ একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যেমন "বাকশাল" গঠন।
- ✓ জিয়া ও এরশাদের সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল।
- ✓ উভয় সামরিক সরকারই বেসামরিকীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন থাকার অপকৌশল অবলম্বন।

- ✓ নির্বাচনে কারচুপি সংস্কৃতির প্রসার যেমন "মাগুরা উপনির্বাচন"।
- ✓ সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্বলতা।
- ✓ বিরোধীদলকে উপেক্ষাকরণ।
- ✓ বিরোধীতার জন্য অহেতুক বিরোধীতা করা।
- ✓ সংসদে অনুপস্থিত থাকা।
- ✓ সংসদকে অকার্যকর করার প্রয়াস চালান।
- ✓ জনমতকে উপেক্ষা করা।

বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ ও চাপ সৃষ্টি

- ✓ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগকে ব্যবহার।
- ✓ প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল বিচারপতিদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল।
- ✓ বিচারপতি নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ একটি গতানগতিক ব্যাপার বাংলাদেশের জন্য।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

- ✓ সরকারি গণমাধ্য যখন যে সরকার তখন তার সম্পদে পরিণত হয়।
- ✓ স্বাধীনতার পর বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত চারটি দৈনিক ব্যতীত সকল দৈনিক বন্ধ ঘোষণা।
- ✓ সাংবাদিক নির্যাতন ।
- ✓ সাংবাদিক গ্রেফতার।
- ✓ টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ, যেমন একুশে টিভি বন্ধ ঘোষণা, ইসলামিক টিভি এবং দিগন্ত টিভি বন্ধ ঘোষণা।

সুস্থ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেনি

- ✓ রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বাকশাল গঠন।
- ✓ স্বৈরাচারি সরকার।
- ✓ সরকার পরিবর্তনে জনরায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ প্রদর্শন।
- ✓ নির্বাচনে কারচুপি, ব্যালট বাক্স লুট ইত্যাদি।

দুর্বল নির্বাচনী সংস্কৃতি

- ✓ কারচুপি।
- ✓ ব্যালট বক্স লুট।
- ✓ উপনির্বাচনে শতভাগ দলীয় করণ।
- ✓ নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করণ।
- ✓ নির্বাচনে অবৈধ টাকার ব্যাপক ব্যবহার।
- ✓ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি।

সামরিক বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব

- ✓ সামরিক অভ্যূত্থান।
- ✓ পাল্টা অভ্যূত্থান।
- ✓ কোর্ট মার্সালে প্রশ্নবিদ্ধ বিচার।
- ✓ সামরিক হত্যাকান্ড।
- ✓ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি দুর্বলতা।

সুষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব

- ✓ স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ শাসনামলে সুষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি এই সময় রাজনৈতিক দল বিধির আওতায় সমস্ত দল নিষিদ্ধ করা হয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে।
- ✓ জিয়ার শাসনামলে রাজনৈতিক দল করার অনুমতি পেলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল দুর্বল প্রকৃতির।
- ✓ জেনারেল এরশাদ এর শাসনামল ছিল স্বৈরাচারী শাসনসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা ছিল সুষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা।
- ✓ এরপর ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক হাওয়া দূষণ মুক্ত হতে পারেনি বরং তা বিভিন্ন অনিয়মের বেড়াজালে হয়েছে দূষিত।

রাজনৈতি দলগুলোর অভ্যন্তরে দলীয় কোন্দল

- ✓ দলের অভ্যন্তরীন কোন্দলে এক দল ভেঙে কয়েকটি হয়েছে, যেমন- ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (ভাসানী)।
- ✓ দল ভেঙে আবার নতুন দল তৈরী হয়েছে, যেমন বিএনপি ভেঙে বিকল্প ধারা হয়েছে।
- ✓ দলীয় কোন্দলে দলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেয়ে মেরুকরণের প্রতি নেতাদের আগ্রহ দেখা যায়।
- ✓ অন্তকোন্দলের ফলে দেশে অরাজগ পরিস্থিতি তৈরী করা হয় এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়।

অবৈধ ভাবে ক্ষমতা দখল

- ✓ খন্দকার মোস্তাক
- ✓ জেনারেল জিয়া
- ✓ জেনারেল এরশাদ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

- ✓ রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থ করতে রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।
- ✓ এই সন্ত্রাসীর জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয় লেজুর বৃত্তি ছাত্র রাজনীতি।

সরকারি ও বিরোধী দলের বৈরি সম্পর্ক

- ✓ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে উভয় দলের মাঝে বৈরি সম্পর্ক হলো অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- ✓ বিরোধী দল বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যহত করছে।
- ✓ সরকারি দলও বিরোধী দলকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন না করে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথকে বাধাগ্রস্থ করছে।

বিরোধী মতামতের প্রতি অসহিষ্ণুতা

- ✓ সরকার বিরোধী দলকে সংসদে সঠিক ভাবে কথা বলতে না দেওয়ার অভিযোগ বরাবর আছে।
- ✓ বিরোধী দলকে সভা-সমাবেশ করতে না দেওয়া।
- ✓ বিরোধী দলকে দমন-পিড়নের মাধ্যমে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি।
- ✓ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যপারে বিরোধী দলকে উপেক্ষা করা।

জাতীয় সংসদকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করা

- ✓ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে জাতীয় সংসদে বিল পাশের সময় বিরোধী দলের মতামতকে অগ্রাহ্যকরা।
- ✓ অসত্য তথ্য প্রদান করে বিরোধী দলকে কন্ঠাসা করার প্রবণতা।

Dhaka University Institutional Repository

- ✓ অশালীন বক্তব্য উপাস্থাপন ইত্যাদি।

বৈদেশিক কর্তাব্যক্তিদের লেজুর বৃত্তি করা

- ✓ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল কোন কোন দেশের লেজুর বৃত্তি করে তানিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ি হরদম হয়।
- ✓ গণতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বড় হুমকি কেননা তখন লেজুর বৃত্তির মূল্য দিতে হয়।
- ✓ বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরতা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিকের কোমল বিষয় ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিহার বিসেবে ব্যবহার

- ✓ সংবিধানে জিয়ার বিসিমিলাহ্ সংযোজন।
- ✓ এরশাদের ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম করা।
- ✓ নির্বাচনের আগে হাসিনার মাথায় হেজাব লাগানো।
- ✓ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে দেশে ইসলাম থাকবেনা বলে বিএনপির ঘোষণা ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট করণ

- ✓ গণতান্ত্রিক শক্তির পূর্ব শর্ত ঐক্য যা মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি ছিল তা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে বিনষ্ট করেছে।
- ✓ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি যেমন- ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা।
- ✓ জিয়ার রাষ্ট্রপ্রতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখা।
- ✓ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে মেজর জলিলকে প্রথমে মৃত্যুদন্ড এবং পরে যাবজ্জীবন এবং কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।

জাতীয় ঐক্য তৈরীতে ব্যর্থ

- ✓ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয়তার পরিচয় প্রশ্নবিদ্ধ হয় দেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদ নাকি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ✓ সংখ্যালঘু এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বন্দ্ব এখন প্রকট।
- ✓ সংখ্যালঘু এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে হাতিয়ার করে চলছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের মহাৎসব।

- ✓ এছাড়াও সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে সম্পর্ক বৈরী যাকিনা জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যহত করছে।

দলীয় করণ নীতির প্রভাব

- ✓ যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বত্র দলীয় করণের নীতি অনুসরণ করে ফলে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ জিম্মি হয়ে পড়ে।

শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রী করণ

- ✓ জিয়া এবং এরশাদ শাসনামলে শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রী করণ বেশী পরিলক্ষিত হয় যে সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শৃঙ্খলিত ছিল।
- ✓ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রায়নের একটি পূর্ব শর্ত।

উপমহাদেশের এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ছিল জনগণের প্রেরণার উৎস। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্য। বৃটিশ ভারতে বাঙালিরাই ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট লাইনে। ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এক অর্থে বাঙালিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। অথচ জনগণের কাক্ষিত গণতন্ত্র আজ প্রশবিদ্ধ এবং নামে মাত্র গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে শুধু সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক অসদাচারণের কারণে।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক দল ও বিরোদলীয় গতি-প্রকৃতি

৫.১ রাজনৈতিক দল

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যকরী ভূমিকা পালন অপরিহার্য এবং অত্যাবশক । এর মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক দলই এ সব রাষ্ট্রে জনপ্রিয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে এবং জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ অর্থ্যাৎ আইনসভা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক নীতি নির্ধারণী কাঠামোয় সংশিষ্ট হয়ে বহুমাত্রিক গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলসমূহের এ সব কর্মকান্ড তাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে তারা সমাজের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে অর্পিত কর্মস্পাদন করে [৮১]। পশ্চিমা উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বের রাজনৈতিক দলগুলো সাংগঠনিক স্থায়িত্ব , তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত স্থিতিশীল সাংগঠনিক কাঠামো, দৃঢ় প্রত্যয়ী নেতৃত্ব এবং নিজ নিজ প্রার্থীদের অনুকূল জনগণের ম্যান্ডেট প্রত্যাশী এবং সে সাথে উপযোগিতা, সুষ্ট বিকাশ এবং জন গ্রহণযোগ্যতা ধারণ করে [৮২]। অপর পক্ষে, বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বিশ্বায়নের ঢেউ দ্বারা প্রভাবিত গণতান্ত্রিক গভর্ন্যান্স এর সাথে সাযুজ্য টেকসই দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজী চিন্তাবিদ **জন লক** রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। সেখানে তারা তিনটি প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত; সেগুলো হল-

(ক) জীবন ধারণের অধিকার **(খ)** স্বাধীনতার অধিকার ও **(গ)** সম্পত্তির অধিকার।

এ অধিকার গুলো ভোগের সুনিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সিভিল সমাজ গঠন করে। এই সিভিল সমাজ এক রাজা (বা পরিষদের) হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে এই শর্তে যে, শাসক মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারগুলো সুরক্ষা করবে [৮৩]। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ইতিহাসসিদ্ধ না হলেও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বা শাসকের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে লকের চিন্তা-ভাবনা সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শিক ভিত্তি বলে স্বীকৃত। আধুনিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার মূলত দলীয় সরকার। একাধিক দলের উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহযোগিতার মানসিকতা এবং গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গীকার সুশাসন অর্থবহ করে তুলতে পারে। এগুলোর অভাব কেবল

[৮১] হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি পেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭০।

[৮২] S. P. Huntington, Plitical Order in Changing Societies, New Haven : London: Yale University press , 1968, P. 12, হাসানাউজ্জামান প্রাগুক্ত।

[৮৩] John Locke, of Civil Government (Chicago, 1962), Chapter 19.

প্রতিহিংসা, কাদা ছোড়াছুড়ি, অসত্য বচন, অশালীন বচসা, নির্লজ্জ দলবাজি ও দ্বন্দ্ব সংঘাত এর ছড়াছড়ি রাজনীতিকে করবে বিষাক্ত, সুশাসন থাকবে সুদূর পরাহত[৮৪]।

৫.২ রাজনৈতিক দলের পরিচয়

রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা Stasiology নামে পরিচিত। এই শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে Stasis নামক একটি গ্রীক শব্দ থেকে। এই স্ট্যাসিস (Stasis) শব্দের অর্থ হলো বিরোধিতার মনোভাব। যাইহোক বর্তমানে দল-ব্যবস্থা হল গণতন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ[৮৫]।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত কতগুলো মূল বিষয়ে সমমতাবলম্বী হয় এবং মতাদর্শের মুলগত ঐক্যের ভিত্তিতে দেশের উন্নতি বিধানের জন্য শাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারী ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করে তবে সেই সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের রাজনৈতিক দল বলে[৮৬]।

J. S. Schumpeterরাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় বলেন A party is a group whose member propose to act in concert in the competitive struggle for political power[৮৭].

H. J. Laskiমনে করেন- A party is a particular body of opinions which is nonetheless concerned with the general national interest and which forms and presents to the choice of the electorate a programme of general scope and width[88].

C. J. Friederichএর মতে - A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leaders the control

---

[৮৪] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশ কাল-ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৩।

[৮৫] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃত পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর , ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৫৭৩।

[৮৬] প্রাগুক্ত।

[৮৭]J. S. Schumpeter, Captalism, Socialism and Democracy, 1951, Page; 283.

[৮৮]H. J. Laski, Parliamentary Government in England, 1951, Page;81.

of government, and with the further objective of giving to members of the party, through such control, idea and material benefits and advantages[৮৯].

অধ্যাপক লাসওয়েল এর মাতানুসারে রাজনৈতিক দল হল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচনে কর্মসূচী স্থির করে এবং প্রার্থী দাড় করায়[৯০]।

R. M. MacIverরাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় নির্দেশ করেছেন এভাবে " We may define a political party as an association organised in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavours to make the determinant of government"[৯১].

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশেষণ করে সহজভাবে বলা যেতে পারে যে রাজনৈতিক দল বলতে একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এমন একদল নাগরিককে বোঝায় যারা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সরকার দখল করার চেষ্টা করে।

৫.৩ রাজনৈতিক দলের বেশিষ্ট্য

সংজ্ঞা বিশেষণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

- সম-মতাদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তবে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রসঙ্গে দলের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু মতাদর্শের মুলগত ঐক্য বর্তমান থাকে।
- প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। এই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপাপয়িত করার জন্য দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক এবং সংবিধান সম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়।
- রাজনৈতিক দল মাত্রই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রত্যেক দল সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থে আত্মনিয়োগ করে। অন্যথায় তা চক্রীদলে পরিণত হয়[৯২]।
- দেশ ও দেশবাসীর সমসাময়িক সমস্যাদি সম্পর্কে অবারিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দল নিজ মতাদর্শের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

---

[৮৯] C. J. Freiderich, Constitution, Government and Democracy, Page; 419.
[৯০] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃত পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর , ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৫৭৪।
[৯১] R. M. MacIver, The Modern State , Ch. 13, page 396.
[৯২] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃত পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর , ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৫৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের চুড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হলে সরকার গঠন করা এবং শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা।
- কেবল নাগরিকগণই রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন; বিদেশীগণ পারেন না। জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং কর্মপন্থার বিভিন্নতা হেতু রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়ে থাকে[৯৩]।

৫.৪ রাজনৈতিক দলের উৎপত্তিগত উৎস

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হতে পারে। কোন দেশেরই সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে একইরূপ মত পোষণ করে না। সুতরাং এক মতাবলম্বী একদল লোক সংঘবদ্ধ হয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে।

যে সমস্ত দেশে ধর্ম, বর্ণ জাত বা ভাষার কারণে এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধীতা বর্তমান থাকে সেই সমস্ত দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়িক দলের সৃষ্টি হতে পারে। আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

কোন কোন দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্নে মতপার্থক্য উপস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবার পরেও এর অস্তিত্ব থেকে যায়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পরিধি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তা কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দল প্রথা গড়ে উঠে।

কিন্তু আধুনিক কালে অর্থনৈতিক কারণেই প্রধাণত ঃ দলের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। যেমন সামন্তবাদী সমাজে একদিকে ভূমির মালিক ও অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষক এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে একদিকে পুঁজিপতি ও অন্যদিকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দলের উৎপত্তি হয়। একই স্বার্থ ও মতালম্বী ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই একটি দলের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আশা-আঙ্খাকা ও আদর্শকে প্রকাশ, প্রচার ও কার্যকরী করার চেষ্টা করে।

---

[৯৩] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃত পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর , ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৫৭৫।

আধুনিককালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমস্ত দেশে একটি দলের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃবৃন্দ বিপবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং অন্যান্য দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব এই সকল দেশে পুঁজিপতি, জোতদার, ধনিক শ্রেণীর শোষণ হতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিত্বকারী একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

৫.৫ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীভাগ

রাজনৈতিক দলের সংখ্যার প্রেক্ষিতে দলীয় ব্যবস্থাকে মুলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে;

- একদলীয় ব্যবস্থা (One-party system)
- দ্বি-দলীয়ব্যবস্থা (Bi-party system)
- বহুদরীয় ব্যবস্থা (Multy-party system)

সমগ্র দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলে তাকে এক-দলীয় ব্যবস্থা বলে। দেশে এই একমাত্র দলটি তার আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচীর অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। যেমন - গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, তানজানিয়ার একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হলো-তানজানিয়া আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন। কেনিয়ায়- কেনিয়া আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন। অধ্যাপক দেবন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদান। এক দলীয় ব্যবস্থায় এই স্বাধীনতা অস্বীকৃত[৯৪]।

যে রাষ্ট্রে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল থাকে, সেই রাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-party system) বলে। একটি দল সরকার গঠন করে এবং অপর দলটি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। তবে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দু'টির বেশী রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। কিন্তু সুসংবদ্ধ দল মাত্র দু'টি থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইংল্যান্ডের কথা বলা যায়। ইংল্যান্ডে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। একটি রক্ষণশীল দল (Con-Servative Party) এবং অপরটি শ্রমিক দল (Republican Party)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ। দেশের দুটি দল ঃ সাধারণতন্ত্রী দল (Republican

[৯৪] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃত পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর , ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৫৯২।

Party) অপরটি গণতান্ত্রিক দল (Democratic Party) । কঠোর দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা, দলের সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস প্রভৃতিও সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দেখা যায়[৯৫] ।

দেশে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকলে তাকে বহু-দলীয় ব্যবস্থা (Multy-party system) বলা হয়। অর্থ্যাৎ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুটির বেশী সাংগঠনিক দল থাকলে তাকে বহু-দলীয় ব্যবস্থা বলে। এই দলগুলো জাতি, ধর্ম, ভাষা বা শ্রেণীর ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে । বহু দলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি দল যে যার মত মতাদর্শ ও কর্মসূচী অনুসারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে কোন দল একক ভাবে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে, সেই দলই ক্ষমতাসীন হয়। ফ্রান্সের দল-ব্যবস্থা হল বহু-দলীয় ব্যবস্থার উপযুক্ত উদাহরণ[৯৬]। বাংলাদেশও বহুদলীয় ব্যবস্থার দেশ।

৫.৬ রাজনৈতিক দলের উপাদান

- কতিপয় **মৌলনীতি** সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সমঝোতা থাকা আবশ্যক যার মাধ্যমে তারা একটি রাজনৈতিক ইউনিটে একত্র হতে পারে।
- একই মতালম্বী স্ত্রী-পুরুষকে অবশ্যই **সুসংঘবদ্ধ** হতে হেব।
- সুসংঘবদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট **কার্যক্রম** জনগণের সামনে উপস্থিত করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই **সাংবিধানিক উপায়ে** এর নীতিমালা কার্যকর করতে হবে।
- প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে **জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের** উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে হবে।

৫.৭ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলীয় ব্যবস্থা

এ অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজনৈতিক দলসমূহের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং কালক্রমে মাস (Mass) পার্টির উদ্ভব হলে এ সব দলের ব্যানারেই স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নাম এ প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ত্রিশটি বা তার অধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ছিল। অবশ্য এ সব দলের অধিকাংশেরই দৃঢ় জনশক্তি ছিল না। সর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক সক্রিয় দলের মধ্যে **পাকিস্তান মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক শ্রমিক দলের** নাম উলেখযোগ্য[৯৭]।

---

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯৩।
[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯৫।
[৯৭] হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি পেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯,

১৯৪৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও নেতৃত্বের বিপক্ষে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা কিছু গ্রুপ ও পূর্ব বঙ্গের রাজনীতিবিদগণ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে এ দল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জমিদার ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদার দাবিতে মুসলিম লীগ শাসক শ্রেণীর বিপক্ষে বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উলেখ্য যে পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপক্ষ রাজনৈতিক জোট যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ জোটের অন্যতম শরিক দুটি দল ছিল **এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি** এবং **আওয়ামী লীগ** যারা ছিল পূর্ব বাংলার উদীয়মান দাবিদাওয়া ও স্বদেশীয় এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ থেকে মুসলীম শব্দ বাদ দেওয়া হয় যা এ দলের ধর্মনিরপেক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে। তবে এ দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে বামপন্থী গ্রুপ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ গঠন করে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সমারিক শাসন জারি হলে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড স্তব্ধ হয়ে যায় এবং দেশের সর্বত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে প্রবর্তিত রাজনৈতিক দল আইন মোতাবেক দল ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং সংবিধান রচনা ও সামরিক আইন প্রত্যাহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা ও পাকিস্তানের দুই প্রদেশে অসম উন্নয়নের পেক্ষপটে এ দল ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষনা করে এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে। পরবতীতে শ্রমিক ও কর্মচারদের জনপ্রিয় দাবি এর সাথে অন্তর্ভূক্ত করলে ছয় দফাকে এগার দফায় সম্প্রসারিত করা হয়[৯৮]।

অবশেষে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন আইয়ুব খানের সরকারের পতন ঘটলে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ প্রশস্ত হয়। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে জয়ী হয় । গণতন্ত্র ও স্বাধীকাররে প্রশ্নে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যার পর বাঙালিদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা এবং ১৯৭৩ সালে প্রথম সাধারণ নির্বিচন অনুষ্ঠান করা হয়। দেশে সংসদীয় কাঠামোয় বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়[৯৯]।

পৃষ্ঠা : ৭০।

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১।

[৯৯] প্রাগুক্ত।

সরকারের পক্ষ থেকেও বিরোধী দলের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশে ডান পন্থী ও স্বশস্ত্র চরম বামপন্থী রাজনৈতিক দল সমূহের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকে তবে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী বাম পন্থী দলগুলো সংগঠন চালানোর অনুমতি লাভ করে। সরকারি দলকে স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজ দল গঠনে তৎপর দেখা যায়। এভাবে এর ওয়ার্কিং কমিটি দলীয় সংগঠনকে পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে পৃথক রাখার সুপারিশ করে তবে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দলের অভ্যন্তরীণ কলহ নিরসনে বঙ্গবন্ধু দলীয় প্রদান হিসেবে থাকতে বাধ্য হন এবং দলের কাঠামোতে নেতাকর্মী মনোনয়নদান নিজ কর্তৃত্বাধীন রাখেন[১০০]। **জাহান উলেখ** করেন- In reorganising and revitalising the party, Awami League was emphasising two factors, i. e., the strengthening of the youth fronts and the use of patrnage....using its student and labour front for recruiting support for the party[101]. পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার স্থলে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু করলে দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজতৈনকি দল ব্যবস্থা নিমার্ণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলদেশে সামিরক শাসন জারি হওয়ার পর রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ভিন্ন খাতে আবর্তিত হয় এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকালে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আওতায় এক ধরণের বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ব্যবস্থাধীনে রাষ্ট্রীয় উদ্যেগে সৃষ্টি দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পর ধাপে ধাপে গণতন্ত্রে উত্তরণের ঘোষণা দিয়ে ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে সীমিতভাবে রাজনেতিক কর্মকান্ড অনুমোদন করেন। এভাবে তার সরকার রাজনৈতিক দল বিধি বা Political Parties Regulation (PPR) জারি করে প্রথমে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করে। এ বিধি অনুসারে রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকান্ড এর শর্ত হিসেবে তাদের সংবিধান, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং মেনিফেস্টো সরকারি অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। ১৯৭৬ সালের শেষে প্রায় ৬০টি রাজনৈতক গোষ্ঠী এ উদ্দেশ্যে তাদের সংবিধান ও আনুষাঙ্গিক তথ্য জমা দিলে আওয়ামী লীগসহ ২১ টি দলকে PPR আওতায় অনুমোদন দেয়া হয়[১০২]। PPR সম্পর্কে বলেন-Through the mechanism of PPR and æindoor politics" the regime succeeded in fragmenting the faction prone political parties further ..... the regime's initial strategy was to pick up the support of a large number of exiting political parties

[১০০]Rounaq Jahan Bangladesh Politics : Problems and Issue, Dhaka : UPL 1980, PP ; 71-72.
[১০১] প্রাগুক্ত।
[১০২]Talukder Maniruzzaamn, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, Dhaka, UPL, 1988, p-191.

and factions"[103]. পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের শেষে রাজনৈতিক দলের অব্যাহত চাপের মুখে জেনারেল জিয়ার সরকার পিপিআর প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে দেশে রাজনৈতিক দল গঠনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সে সময়ে দলের সংখ্যা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে রাজনেতিক দলের সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে যায়। এর আগে ১৯৭৬ সালের মে মাসে এক দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপনের মারফত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এভাবে মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলীম লীগ, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ এবং জামায়াত ইসলামী এং নিযাম-ই-ইসলামী দল পুর্নগঠিত হয় এবং পিপিআর এর আওতায় পুরনো ও নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে[১০৪]।

১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে কাউন্সিল সভায় ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট্য সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে ও বাকশাল অনুসৃত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজ রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা যারা বাকশাল বিরোধী ছিলেন তারা উক্ত কাউন্সিল সভায় যোগদানে বিরত থাকেন। দলের ভাঙনের পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে মুলধারার আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে আব্দুল মালেক উকিল এবং আব্দুর রাজ্জাক নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই আগস্ট মাসে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ভিন্ন মতাবলম্বীগণ পৃথক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। এদলের উদারপন্থীগণ পৃথক হয়ে যান এবং নিজস্ব দল গঠন করেন। এভাবে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ গণআযাদী লীগ, জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানি জাতীয় জনতা পার্টি এবং খন্দকার মুশতাক আহমেদ ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেন[১০৫]।

মাওলানা ভাসনীর ন্যাপ ১৯৭৬ সালে পিপিআর এর আওতায় পুনর্গঠিত হয় এবং দলের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মাওলানা ভাসানী ও মশিউর রহমান যাদু মিয়া নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তবে ন্যাপের ভাসানী এর উপসভাপতি ড. আলীম আল রাজী বাংলাদেশ পিপলস লীগ নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব যাদু মিয়ার ওপর অর্পিত হয় এবং এস এ বারী এটির সাধারণ সম্পাদক হন । এ দলের নেতৃত্বে সমর্থনদান অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি গঠিত হলে ঐ দলে যোগদান করেন। এর বিপরীতে কিছু সংখ্যক নেতা আনোয়ার জাহিদ, আবু নাসের খান ভাসানী, গাজী শহিদুলাহ এবং নুরুর রহমানের সমন্বয়ে দলের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখেন[১০৬]।

---

[১০৩] Rounaq Jahan Bangladesh Politics : Problems and Issue, Dhaka : UPL 1980, PP ; 208.

[১০৪] হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি পেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ৭৪।

[১০৫] প্রাগুক্ত।

[১০৬] হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা. ২৫২-২৫৩।

৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ এর সৈনিক বিপবের সাথে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তথা জাসদের সম্পৃক্ততা এবং জিয়া সরকারের সাথে তৎপরবর্তী অবনতিশীল সম্পর্ক দলটির রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণর করে দেয়। পরে আব্দুল আউয়াল এর নেতৃত্বে দলের মধ্যপন্থী অংশকে পিপিআর এর আওতায় অনুমতি দিলেও তা পুনরায় বাতিল করা হয়। অবষেশে এপ্রিল ১৯৭৮ সালে জাসদ পূর্ণাঙ্গ দল হিসেবে সরকারি অনুমোদন পায়। দলটি এর পুর্বেকার সহিংস বিপবী কর্মকৌশল বাতিল করে এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করে[১০৭]। পিপিআর এর আওতাধীন অন্য যে সব দল পুনর্গঠিত হয় তার মধ্যে জাতীয় লীগ এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি উলেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের আমলে বিরোধী দল হিসেবে পরিচিতি জাতীয় লীগ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পুনগঠন করা হয় এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলে অবস্থান নেয়। ইউনাইটেড পিপলস পার্টিতে সরকারকে সমর্থনদানের প্রশ্নে বিভক্তি আসে এবং এর একপক্ষ কাজী জাফর আহমদ এবং ক্যাপ্টেন আব্দুল হামিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে জেনারেল জিয়ার পক্ষ নেয়। অপরপক্ষ রাশেদ কান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, নুরুল ইসলাম এবং অন্যান্য সমর্থক নিয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন নামে পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতিতে তৎপরতা চালায়। অন্যান্য দলের ন্যায় মোহম্মদ তোয়াহার সাম্যবাদী দলেও বিভক্তি সৃষ্টি হয় এবং ১৯৭৮ সালে উক্ত দলের তোয়াহা ও নগেন সরকার পরস্পরকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। পরবর্তীতে তিনটি বাম সংগঠন জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, ন্যাপ ভাসানী একাংশ এবং সাম্যবাদী দল একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে সম্ভাব্য সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়[১০৮]। জামান উলেখ করেন যে নতুন রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কিছূ সময়ের রাজনৈতিক শূণ্যতার পেক্ষাপটে জেনারেল জিয়ার বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের কোন্দল এবং ভাঙনের সৃষ্টি করে যা ডানপন্থী, বামপন্থী এবং মধ্যপন্থী সকল দলের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়। উলেখকরা হয় যে, After coming back to the political scene most political organisations faced problems in reactivating themselves. their overall weakness stemmed from the occurrences of squabbles and splits, indecision, crisis in ideology and leadership, and above all, the regime's policy of sub-deviding them for narrow political purposes[১০৯].

---

[১০৭] প্রাগুক্ত।

[১০৮] M. Rashiduzzaman, Bangladesh : 1978 Search for a Political Party, Asian Survey , Vol. 19 Februay 2, 1979,page 193.

[১০৯] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম খন্ড, ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৭৪।

জেনারেল জিয়ার শাহাদাতের পর জেনালে এরশাদ রাজনৈতিক দল গঠনে এবং দল ব্যবস্থা প্রবর্তনে তার পূর্বসূরী পন্থা ও কৌশল অবলম্বনে করেন। এভাবে তিনি জিয়ার বিএনপির ন্যায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জাতীয় পার্টি গঠন করে রাষ্ট্রপতিশাসিত বহূদলীয় কাঠামোয় নিজ দলের নিরুঙ্কশ প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখেন। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত এসব দল দেশের বিভিন্ন ডান, বাম, ও মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের দলছুটে রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সামিরক শাসনের বেসামরিকীরনের প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য সুবিধাদানের বিনিময়ে জনসমর্থন আদায়ের প্রক্রিয়া বিদ্যমান রাজনেতিক দলগুলোর মধ্যেও দলছুট রাজনীতিক বৈধতা আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে ব্যাপক কোন্দল ও ভাঙ্গনের সৃস্টি করে এবং ব্যাঙের ছাতার ন্যায় নতুন নতুন সংগঠন গজিয়ে ওঠে যার ফলে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এক পর্যায়ে শতাধিক হয়। এসময়ে দেশের প্রধান দুটি বিরোধী দলে অর্থ্যাৎ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এবং বেগম জিয়ার নেতৃেত্বে বিএনপিতে কোন্দল ও মত বিরোধের সূত্রপাত হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের একাংশ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অপর অংশ শেখ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশাল পদ্ধতি বাস্তবায়নে ব্রতি হয়। [১১০]।

জেনারেল এরশাদের শাসনামলে দল ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিরোধী দলসমূহের সমন্বয়ে রাজনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠা যা দেশের গণতন্ত্রে উত্তরণের দাবির প্রেক্ষপটে নির্মাণ করা হয়। এভাবে এরশাদ বিরোধী পনেরদলীয় ও সাতদলীয় প্রধান দুটি রাজনেতিক জোট রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। পনেরদলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলি ছিল আওয়ামী লীগ,আওয়ামী লীগ (সিদ্দিকী), বাকশাল, জাসদ, গণআযাদী লীগ, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ (মুজাফ্ফর), সিপিবি, সাম্যবাদী দল, জাতীয় একতা পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বিএসডি (মাহবুবুল হক), এবং মজদুর পার্টি। অপর দিকে সাতদলীয় জোটের অঙ্গীভূত দলগুলো ছিল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, গণতান্ত্রিক পার্টি, ন্যাপ (নুরুর রহমান), কৃষক শ্রমিক পাটি, এবং বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ[১১১]। পনের দলীয় জোট ১৯৭২ সালের সংবিধানের আলোকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়, অপরদিকে সাত দলীয় জোটের পছন্দ ছিল বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি সরকার পদ্ধতি। এভাবে জেনারেল এরশাদ সরকারের পতন ও সর্বদল গ্রাহ্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ প্রশস্ত হয়।

---

[১১০] Md. Ataur Rahman, Bangladsh: 1983 : A Turning Point for the Military' Asian survey ; vol 24, No. 2, February, 1984, p 242.
[১১১] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ জুন, ১৯৯৪।

১৯৯১ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে এ দেশে অনুষ্ঠিত যেসকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা একধরণের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্য জনকভাবে তারা সুষ্ঠ ভুমিকা পালনকারী দল ব্যবস্থা বা রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকায়নে প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। **এসম্পর্কে জামান বলেন-** Instead of practicing constitutional politics, the major parties pandered to unhealthy competition for stste power that led to perpetual confrontation creating a culture of mistrust and antagonism. Because of lack of any generally agreed rule of the political game, political process become chaotically confused rendering unenthusiastic glumness in inter and intra-party activities[১১২].

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে। দু-একটি রাজনৈতিক দল ব্যতীত বেশিরভাগ দলই তৈরি হয়েছে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। এছাড়া বাংলাদেশ স্বঘোষিত নেতৃত্বের দেশ এখানে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে নিজেকে দলীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন। এসব দল স্রেফ সিলপ্যাড সর্বস্ব হয়ে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনকারী একাধিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে, যারা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় যথাযথ নিয়মে গঠিত হয়নি। অবৈধ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া হিসেবে দল গঠন করে পরবর্তী সময়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সমর্থন ও সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে এবং এক পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও দলত্যাগী সদস্যদের দ্বারা দলের প্রতি গণসমর্থন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় দল গঠনের কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা এবং এর সমর্থন প্রকৃতপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক বা আদর্শগত নয়। এই সমর্থন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভিত্তিক।

৫.৮ বাংলাদেশে দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১৯৯১ সাল হতে অদ্যবধি বিভিন্ন রাজনৈতিক চড়াই উৎড়াই এর মধ্যে দিয়ে দুটি দলই বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতার পালাবদল করেছে। বাংলাদেশে দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিন্মরূপ দাড়ায়-

(ক) দলীয় কাঠামোয় গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি ঃ

[১১২]Al Masud Hasanuzzaman. Registration and Reforms of Political parties in Bangladesh, MSS/SRG/LSSP, Dhaka, October, 2003, p. 10.

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ ঐতিহাসিক ভাবে স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে। তথাপি দুর্ভাগ্য জনক হলেও অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র চর্চা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোতে অনুপস্থিত বলে প্রতীয়মান হয় ফলে দলীয় সিদ্ধান্ত সমূহ দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উৎসারিত হয়। ফলে দলীয় সংগঠনের অভ্যন্তরে bottom-up পরিকল্পনার প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতা নির্বাচন অলীক থেকে যায়। উলেখ করা হয়েছে যে, æPolitical party affairs revolved aroud personality cult of the party chief and general members were weighted down by the supreme leadership”[113]. দলের অভ্যন্তরীন কর্তৃত্ববাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ সাংসদবর্গকে দলীয় নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিতে পরিণত করে ফলে তারা দলে বা জাতীয় সংসদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হারান। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় কাঠামোতে কর্তৃত্ববাদী আচরণের পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রায়ন ঘটানোর বা চর্চা কার্যকরী বলে প্রতীয়মান হয়নি[১১৪]।

(খ) রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ঃ

রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডের উপর জন আস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় জনবিচ্ছিন্নতার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে এবং রাজনৈতিক দলে সুযোগ সন্ধানীদের অনুপ্রবেশ সম্ভবর হয়েছে। এভাবে রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানীরা তাদের অর্থ ও পেশীশক্তির কারণে দেশের প্রধান দলগুলোতে অন্তঃপ্রবেশের পথ তৈরি করে এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে রাজনেতিক বিশেষকগণ বলেন-“the modus vivendi was rather simple. It was the contributions of these groups into the parties’ campaign funds that plyed a catalytic role in bringing about this alliance between the two”[১১৫].

(গ) মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঃ

১৯৯১ পরবর্তী সময়কালে এ দেশের ভোটার ও নাগরিকগণের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন গুলোতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যাপকভাবে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে সুশাসন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যোগ্য প্রার্থী সমন্বয় সুষ্ঠু মনোনয়ন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাশিত হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে জনগণের এ অনুভূতি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মনোয়ন দান প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়নি। যে কারণে নিবেদিত প্রাণ কর্মী ও যোগ্য দলীয় সংগঠনের প্রার্থিতা উপেক্ষিত হয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সুযোগ

---

[১১৩]Al Masud Hasanuzzaman. Registration and Reforms of Political parties in Bangladesh, MSS/SRG/LSSP, Dhaka, October, 2003, p. 10.

[১১৪] হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি পেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ৮০।

[১১৫]The Daily Star, 10.05.1996.

সন্ধানী রাজনিতিকদের মধ্যে নির্বাচনে প্রার্থীতা লাভের জন্য রাজনৈতিক পরিচয় পরিবর্তন এমনকি দল বদলের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য মন্তব্য করা হয় যে, æBecause of lack of recognition of the Services of the original party workers, a sense of demoralisation and deprivation loomed large on the activists who nursed political organisations at the grassoots and this eventually weakend the political process itself " [116].

(ঘ) অস্বচ্ছ দলীয় তহবিল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের তহবিল এবং আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণ বরাবরই অন্ধকারে থেকেছে। এর কারণ হলো এ সব দলের আয়ের উৎস, ব্যয়ের পরিমাণ এবং হিসাব বিবরণী কখনও প্রকাশ করা হয়নি। বাস্তবে দলের দৈনন্দিন খরচ মেটানো এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে অনৈতিক ভাবে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ সহ নির্বাচনী প্রচারণার ওপর ধার্যকৃত ব্যয়ের সীমারেখা প্রায়শই ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনাকালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ নং-১ , ২০০১ জারি করে। উক্ত অধ্যাদেশের ৯০-এ (১) - এর ধারায় বিধান রাখা হয় যে, æAny political party intending to avail itself of the privileges provided for a registered political party in this order and the rules may make an application, on payment of such fee as may be prescribed, to the commission for its registration as such" [১১৭].

(ঙ) নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অভাব ঃ

নির্বাচনী প্রচারণাকালে নির্বাচনমন্ডলীর নিকট কৃত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ভোট প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। এ সকল দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো তাদের নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহ এবং নিজস্ব সামর্থ্যের মধ্যে ব্যাপক ফারাক পরিদৃষ্ট হয়। এ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা হয়েছে- æSkepticism had grown among the masses and they got frustrated whenever they watched the ambivalence of the political parties to fulfil thier

[১১৬]Al Masud Hasanuzzaman. Registration and Reforms of Political parties in Bangladesh, MSS/SRG/LSSP, Dhaka, October, 2003, p. 10.

[১১৭]হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ৮৩।

recent electoral commitments of arresting terrorism, upholding the democratic institution, ensuring transparent governance and the like"[১১৮].

(চ) প্রান্তিক নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহে মহিলা অঙ্গসংঠনের উপস্থিতি থাকলেও দলীয় মূল সাংগঠনিক কাঠামোয় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক এবং এ দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল নারী নেতৃত্বাধীন হলেও নারীদের দলগত প্রভাব নেই।

সারণী ঃ ৯

রাজনৈতিক দলে নারী অবস্থান

রাজনৈতিক দল	দলীয় কাঠামো	মোট সদস্য	নারী সদস্য
আওয়ামী লীগ	পেসিডিয়াম ও সচিবালয়	১৩	৩
	ওয়ার্কিং কমিটি	৬৫	৬
বিএনপি	জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি	১৫	১
	জাতীয় নিবাহী কমিটি	১৭১	১১
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি	৩০	১
	জাতীয় নির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে ইসলামী	মজলিশ-ই -শুরা	১৪১	-
	মজলিশ-ই -আমেলা	২৪	-

উৎস: চৌধুরী এবং হাসানউজ্জামান, Political Decision- Making in Bangladesh and Role of women ; Asian Profile, vol. 25, No;1 February 1997, p.66.

রাজনৈতিক দলসমূহে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব দলীয় কাঠামোয় নারীর অন্তর্ভূক্ত বাধাগ্রস্ত করে । এ সব দল ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়ায় দলীয় নেতৃত্ব চরম ভাবে কর্তৃত্ব পরায়ন হয়। æUnder such dispensation even the male party stalwarts have little influence in shaping the party policies or programmes. Women in these circumstances are even pushed further away from the power center"[১১৯]. উপরোক্ত কারণে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এবং রাজনৈতিক দলসমূহে নারীদের রাজনৈতিক সংঠন গঠন উৎসাহিক করা হয়নি।

(ছ) পৃষ্ঠপোষক-অধস্তন সম্পর্ক ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান নিমার্ণ প্রক্রিয়ায় পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল সম্পর্ক দারুণভাবে ক্রিয়াশীল। এ উপাদান সংগঠন বিকাশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাকে বিনষ্ট করে দেয়। দলীয় সংগঠন প্রক্রিয়ায় রিবাজিত একটি উপাদান দলের আদর্শ্চ্যুতির কারণ

[১১৮] প্রাগুক্ত।

[১১৯] হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি পেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ৮৫।

ঘটায় এবং নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। এভাবে এ দেশের রাজনৈতিক সংগঠনে প্রভু-অধস্তন সম্পর্ক ব্যাখ্যায় atomism, patron-clientlism, patrimonialism, এবং neo-patrimonialism প্রপঞ্চ সমূহকে ব্যবহার করা হয়েছে[১২০]। এছাড়া রওনক জাহান উলেখ-æPatrons build their support though distribution of patronage, and this is facilitated by thier brokerage role between the government and the people. The local functionaries of political parties build up electoral support by promising concrete patronages to their clients''[১২১]. এ দেশের দল গঠনে ও নির্বাচনী রাজনতিতে পৃষ্ঠপোষকতার উপাদান দুর্বল, আনুগত্য, কোন্দল, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্যয় দিয়েছে যা প্রতিষ্ঠান নিমার্ণে বা রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

(জ) বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ

দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সংগঠন বা সমিতি করার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে বহু দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

(ঝ) দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দিকে প্রবণতা ঃ

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। স্বৈরাচারি আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সেসব নির্বাচন হয়েছে তার সব গুলোতে দেখা গেছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দুই দলই ঘুরে ফিরে দেশ শাসন করছে।

(ঞ) ব্যক্তি বা পারিবারিক প্রভাব ঃ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের উপর ব্যাক্তি ইমেজ বা পারিবারিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রধান দুটি দলের বেলায় একথা অধিকতর প্রযোজ্য। অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে একই অবস্থা বিরাজমান । এমনকি পশ্চিমের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমুহও এই অবস্থার ব্যতিক্রম সে কথা বলা যাবে না।

(ট) ফ্রন্ট সংগঠনের উপর নিভরশীলতা ঃ

---

[১২০]Shamsul I. Khan, et.al., Political culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh, Dhaka : UPL, 2008.

[১২১]Rounaq Jahan Bangladesh Politics : Problems and Issue, Dhaka : UPL 1980, PP ; 170.

আমাদের দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের ছাত্র, শম্রিক কৃষকদের মধ্যে ফ্রন্ট সংগঠন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এরা দলের সঙ্গে অঙ্গ সংগঠন হিসেবে সম্পর্কিত। এর ভেতর ছাত্র সংগঠনের উপর রাজনৈতিক দলের নির্ভরশীলতা দল ব্যবস্থাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে।

(ঠ) জোটবদ্ধতা ঃ

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভিন্ন সময় জোটবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় এটি অধিকতর যেমন লক্ষণীয় হয়েছে তেমনি বর্তমান রাজনেতিক পরিস্থিতিতে জোটবদ্ধতা লক্ষ করা যাচেছ যেমন চার দল, মহাজোট, চৌদ্দ দল ইত্যাদি। জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসন বিরোধী ১৫ দল, ৭ দল, ৫ দলীয় জোট।

(ড) দলত্যাগ প্রবণতা ঃ

দেশের রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মেধ্যে এ প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে, দেশ সেনা নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীন থাকাকালে এক দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগদান, শাসকদের অনুকূলে নতুন দল গঠন ইত্যাদি আশংকা জনকভাবে বৃদ্ধি পায়।

(ঢ) ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দলগুলো যেমন মুসলিম লীগের বিভিন্ন অংশ, বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামী, নিজামে ইসলামী, পিডিপি, প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা এবং পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন করে। স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। পরবর্তী বছর ৪ মে সামরিক আদেশ বলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ বাতিল করা হয়। ক্রমান্বয়ে ধর্মভিত্তিক নিষিদ্ধ দল গুলো পনরুজ্জীবিত হয় এবং নতুন আরো কিছু দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(ণ) অন্তদ্বন্দ্ব ও সংঘাত ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই রয়েছে অন্তর্দ্বন্ধ ও সংঘাত। অন্তর্দলীয় কোন্দল এবং এক দলের সঙ্গে অন্য দলের আদর্শগত পার্থক্য হেতু প্রতিনিয়ত তা সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতার সংঘাতসহ নানা কারণে সৃষ্ট কোন্দলের প্রেক্ষিতে আদর্শচ্যুত হয়ে দলবদলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এ দেশের রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ। যা গণতন্ত্রিক প্রকিয়াকে ব্যহত করে।

(ত) দলের মধ্যেই ভাঙন এবং ভাঙা দল থেকে নতুন দলের সৃষ্টি ঃ

বাংলাদেশের উলেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলের নামই উলেখযোগ্য। এই দলগুলোর মধ্যে মূলগত ও আদর্শগত পার্থক্য বিদ্যমান। কোনো দল অর্থনৈতিক কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আবার কোনো দল ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের দলগুলোর মধ্যে রয়েছে তিনটি ভাগ, ডানপন্থী, বামপন্থী ও ইসলামপন্থী। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিদ্যমান। এসব কোন্দলের মূল কারণ যতটা না আদর্শ কেন্দ্রিক, তার থেকে বেশি ব্যক্তি কেন্দ্রিক। দলীয় নেতৃত্ব অর্জনের জন্যই সাধারণত এসব কোন্দলের সৃষ্টি হয়। এরফলে বাংলাদেশে অধিকাংশ দলের মধ্যেই ভাঙন এবং ভাঙা দল থেকে নতুন দল গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার একটি উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো দলীয় নেতাদের একাংশের ঘনঘন দল পরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় খুব সহজেই যেকোন ব্যক্তি এক দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগদান করতে পারেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে বামপন্থী ও ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের রশি টানাটানিতে আওয়ামী লীগ সরকার নানা সংকটের সম্মুখীন হয়। শেখ মনি গ্রুপ ও তোফায়েল গ্রুপ দুইভিন্নধর্মী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দলীয় নেতৃত্বকে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনের প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হয়। ফলে আওয়ামী লীগ দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। দীর্ঘ একুশ বছর পর পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণ করার পরও এই দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলেও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সৃষ্ট সাংগঠনিক কর্মকান্ডে ব্যাঘাত ঘটছে। বামপন্থী, ডানপন্থী, ভারতপন্থী, আমেরিকাপন্থীর ডামাডোলে দলের প্রকৃত নেতৃত্ব ও কর্মসূচী এবং সঠিক কার্যক্রম হচ্ছে না। যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য, সেহেতু দলের আদর্শ ও কর্মসূচী তাদের যতটা না প্রভাবিত করে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত করে ক্ষমতার লোভ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উর্ধ্বতন নেতাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করে থাকে। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তি দলত্যাগ করলে বা দল থেকে বহিষ্কৃত হলে সে ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনের অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশে দলত্যাগ বা বহিষ্কৃত হওয়া ব্যক্তি অন্য দলে সমাদরে পুরষ্কৃত হন। সংবিধানিক বিধানেও দলত্যাগ কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের বিষয়ে নয়।

৫.৯ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

- গণতন্ত্র হলো প্রকৃতপক্ষে জনমতের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। কোন বিশেষ শাসন ব্যবস্থা কতখানি গণতান্ত্রিক তা নির্ধারণের মাপকাঠি হল সংশিষ্ট শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রভাব কতখানি তা বিচার করা। এই জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ও কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করে।

- দলপ্রথার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলই শাসনকার্য পরিচালানা করে। নির্বাচনে যে দল সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে, তা বিরোধী দল হিসেবে সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করে। সেজন্যে গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

- পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সেজন্যে মন্ত্রিসভার পিছনে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যদের সমর্থন অটুট থাকে। এর ফলে সরকার নীতি-নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। এই কারণে বলা হয় যে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে দলীয় শাসন ব্যবস্থা দরকার।

- গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হিসাবে সুনাগরিকের কথা বলা হয়। কিন্তু নির্লিপ্তাকে স্বার্থপরতা প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয়। রাজনৈতিক দলগুলো সভাসমিতি, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, দলীয় মিছিল, প্রচারকার্য প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের দ্বারা জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটায় এবং রাজনৈতিক ভাবে জনগণকে সচেতন করে তোলে।

- গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ না থাকলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সফল হতে পারেনা। রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে। জনগণ তাদের দাবি-দাওয়া ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানতে পারে। এইভাবে দলীয় ব্যবস্থা সরকারের গণতান্ত্রিক স্বরূপ রক্ষা করে।

- রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সমাজে ভিন্নমুখী স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও সমন্বয় সাধন সম্পন্ন হয়। মূলত রাজনৈতিক দলই সমাজে হাজারো সংঘর্ষকে ছাপিয়ে সংহতি অর্জনে সহায়তা করে। দ্বন্দ্ব মুখর

পরিবেশে মিলনের রজ্জু প্রসারিত করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্থলে জাতীয় নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলোকে জাতীয় স্বার্থের সোনালী বন্ধনে আবদ্ধ করে। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে উর্বর করে। তাই বলা হয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সুস্বাসেস্থ্যর উপর জাতীয় সংহতির গভীরতা ও ব্যাপকতা উভয়ই নির্ভরশীল[১২২]।

- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার জনগণের নিকট দায়ী থাকে। দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলেই জনগণ যখন প্রয়োজন এবং উপযুক্ত মনে করে, তখন তারা তাদের শাসক পরিবর্তন করতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক সরকারকে চূড়ান্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়[১২৩]।

- জনগণের মতামত হচ্ছে ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত। এই ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে সংগঠিত করতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দল। এজন্যই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এ ক্ষেত্রে নিরূপণভাবে কাজ করে চলেছে।
- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণ যেমন উভয়ের নীতি বা কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে পারে, তেমনি সরকারও বিরোধী দলের বক্তব্য থেকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে পারে।
- শান্তিপূর্ণ ভাবে সরকার পরিবর্তন করে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা থাকার ফলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদল করা যায়। কাজেই সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপব বা অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয় না।

পরিশেষে বলা যায়-একমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকারীরা যারা বেশীর পক্ষে জনগণেরই একটি দোদুল্যমান বা স্থিতিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশবিশেষ, তারা সুনির্দিষ্টভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। **ম্যাকআইভাররের মতে-** æParty is the only means by which the ultimate political soveregin, which is at most a fluctuating majority, can definitetly control government”[১২৪]| গণতান্ত্রিক রাজনীতির নাট্যমঞ্চে রাজনৈতিক দলই থাকে নাম ভূমিকায়। নায়কের সঠিক

[১২২] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংকট, শিকড়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯১।পৃষ্ঠা-১৫।
[১২৩] নাথ, বিপুল রঞ্জন, সরকারের সমস্যাবলী, বুক সোসাইটি, ঢাকা, প্রকাশকাল- পঞ্চম সংস্করণ-জুন ২০০২, পৃষ্ঠা-২৬২।
[১২৪] R. M. Maclver, The Modern State, page-399.

অভিনয় যেমন নাটকের প্রতিটি অঙ্ককে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিটি স্তর তেমনি কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের সুসংহত জাতীয় কর্মসূচী এবং নৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে[১২৫] ।

[১২৫] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংকট, শিকড়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯১।পৃষ্ঠা-১৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকার ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

৬.১ সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত বা বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে চাক্ষুষ করা যায় না। কারণ এর কোন বাস্তব রূপ নেই। সরকার হল রাষ্ট্রের রূপকার[১২৬]। তবে সকল মানবিক সংগঠনের মধ্যে সরকারই সর্ববৃহৎ সংগঠন। এই শাসন যন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। উদ্দেশ্যকে কার্যকর করে। সরকারই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনে রূপান্তরিত করে এবং আইনের সাহায্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। যাদের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে, তাদের সমষ্টিগত ভাবে সরকার বলা হয়।

৬.২ সরকার কি?

সরকার রাষ্ট্রের একটি মৌলিক উপাদান। ইহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংগঠন। এর স্পর্শে একটি জনপদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, আদেশ ও নিষেধ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে বুঝায়[১২৭]। আর সীমিত অর্থে রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমষ্টিকে সরকার বলে[১২৮]। সরকার রাষ্ট্রের সর্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালানা করে।

Professor Gettleবলেন - æGovernment is the orgsanisation or machinery of the state”[129]

Willoughbyবলেছেন- æThe organisation or machinery through which the State formulates and executes its will is termed as government”[১৩০].

Professor Garnerবলেন- æGovernment is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common intersts promoted[১৩১]”

Professor Finerবলেন- Government is composed of patterns of human co-operation and forms of authority; and procedure. That is its anatomy. Its soul

[১২৬] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকালঃ সেপ্টম্বর, ১৯৮৮, পষ্ঠা : ৪০৩।
[১২৭] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ ; চতুর্থ সংস্কর ১৫জুলাই ১৯৯৩; পৃষ্ঠা-২০৮।
[১২৮] প্রাগুক্ত
[১২৯] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকালঃ সেপ্টম্বর, ১৯৮৮, পষ্ঠা : ৪০৩।
[১৩০] প্রাগুক্ত।
[১৩১] প্রাগুক্ত।

lies in choosing between alternative objectives of happiness and choosing between duties and sacrifices, and affecting a proportion between them[১৩২].

সরকার মানুষের এমন এক অভিযান যা শেষ হবার নয়। এটি মানুষের সর্বপেক্ষা ভারি, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত বোঝা। তথাপি সরকার নাগরিকের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চুড়ান্ত আশা-ভরশার স্থল[১৩৩]। সরকার এক প্রকার অভিযান কারণ মানুষের জ্ঞান, শক্তি, গুণ, সামর্থ এবং অর্থ সম্পদ সীমিত কিন্তু তার কল্পনা শক্তি, আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা অফুরন্ত। শত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ থেকে যায় অতৃপ্ত। সেই সাথে সরকারকে যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টা চালাতে হয় নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সরকার তথা সরকারের কর্মক্ষেত্র সদা পরিবর্তনশীল; স্থবিরতার কোন স্থান এতে নেই।

৬.৩ সরকারের শ্রেণী বিভাগ

সরকারের প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ যারা করেছেন তাদের মধ্যে এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ সর্বপেক্ষা উলেখযোগ্য। পেটো এবং পেটোর গুরু সক্রেটিসের অনুকরণে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন[১৩৪]। এ্যারিস্টটল দু'টি মূলনীতি অনুসারে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথমটি হলো; ১. সংখ্যা নীতি ২. লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নীতি। তিনি দু'টি মূলনীতির ভিত্তিতে সরকারের ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন -

সারণী ঃ ১০

এ্যারিস্টটল এর সরকারের শ্রেণীবিভাগ

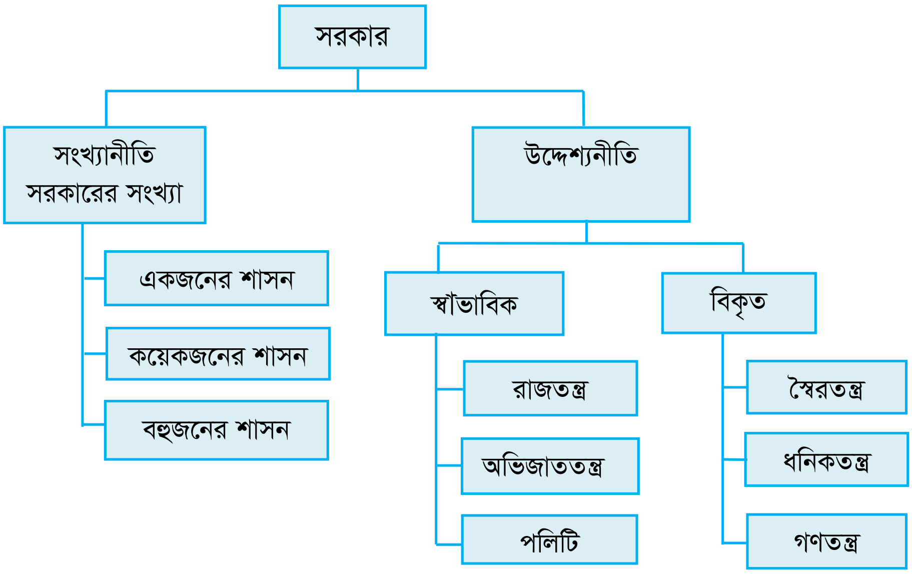

[১৩২] The Theory and Parctice of Modern Government, 1961, page; 4.
[১৩৩] ভুঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, আধুনিক সরকারের সমস্যাবলী, গোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ -এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৩।
[১৩৪] দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ ; চতুর্থ সংস্কর ১৫জুলাই ১৯৯৩; পৃষ্ঠা-২০৮।

চিত্র : গবেষক কতৃক তৈরী কৃত।

এ্যারস্টিটল এর এরূপ শ্রেণীবিভাগ আকুনিককালে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। মধ্যযুগের পর থেকে এই শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে নানা রকম বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়[১৩৫]।

আধুনিককালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাদের মধ্যে মন্টেস্কু, রুশো, বুন্টসলি, ম্যাকাইভার ও লিককের নাম সর্বাধিক উলেখযোগ্য। তবে লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগকে সর্বপেক্ষা সুসস্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত আধুনিক শ্রেণীবিভাগ বলে গণ্য করা হয়। লিকক এর শ্রেণী বিভাগ হলো-

সারণী ঃ ১১

লিকক এর শ্রেণী বিভাগ

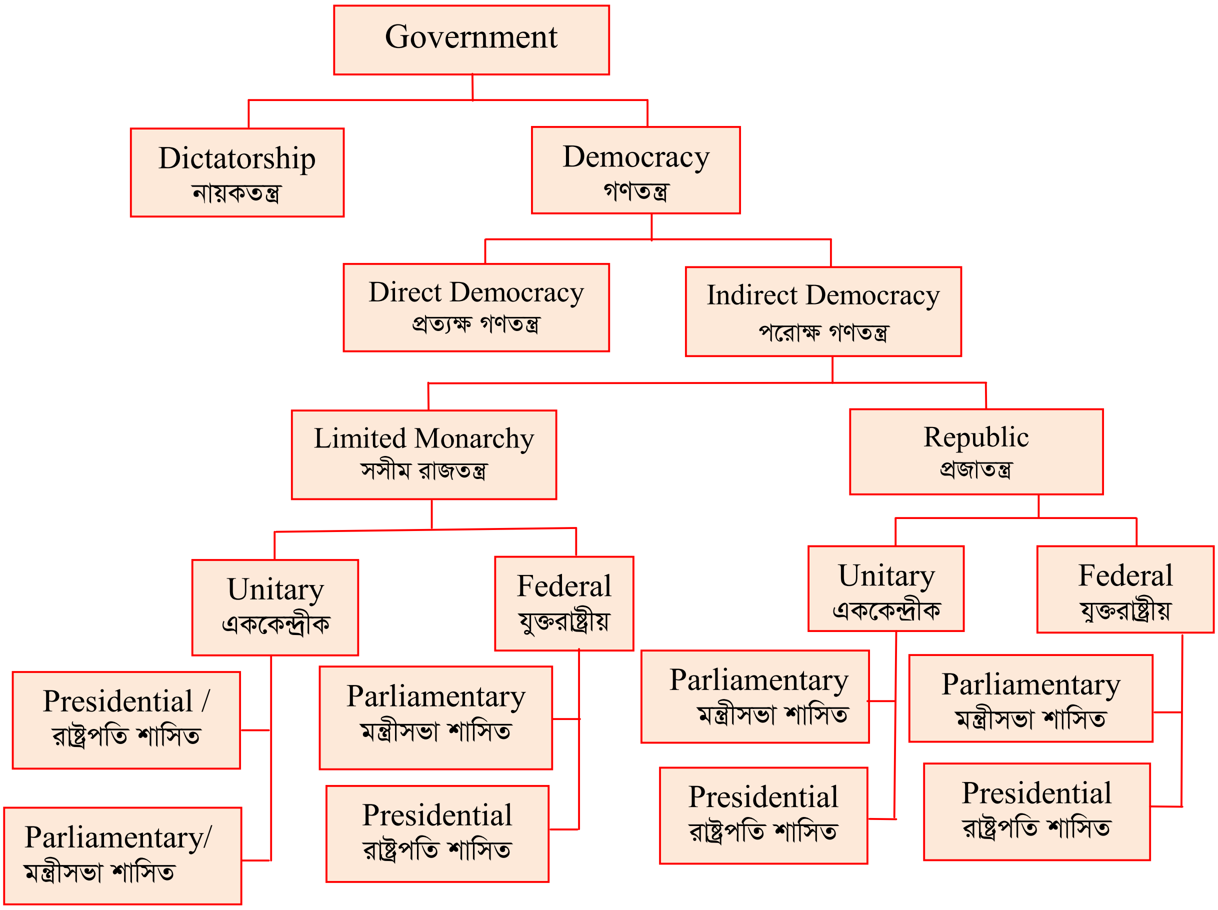

উৎস ঃ দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ ; চতুর্থ সংস্কর ১৫জুলাই ১৯৯৩; পৃষ্ঠা-২০৮।

---

[১৩৫] মহাপাত্র, ড. অনাদিকুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকালঃ সেপ্টম্বর, ১৯৮৮, পষ্ঠা : ৪০৫।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে লীককের শ্রেণীবিভাগকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেননা। তাদের সরকার কে নিন্মক্তো ভাবে ছকের মাধ্যমে পেশ করা হলো-

সারণী ঃ ১২

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সরকার শ্রেণীবিভাগ

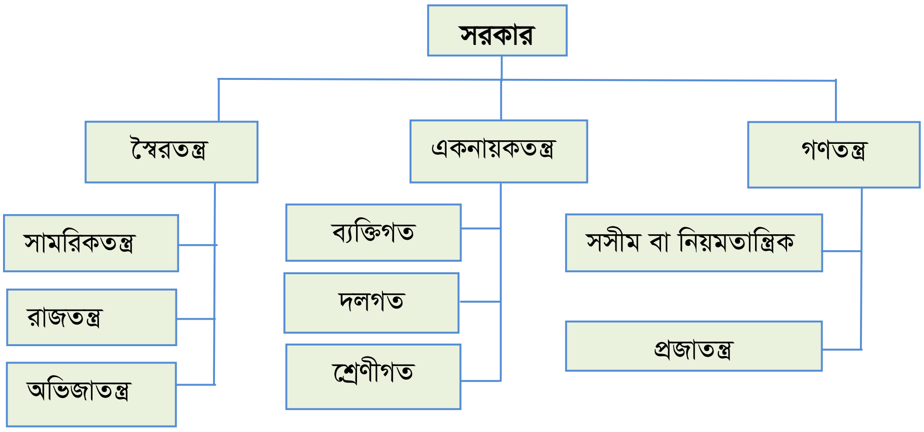

সূত্র : গবেষক কর্তৃক তৈরি।

সারণী ঃ ১৩

বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ

স্বাধীনতার পর থেকে অধ্যবদি বাংলাদেশে **তিন ধরণের সরকার** দেশ পরিচালনা করেছেন।

সরকারের ধরণ	শাসনকাল	নির্বাহী প্রধান
রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার	১০ এপ্রিল, ১৯৭১ হতে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২[১৩৬]	শেখ মুজিবর রহমান
	১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ হতে ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫ [১৩৭]	খন্দকার মোস্তক
	৭ নভেম্বর, ১৯৭৫ হতে ৩০ মে, ১৯৮১[১৩৮]	জিয়াউর রহমান
	৩০ মে ১৯৮১ হতে ২৪ মার্চ ১৯৮২[১৩৯]	বিচারপতি সাত্তার
	২৪ মার্চ ১৯৮২ হতে ১৯ নভেম্বর ১৯৯০[১৪০]	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
একদলীয় সরকার ব্যবস্থা বা বাকশাল	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ হতে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫[১৪১]	শেখ মুজিবর রহমান
সংসদীয় সরকার / মন্ত্রীপরিষদ	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ হতে ২৫ জানুয়ারি ,১৯৭৫[১৪২]	শেখ মুজিবুর রহমান
	১৯৯১ হতে ১৯৯৬	বেগম খালেদা জিয়া
	১৫ ফেব্রুয়ারি১৯৯৬ হতে ৩০ মার্চ ১৯৯৬[১৪৩]	বেগম খালেদা জিয়া
	১৯৯৬-২০০১	শেখ হাসিনা

[১৩৬] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ ১ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠা : ২৯৫-৩০২।
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫০।
[১৩৮] প্রাগুক্ত, ৩৫২ -৩৫৭।
[১৩৯] প্রাগুক্ত, ৩৫৭।
[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫৯ -, জেনারেল এরশাদের শাসনামল।
[১৪১] ভূঁইয়া, ডঃ আবদুল ওদুদ ভঁইয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা;৩৬১ ও ৩৮৪।
[১৪২] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪৪-৩৪৫।
[১৪৩] প্রাগুক্ত, ৩৭১-৩৭২।

শাসিত সরকার		বেগম খালেদা জিয়া
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ হতে ৮ অক্টোবর ১৯৯১[১৪৪]	

সূত্র : গবেষক কর্তৃক তৈরি।

৬.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার ও শাসন আমল

(ক) মুজিব শাসন আমল ঃ

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত সরকারের কর্তৃত্ব ও কর্মকান্ডের বৈধ ভিত্তি ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা যেটি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। যুদ্ধাবস্থায় ক্রিয়াশীল থাকার জন্য এ ঘোষণা রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার সরকার প্রবর্তন করে এবং রাষ্ট্রপতিকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করা হয় এবং তিনি বন্দী থাকায় তার অনুপস্থিতিতে প্রবাসী সরকারের উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

সরকার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি এবং প্রত্যাশা পূরণ করা হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণকে পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন হিসেবে গণ্য করেন। বাংলাদেশের জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ ২২ জারি করা হয়। এ আদেশ বলে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড.কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট্য সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। আলোচনার পর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে গণপরিষদ দেশের সংবিধান অনুমোদন করে । উক্ত সংবিধান ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকরী হয়। সংবিধানে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল নীতি হিসেবে গণতন্ত্র স্বীকৃতি পায় । বাংলাদেশের সংবিধান ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতির সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু করে[১৪৫]। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। মওদুদ আহমেদ বলেনঃ " The Constitution of Bangladesh envisaged a wesminister type of parliamentary system reflection the aspirations of the people murtured for nearly two decads. The Awami league's commitment

[১৪৪] প্রাগুক্ত

[১৪৫] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রকাশ ; ২০০৯, পৃষ্ঠা: ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

since its inception for the establishment of a real living democracy for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled because of the absolute power of the government"[১৪৬]. এভাবে দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে।

১৯৭৩ সালের নিবার্চনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের ফলে সংসদে সরকারি বিরোধী দল বলে কিছুই থাকে না এবং সংসদীয় বিরোধী দলের স্বীকৃতি না থাকার বাস্তবতা সংসদীয় কাঠামোয় দায়িত্বশীল নির্বাহী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে[১৪৭]।

প্রথম জাতীয় সংসদের গুরুত্ব নির্বাহীর অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে ১৯৭৪ সালের **বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিল (সংশোধীত), ১৯৭৫ সালের প্রিটিং পেস ও প্রকাশনা বিল (সংশোধীত), বিশেষ ক্ষমতা আইন বিল, এবং সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল স্বল্প সময়ের মধ্যেই সংসদীয় অনুমোদন লাভ করে**। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল **১৯৭৩** পাসের মাধ্যমে নির্বাহীকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা সহ একজন ব্যক্তিকে ছয় মাসের জন্য অন্তরীণ রাখার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বের ব্যাপক বিস্তৃতির প্রবণতা প্রদান করে এবং কেবিনেট তথা মন্ত্রীবর্গ প্রকৃত নির্বাহীর আজ্ঞাবহ হিসেবে থাকায় যৌথ দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র গুরুত্বহীন হয়ে যায়। এভাবে সংসদীয় কাঠামোয় সরকার এবং বিরোধী দলের পার্থক্য কদাচিৎ দৃশ্যমান হয় এবং উপরোক্ত সংশোধনীসমূহ পাশের পর সংসদ প্রকৃত নির্বাহীর নির্দেশ পালনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়[১৪৮]। এভাবেই গণতন্ত্র বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিপুল জনপ্রিতার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে আওয়ামী লীগ নেতা ও সরকার প্রধান। তার কথাই ছিল চুড়ান্ত। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই ছিল মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত। ফলে মন্ত্রীদের মধ্যে যৌথ দায়িত্ববোধ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এর অবকাশ ছিল খুব কম[১৪৯]। এরকম পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের মতামতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল যে, সংসদ-সদস্য নিজ দল ত্যাগ করলে কিংবা দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে

[১৪৬] Ahmed, Moudud, Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman, Chpter-2 ; page-104.

[১৪৭] Al Masud Hasanuzzaman, Rol of Opposotion in Bangladesh Politics,UPL, P-49.

[১৪৮] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রকাশ ; ২০০৯, পৃষ্ঠাঃ ২৫।

[১৪৯] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স, রংপুর, প্রকাশ সপ্তম পুনমুদ্রণ;জুন ২০০০; পৃষ্ঠা; ১৫১।

যাবে। এই বিধান সংসদ সদস্যদিগকে দলের বংশবদে পরিণত করে এবং মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা হিসেবে সাংসদদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান[১৫০]।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সর্বজনীন ভোটধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রথম সংসদের দু'বছর যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রকে একদলীয় রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হয়। নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রিসভার নিকট থেকে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে সংসদ সদস্য কিংবা সংসদ-সদস্য হবার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে মন্ত্রীদের নিয়োগ করতে পারতেন। রাষ্ট্রপতি কিংবা তার মন্ত্রীরা সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। রাষ্ট্রপতি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন[১৫১]।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ ঃ

- ❖ গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গিকারের অভাব।
- ❖ সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবিধানের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দলগুলির অধিকাংশই সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না।
- ❖ ক্ষমতাসীন এলিটগণও গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তারা নিজেদের জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা বলে মনে করতেন কিংবা বিরোধী দলগুলোকে রাষ্ট্র জাতির শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।
- ❖ সংসদে বিরোধী দলের পর্যাপ্ত প্রতিনিধির অভাব। ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

এভাবে মুজিব শাসনামল সরকার নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী রাজনীতির বিকাশে তেমন কোন সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেনি কিংবা বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে আলোচনা ও সমঝোতার মধ্যে উক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে অগ্রসর হয়নি। রবং জেল, জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের পথ বেচে নিলেন সরকার। শুরু হলো জনগণের অধিকার হরণের পালা। স্বাভবতই এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বিকাশ পক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

(খ) জিয়ার শাসন আমল ঃ

---

[১৫০] প্রাগুক্ত

[১৫১] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল; ফেব্রুয়ারি, পৃষ্ঠা;২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর কার্যক্রম এবং ঘোষিত নীতিমালা প্রকৃত বাস্তবায়নের মুহূর্তে এবং দেশের বিরাজমান হতাশাপূর্ণ অবস্থার সুযোগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতাচ্যুত এবং স্বপরিবারে নিহত হন। এই অভ্যূত্থান সেনাবাহিনীর ২০-৩০ জন তরুণ অফিসারের নেতৃত্বে ১৪০০ সৈন্যের সমর্থনে ঘটে [১৫২]। এই অভ্যূত্থান এর মাধ্যমে গঠিত খন্দকার মোশতাক সরকারকে সর্বপ্রথম পাকিস্তান স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া সৌদি আরব ও চীনও স্বীকৃতি প্রদান করে[১৫৩]। কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটে। এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মোশতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্বিতীয় বারের মত আর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এবার নেতৃত্ব প্রদান করেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তিনি জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী করে নিজেকে সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান ঘোষণা করেন। এ অভ্যূত্থান মুজিবাদী ও মস্কোপন্থীদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে সমর্থিত হয়। তারা খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতার নেতৃত্বে ৪ নভেম্বর মুজিব স্মৃতি দিবস পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে মুজিবের বাস ভবনে গমণ করেন।

খালেদ মোশাররফের অজান্তে আওয়ামী লীগের চার নেতাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়। এই অভ্যুত্থানকে সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক এলিটদের একটি বড় অংশ ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক চক্রান্তবলে মনে করে[১৫৪]। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে জেনারেল জিয়াকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধাননের পদে পুনঃ অধিষ্ঠিত করা হয়। সেনাবাহিনীর প্রদান হিসেবে জেনারেল জিয়ার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রভূত হয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তিনি বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সায়েম তার সরকারকে অরাজনৈতিক, নির্দলীয়, অন্তবর্তীকালীন সরকার বলে ঘোষণা করেন এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭৬ সালের ২১ এপ্রিল নিজেই রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন এবং তার শাসনকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে কেসামরিককরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে সীমিত রাজনৈতিক দল বিধি বা Political Parties Regulation পাস করে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হয়। এভাবে ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ আবেদকারী ষাটটি রাজনৈতিক দলের

---

[১৫২] ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন; আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা; প্রকাশকাল;তৃতীয় সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৯; পৃষ্ঠা-৩৮৪

[১৫৩] প্রাগুক্ত

[১৫৪] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স, রংপুর, প্রকাশ সপ্তম পুনমুদ্রণ;জুন ২০০০; পৃষ্ঠা; ১৭১।

মধ্যে একুশটিকে যথাযথ অনুমতি প্রদান করা হয়[১৫৫]। অবশেষে ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে উপরোক্ত বিধি প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং সে সময় ব্যাপকভাবে দলীয় কোন্দল ও একশরও বেশী দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার ব্যক্তিগত বৈধতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠান করেন। গণভোটে জিজ্ঞাস করা হয় রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তার নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আপনার আস্থা আছে কি? যেখানে জোনারেল জিয়া রাষ্ট্রীয় খরচে দীর্ঘদিন তার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালায়, সেখানে বিরোধী দলগুলোকে গণভোটের বিরুদ্ধে প্রচারণার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সকরকারি হিসাব মতে ৮৮% ভোটার গণভোটে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৯৯% ছিল জিয়ার পক্ষে হ্যাঁ সূচক ভোট [১৫৬]। গণতান্ত্রিক বিকাশের যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা গণভোটের হস্থক্ষেপের মাধ্যমে আশাহতে পরিণতি হয়। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে জেনারেল জিয়া রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরাজমান শূণ্যতা পূরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং সে অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৫৭] জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন এবং গণভোট ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে নিজ রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করেন।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস দ্বিতীয় সংসদের দিন ধার্য হয়। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল ও রাজনৈতিক জোট এ নির্বাচনের বিরোধীতা করলেও পরবর্তীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিএনপি সরকার গঠন করে। ৭০এর অধিক বিরোধীদলীয় এবং ১৬জন স্বতন্ত্র সাংসদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সংসদ ক্রিয়াশীল হবে এবং একদলীয় ক্ষেত্র হবে না বলে আশা প্রকাশ করা হয়। তবে এ ব্যাপরে হতাশার মাত্রাও ছিল যথেষ্ট কারণ জেনারেল জিয়া প্রবর্তিত নতুন রাজনৈতিক কাঠামোতে সংসদের মর্যাদা পূর্ণাঙ্গ বা সার্বভৌম ছিল না । জিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অনুরূপ ছিলনা বরং এটি এমন এক সংসদ প্রতিষ্ঠা করে যার স্থায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধিন। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং কেবিনেট সদস্যগণের নিয়োগ ও স্থিতিকাল রাষ্ট্রপতির পছন্দ মাফিক ছিল এবং নির্বাচিত সদস্যগণের নিকট তাদের কোন দায়বদ্ধতা রাখা হয়নি। উপরন্ত নতুন অনুচ্ছেদ ৯২এ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংসদের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা খর্ব করা হয়। দ্বিতীয় প্রোক্লেমেশনের তিনটি ধারায় সংসদের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায়। এভাবে রাষ্ট্রপতি সাংসদ নন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেবিনেটের একপঞ্চমাংশ সদস্য নিয়োগ দিতে পারতেন। তিনি জাতীয়

---

[১৫৫]Talukder Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, 2nd Edition, Dhaka, UPL; 1988.
[১৫৬] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স, রংপুর, প্রকাশ সপ্তম পুনমুদ্রণ;জুন ২০০০; পৃষ্ঠা; ১৫১।
[১৫৭] প্রাগুক্ত।

স্বার্থে সংসদের অনুমতি ছাড়াই বিদেশী সরকারের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ক্ষমতাশীল ছিলেন । তাছাড়া সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলে সম্মতি প্রদান নাও করতে পারতেন যদি না সংশিষ্ট বিলের ওপর গণভোট পাস করা হতো। রাষ্ট্রপতির এ ধরণের ক্ষমতার বিপরীতে জাতীয় সংসদ কতটুকু নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা দাবি করতে সক্ষম তা প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। সংসদীয় এবং নির্বাহীর অসম ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে নির্বাহীর কর্মকান্ডের যথাযথ পর্যবেক্ষণে বা আইন প্রণয়নের সংসদের ভূমিকা বা গুরুত্ব হ্রাস পায়।

দ্বিতীয় সংসদের এ সকল কর্মকান্ডকে বিবেচনায় আনলে বলা যায় যে সংসদ পুরোপুরিভাবে একদলীয় ব্যাপারে পরিণত হয়নি। তবে জিনারেল জিয়ার শাসসামলে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালুকরা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত কাঠামোয় এবং এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থাকেন। নির্বাহী এবং সংসদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে অসম সম্পর্ক বিরাজমান থাকায় সংসদীয় কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের পদক্ষেপ নেয়া হলেও নির্বাহীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে নির্বাহী তথা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর ক্ষমতার ব্যক্তিকরণ ঘটে। সর্বোপরি বলা যায় জিয়াউর রহমানের শাসনামল থেকে গণতন্ত্রের বিকাশের পথ উন্মোচিত হয়।

(গ) এরশাদের শাসনামল ঃ

১৯৮১ সালের মে মাসে জেনারেল জিয়ার নিহত হওয়ার পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তার স্থলাভিষিক্ত হন। তবে অচিরেই জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নের্তৃত্বে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ২৪ মার্চ ১৯৮২ বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদ তার শাসনকে বৈধ করতে প্রয়াস চালান এবং বেসামরিকীকরণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করের। এভাবে ১৯৮৩ সালের নভেম্বর রাষ্ট্রীয় উদ্যেগে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও কেবিনেট সদস্যগণের সমন্বয়ে জনদল গঠন করা হয়। এ সময়ে এরশাদ বিরোধী ১৫ ও ৭ দলীয় দুটি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে নামে। জেনারেল এরাশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি গঠন করে এবং ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলো এ ব্যাপারে তাদের অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন অব্যাহত রাখলে প্রশাসন রাজনৈতিক দাবি দাওয়ার প্রশ্নে শিথিল মনোভাব প্রদর্শন করে। এ সময় অন্যতম প্রধান বিরোধী দল আওয়ামলী লীগ নির্বাচন করতে মত দেওয়ায় ১৯৮৬ সালের ৭ মার্চ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন মূলত নীল নক্সার নির্বাচন এবং কাজেই এ ধরণের নির্বাচনে

অংশ নেয়া ৭ দলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।[১৫৮] তৃতীয় সংসদ ১৯৮৭ সালে ১৩ জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয় । এ সময়কালে ৪টি অধিবেশন বসে এবং ৭৫ কর্মদিবসে ৩৮টি আইন পাস করে। এ সংসদে নির্বাচনে অন্যান্য রাজনৈতিক দল অংশ না নেয়ায় এবং প্রধানত সরকারের বিপক্ষে ব্যাপক ভাবে নির্বাচনী অসৎ উপায় অবলম্বনের অভিযোগ থাকায় তা জন সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়। বিরোধী জোটের আন্দোলন জোরদার হওয়ার পেক্ষাপটে ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকে। অর্থ্যাৎ তৃতীয় জাতীয় সংসদের মাধ্যমে কার্যত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসতেই পারে না।

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয় । প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট এবং দল এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্ঠি ২৫১টি আসন পায় এবং ৭৬ দলের সমন্বয়ে জাসদ (রব) এর নেতৃত্বের পক্ষে কথিত অনুগত বিরোধী দল ১৯টি আসন লাভ করে। উলেখ যে চতুর্থ সংসদে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সংরক্ষিত নারী আসন ছিলনা । চতুর্থ সংসদে ১৬৮টি কর্মদিবসে সর্বমোট ৭টি অধিবেশন হয় এবং ১৪২টি আইন পাস হয়।

জেনারেল এরশাদের শাসনামলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মুলত অচলা অবস্থায় ছিল। এই সময়ে গণতন্ত্রের বন্দিদশা হতে মুক্তির জন্যে দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর আন্দোলন করতে হয়েছে দেশবাসীকে, তাই এই সময়ে গণতন্ত্র বিকাশের আন্দোলন অব্যাহত ছিল এবং তা অঙ্কুরোদগম হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালের অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে।

(ঙ) খালেদা শাসনামল ঃ ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৮ম সংসদ ঃ

১৯৯০ সালে দেশের সর্বস্তরের জনগণের আত্মত্যাগ, বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধক ও দায়িত্ববোধ একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পথ উন্মুক্ত করে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয় এবং সরকার গঠন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শক্তিশালী সুসংগঠিত বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং এ সংসদের ৩৩০টি আসনের মধ্যে বিরোধীদের সংখ্যা ছিল ১৫৮টি যা অতীতের চারটি সংসদের কোনটিতেই দৃশ্যমান হয়নি[১৫৯]। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সরকারি দল শুধুমাত্র প্রধান বিরোধী দলের চাপই নয় বরঞ্চ

---

[১৫৮] ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন; আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা; প্রকাশকাল;তৃতীয় সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৯; পৃষ্ঠা-৪৯১।

[১৫৯] Dhaka Courier, 12.03.1993.

বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থক গোষ্ঠীর দাবিরও সম্মূখীন হয়। বিরোধী দল এবং সরকারি ব্যাক বেঞ্চর দাবির প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতৃত্ব অবশেষে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি শাসিত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা রোধে সংসদীয় কাঠামো উপযুক্ত বলেও ধারণা করা হয়। **গবেষকগণ বলেন-**æThe sprit of unity generated in the movement against autocracy was crucial in initiating the process and the ruling party was compelled to take into consideration the sentiment of the public and the opposition"[১৬০]। এভাবে বিভিন্ন পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ওপর সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে গণভোট শেষে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সংসদীয় আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সংসদীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠা দুরূহ হয় প্রধানত ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্বমুলক সম্পর্কের কারণে। পারস্পরিক অসহযোগিতার কারণে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারি দল চার দফা সমঝোতা স্বাক্ষর করলেও তা রক্ষিত হয়নি। বিরোধী দল নিজ দাবি অর্জনে সংসদের বাইরে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে এবং সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মত ৫ আগস্ট ১৯৯২ অনাস্থা প্রস্থাবের মতো সাতটি নোটিশ প্রদান করে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, ন্যাপ, সিপিবি, ওয়াকার্স পার্টি এবং গণতন্ত্রি পার্টি। উক্ত নোটিশগুলোর মধ্যে স্পিকার বিরোধীদলীয় উপনেতা আনীত নোটিশটি সংসদে আলোচনার জন্য অনুমোদন করেন। অবশেষে অনাস্থা বিস্তারটি ১৮৬- ১২২ ভোটে পরাজিত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২২টি অধিবেশনের মধ্যে বিরোধী দল প্রথম ১৩টি অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিল তবে ১৩তম অধিবেশনের পর আর সংসদে ফিরে যায়নি। বিরোধী দল গুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জামায়তে ইসলামী, এনডিপির,ওয়াকার্স পার্টির, জাসদ, এবং জাতীয় পার্টির।এই সময় সাংসদগণ সংশিষ্ট নির্বাচনী এলাকার অবকাঠামো গঠন, দেশের আর্থ-সামজিক পরিস্থিতি, সন্ত্রাস, মৌলবাদ উত্থান, ছাত্ররাজনীতি, গণতন্ত্রিক মূল্যবোধের ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পায়[১৬১]।

তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না করার ঘোষণায় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা দুরূহ হয়ে ওঠে। তবে সরকার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার তাগিদ দিয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ষষ্ঠ সংসদীয় নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। তবে

---

[১৬০]Hakim & Huque , Constitutional Amenments in Bangladesh; Regional Studies, Vol,12, Spring 1994, page; 88.

[১৬১] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রকাশ ; ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৪২।

উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া বিরোধীদের চরম বাধার সম্মুখীন হয়। এভাবে বিরোধী দল নির্বাচনের বিপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালায় ও নির্বাচনের আগের দিন হরতাল ডাকে এবং ভোট গ্রহণের দিন গণতন্ত্রকামী জনগণের কারফিউ জারি হয়[১৬২]। এ ধরণের সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে কঠিন নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার। এ নির্বাচনে মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ ভোটর উপস্থিতির কারণে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়[১৬৩]। তা ছাড়া ব্যাপক ভোট কারচুপি এবং অন্যান্য অসদাচরণের অভিযোগও ওঠে[১৬৪]। এভাবে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিতর্কিত হয়ে যায়। দেশী এবং বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীও এ নির্বাচনের সুষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হয় ১৯ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে এবং স্বল্পস্থায়ী এ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ক্ষমতাসীন দল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বলিত সাংবিধানিক বিধি প্রণয়ণে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করে। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাত্র চার দিন স্থায়ী কার্যদিবসে ২৬ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল ২৬৮-০ ভোটে নিবিঘ্নে পাস হয়ে যায়। এ সংশোধনীর আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের মধ্যদিয়ে সংবিধানে ৫৮ (বি), (সি), (ড), ও (ই) ধারা সংযোজিত হয় এবং ভবিষ্যতের সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাপ চালু হয়।

বেগম খালেদা শাসনামল বিশেষণ করলে দেখা যাবে যে স্বৈচারের পতনের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সব যেন সরকার ও বিরোধী দল ভূলে গিয়ে শুধু দোষরপের রাজনীতি এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধারের রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; যেমন- অক্টোবর ১৯৯১ সালে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে এবং ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিন ঘন্টা ব্যাপি এক বন্ধুক যুদ্ধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র মোকাবিলায় ছাত্রদলের দুজনকর্মী প্রাণ হারায়, তাছাড়া উভয় সংগঠনের কিছু কর্মী আহত হয়। ১৬ নভেম্বর আওয়ামী লীগ এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, বিএনপি এবং তাদের ছাত্র গঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের উপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। অবিলম্বে তা বন্ধ না করা হলে সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নামা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক উলেখ করেন[১৬৫]। অথচ পর্যবেক্ষ মহলের মতে ক্ষমতাসীন

---

[১৬২] প্রাগুক্ত।
[১৬৩] The Daily Star, 12.03.1996.
[১৬৪] প্রাগুক্ত।
[১৬৫] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ নভেম্বর , ১৯৯১।

বিএনপি সরকার এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ কে অবশ্যই সন্ত্রাস বিস্তার রোধে এবং তা নির্মূলের জন্য আন্তরিক এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে[১৬৬]।

১০ নভেম্বর ১৯৯১ সালের শহীদ নূর হোসেন দিবস পালন উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সংঠনের সমাবেশের কর্মসূচি পালন করেন। বিএনপি তাদের সমাবেশে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার শপথ গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, যারা অতীতে গণতন্ত্রতে হত্যা করেছে তারাই আবার আজ গণতন্ত্রকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে । আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সরকার বিরোধী সমালোচনা করা সহ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অদক্ষতা, অযোগ্যতার ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা উলেখ করার সাথে নুর হোসেন হত্যার বিচার দাবি করে [১৬৭]।

বিএনপি'র পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের এ ধরণের বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ১৬ নভেম্বর গণতান্ত্রকে স্থায়ী রূপদান ও জাতিকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আহবান জানান আওয়ামী লীগকে। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন- কোন কোন মহল ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণতন্ত্রকে সংহত করার পরিবর্তে একে ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা উন্নয়ন চায় না বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করতে প্রয়াস পাচ্ছে[১৬৮]।

২৩ নভেম্বর ঘোষিত এক আদেশের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা বাতিল হলে বিরোধী দলগুলো এর তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বলেন- এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকারের স্বৈরাচারি মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এবং সংবিধানের পরিপন্থি বলে বর্ণনা করেন। জাতীয় পার্টি নেতৃবৃন্দও এ সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে থেকে বলা হয়, উপজেলা পরিষদ যেহেতু জনগণের নির্বাচিত সংস্থা কাজেই একে বাতিল করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক। এটি দলীয় করণ বৈ আর কিছুই নয়। এসব সমলোচনার প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলের তথ্যমন্ত্রী বলেন স্থানীয় সরকার কাঠামোকে অধিকতর গণতান্ত্রিক এবং সংবিধান সম্মত করার জন্য উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় শাসনব্যস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা হবে[১৬৯]।

২০০১ সালের ১৫ জুলাই শান্তিপূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংবিধানের বিধান অনুসারে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। দেশের তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর

---

[১৬৬] প্রাগুক্ত।
[১৬৭] ইত্তেফাক , ১১ নভেম্বর, ১৯৯১।
[১৬৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ নবেম্বর , ১৯৯১।
[১৬৯] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯ নভেম্বর, ১৯৯১।

রহমানের নেতৃত্বে ১ অক্টোবর ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ভোটর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক অসংখ্য নির্বাচন পর্যবেক্ষক উক্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ যা পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে সক্ষম হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদেও সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে চরম বৈরি সম্পর্কের প্রকাশ সংসদীয় কাঠামোতেও লক্ষণীয় হয় এবং বরাবরের মতো বিরোধী দলের অসহযোগিতা ও সরকারি দলের অসহিষ্ণুতা ও বিরোধী সাংসদগণকেও সংসদে কথা না বলতে দেয়ার পারস্পরিক অভিযোগ আনা হয়। এভাবে বিরোধী দলের সমাবেশে বোমা হামলার ঘটনাসহ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মুলতবি প্রস্তাবের কোনটিই গ্রাহ্য করা হয়নি। বিরোধী দলও সংসদের ফ্লোর থেকে ওয়াকআউট করে এবং উভয় পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে অনির্ধারিত রাজনৈরতিক বিতর্ক ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। বিরোধী দল লাগাতার ভাবে সংসদ অধিবেশন বয়কট করে এবং ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে মাত্র ৯টিতে অংশ নেয়। অষ্টম জাতীয় সংসদে মূল্যবান সংসদীয় ঘন্টার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়নি বা অপব্যবহার হয়েছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ৩৭৩ কার্যদিবসের ১৭৮ টিতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অনুপস্থিত ছিলেন। অপদিকে বিরোধী দলের নেত্রী ৩২৮টি কার্যদিবসে জাতীয় সংসদে যোগ দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। এ সংসদে কোরাম সঙ্কট ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং কোরাম সঙ্কট মোট ২৩টি সংসদীয় অধিবেশনের এক-পঞ্চমাংশ [১৭০]। এভাবেই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করার মত চিরাচরিত পদ্ধতির কারণেই আসলে সরকার ও বিরোধীদলের বৈরি ভাবাপন্ন নীতি গণতান্ত্রিক যাত্রা পথের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে।

(চ) হাসিনা শাসনামল ঃ ৭ম এবং ৯ম সংসদ ঃ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিএনপি সরকারের প্রস্থানের পর চলমান রাজনৈতিক অচালবস্থার অবসান ঘটে এবং নব প্রবর্তিত সাংবিধানিক বিধান অনুসারে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। সংবিধান সম্মত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুসহ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সপ্তম জাতীয় নির্বাচন যথা সময়ে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় এবং এ নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেয়। আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। বিএনপি ১১৬টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় এবং জাতীয় পার্টি ৩২ টি আসনে জয়ী হয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

---

[১৭০] New Age, February 13, 2007.

বিএনপি ১১৬টি আসন নিয়ে সংসদে দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় এ দলকে সরকারিভাবে সংসদীয় বিরোধী দল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। দেশের সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম এতো বেশী সংখ্যক বিরোধী সদস্য সংসদে দৃশ্যমান হয়। এ সময়ে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার ঐক্যমত্যের সরকারে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ ধরণের সরকার বাংলাদেশের সংবিধান ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেন[১৭১]। তিনি এ সরকারকে কোয়ালিশন সরকার হিসেবে অভিহিত করে জাতীয় সংসদে তার দলের দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের ঘোষণা দেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রথমবারের মতো এ সংসদ তার মেয়াদ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। এই মেয়াদে সপ্তম জাতীয় সংসদ সর্বমোট ৩২টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং এর ৩৮২টি কার্যদিবসে ১৮৯ বিল পাস করে[১৭২]। তবে প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের শুরু থেকেই ট্রেজারি বেঞ্চ এবং প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন লক্ষণীয় হয়নি। সংসদের ফ্লোরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ও বিরোধী দলের ওয়াক আউটের মধ্য দিয়ে স্পিকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষের সাংসদগণ সংসদীয় প্রথাভিত্তিক আচারণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৯৯৯ পর্যন্ত ২৯৫৩৭৮টি জমাকৃত পার্লামেন্টারি প্রশ্নের ৩২.৮ ভাগের ওপর উত্তর প্রদান করা হয় এবং উক্ত সময়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের ওপর পেশকৃত ১৫০০০টি নোটিশের ১৩.৫ ভাগ আলোচিত হয়[১৭৩]।

সপ্তম জাতীয় সংসদকে অধিক গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে এ সময়ে কয়েকটি উলেখযোগ্য সংসদীয় সংস্কার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উত্থাপিত সকল বিলের সংশিষ্ট কমিটিতে আবশ্যিক প্রেরণ, সংসদের তৃতীয় অধিবেশন থেকে ১৫ মিনিটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু যা পরবর্তীতে ৩০ মিনিট স্থায়ী করা হয় এবং কার্যপ্রণালী বিধির ওপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে মন্ত্রী নন এমন সাংসদকে সংসদীয় কমিটির প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন- এ ধরনের সংস্কারের ফলে জা্তীয় সংসদের কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা হলেও সার্বিক সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পুরোপুরিভাবে পড়েনি[১৭৪]। বাংলাদেশে ৭ম জাতীয় সংসদে এ প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উলেখকরা হয়েছে- No pressing issue of national importance was reflected from such endeavours as

[১৭১]Dhaka Courier, 18.02.2000.

[১৭২] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রকাশ ; ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৪৫।

[১৭৩] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রকাশ ; ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৪৬।

[১৭৪] প্রাগুক্ত।

treasury bench members through their passive queries, only highlighted success stories of the ruling party. Prime Mimister's reply to the questions of the oppostion MPs, as such, did not prove the trasparancy of the governments crucial policies in any way'[175].

২০০৬ সালের শেষ ভাগে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতার ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে ১/১১ এর সৃষ্টি হয়।[১৭৬] ১২ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ফখরুদ্দীন আহমদ। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। ফখরুদ্দীন ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। এই দুই বছর ২ মাসে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়।[১৭৭] নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লগি নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল ভোটে জয়ী হয়। আওয়ামী লীগ এই সময় সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন করে

দেশের পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মতো সপ্তম ও নবম জাতীয় সংসদও নিজেকে নীতিনির্ধরণের কেন্দ্র বিন্দুতে রূপান্তরিত করতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম না হওয়ায় সরকারি ও বিরোধী দলসমূহ রীতিসিদ্ধ সংসদীয় রাজনীতি চর্চা করতে পারেনি। সরকারি দলের প্রাধান্য বিস্তরের প্রচেষ্টা এবং সে সাথে শুধু বিরোধীতার খাতিরে বিরোধী ভূমিকা পালন তাই গঠনমূলক হতে পারেনি।বিরোধী দলের সংসদের বাইরে এবং ভেতরে সরকারবিরোধী আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম যথারীতি চলে এবং যথাসময়ে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্তি হয়

৬.৫ সরকারগুলোর নিকট জনগণের প্রত্যাশা, নিরাশার কারণ ও প্রাপ্তি

রাজনীতি একটি অত্যন্ত মহৎ পেশা। জনগণের সেবা ও খেদমত করার সুযোগ ও পরিবেশ এর চেয়ে বেশি আর কিছুতে নেই। তাই জনগণের প্রত্যাশা প্রাপ্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে রাজনীতি ও রাজনৈতিক বাস্থাপনার নিকট। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতি ভ্রান্ত, অভিশপ্ত, রাহুগ্রস্ত, এক অন্ধকার অমানিশায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে মুহুর্তের জন্য সোনালী সূর্য। তবে তা ক্ষণস্থায়ী।

[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৭।
[১৭৬]Md. Masud Sarkar and Amd Bayezid Alam, The Role od Weastern Diplomat's in Bangladesh Politics : A study on 1/11 and its aftermath, Lap Lambert Academic Publishing, Germany.
[১৭৭] জিবলুর রহমান, জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপট, মৌলি প্রকাশণী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৮৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) জনগণের প্রত্যাশা ঃ

সরকারগুলোর কাছে জনগণেরপ্রত্যাশা ছিলঃ

১. দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ

২. অশিক্ষা ও কুসংস্কারমুক্ত বাংলাদেশ

৩. বহুদলীয় গণতন্ত্র

৪. সংসদীয় গণতন্ত্র

৫. প্রকৃত স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

৬. ক্ষমতা পৃথকীকরণ

৭. আমলাতন্ত্রমুক্ত গতিশীলতা শাসনকার্য

৮. উৎপাদনমুখী রাজনীতি

৯. হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও মুক্ত রাজনীতি

১০. আইনের শাসন

১১. শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন

১২. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা

১৩. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক পলী উন্নয়ন

১৪. শতভাগ স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক

১৫. উন্নয়ন বান্ধব শিক্ষানীতি

১৬. কাঙ্খিত ও সহনশীল পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

১৭. জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর সর্বোচ্চ উন্নয়ন

১৮. নারী পুরুষের উন্নয়নে সমতা বিধান

১৯. শিশুর শিক্ষা ও নিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা

২০. বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও প্রতিবন্ধীর শতভাগ নিরাপত্তা

২১. প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

২২. ভু-রাজনৈতিক কৌশলগত সুবিধা রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার

২৩. প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে গঙ্গাসহ সকলনদ নদীর পানি বন্টন সমস্যার সুসম সমাধান

২৪. অভ্যন্তরীণ নদ নদীর নাব্যতা সংরক্ষণসহ পানি সম্পাদের যথাযথ ব্যবহার

২৫. বাংলাদেশের যথাযথ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা

২৬.কারিগরি ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

২৭.দক্ষ জনসংখ্যার বিশ্বায়ন ঘটানো

২৮.ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন ঘটানো

২৯.বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ও চাষাবাদ প্রচলন

৩০.শিল্পায়নকে দ্রুততম করণ

৩১.টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা

৩২.বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ

৩৩.পর্যাক্রমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনা

৩৪.নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুরো দেশব্যাপী বিস্তার ঘটানো

৩৫.প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যোগাযোগের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।

৩৬.কাচামাল নির্ভর শিল্প কলকারখানা স্থাপন

৩৭.ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকেন্দ্রিকরণ উপজেলাকে ইউনিট ধরে জোরালো কার্যক্রম গ্রহণ

৩৮.সৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করণ

৩৯.আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন

৪০.আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে কার্যকরী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ফোরাম প্রতিষ্ঠা

৪১.ম্যাক্র ও মাইক্রো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

৪২.যুগোপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

৪৩.শিক্ষা সংস্কার

৪৪.যুগোপযুগি ভুমি সংস্কার

৪৫.সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উন্নয় বান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপন

৪৬.ব্যাংকিং খাতে যথোপযুক্ত সংস্কার

৪৭.স্বাস্থ্যখাতে যথোপযুক্ত ও যুগোপযোগী সংস্কার

৪৮.জাতীয় কৃষিনীতি ঘোষণা

৪৯.প্রাকৃতিক দুযোর্গ, বন্যা খরা ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫০.কালোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রচলনঃ শিশু শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, পেশাদার শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা

৫১.সমুদ্র বন্দরউন্নয়ন, স্থল বন্দর কার্যকর করা এবং বিমান বন্দরের আধুনিকায়ন করা

৫২.কার্যকর বেতার যোগাযোগ স্থাপন

৫৩.খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান উৎপাদন জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার

(খ) জনগণের নিরাশার কারণ ঃ

সকল প্রত্যাশার মায়াজাল ছিন্নকরে স্বাধীনতাত্তোর বাংলার মানুষ পরম বিশ্বময়ে লক্ষ্য করল একে একে মৃত্যুবরণ করছে সকল স্বপ্ন। শুকিয়ে যাচ্ছে আশার নদী, ফুরিয়ে যাচ্ছে আলো, ধেয়ে আসছে অন্ধকার। বিপন্ন মানুষ, বিপন্ন মানবতা, বিশৃঙ্খলা সর্বত্র দুর্নীতি আর সীমান্ত পাচারে দেশ ফতুর। বাংলাদেশের আশাহত মানুষের নিরাশার কারণ তুলে ধরা হলো ঃ

১. উত্তরাধিকার সূত্রে, বিপুল ক্ষমতা ও বিশাল অবয়বধারী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র ও তার পরিচালক সরকারের ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্বের চর্চা।
২. দুর্নীতিগ্রস্থ নেতৃত্ব।
৩. অনভিজ্ঞ, অদক্ষ, অজ্ঞচাটুকরপরিবেশিষ্টত নেতৃত্ব।
৪. পাকিস্তানি ঔপনিবেশ বিরোধী নেতৃত্বে যারা সফল বিরোধী আন্দোলনে পারদর্শী তারা স্বাধীন দেশ গঠনে ব্যর্থ।
৫. আক্রান্ত জনতা আহত সিংহের মতোই ঝাপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি শাসক ও সামারিক জান্তার ওপর। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সময়ের দাবি, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল যার নির্মাতা ছিলেন যুদ্ধকালীন নেতৃত্ব। সেই চেতনার অপমৃত্যু।
৬. স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত তথ্যওফপাত্ত প্রমাণ করে নেতৃত্বের অপরিপক্কতা, অদূরদর্শিতা।
৭. আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা, ভারতের ভু-রাজনৈতিক কৌশল। পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সাপে নেউলে সম্পর্ক তথা বিশ্ব রাজনীতির কঠিনতম ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব।
৮. আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে স্থায়ী দ্বন্ধের জন্ম দেয় এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংঘাতপূর্ণ বিপরীত মেরুকরণের জন্ম দেয়।
৯. স্বৈরতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের নেতৃত্ব সদ্যজাত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার।
১০. স্থানীয় পর্যায়েনীতিহীন নেতৃত্বের উত্তরাধিকার, যার ফলে দুর্নীত, কালোবাজারী, মজুদদারি, সীমান্তে পাচার ছিল স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

১১. পরিবারতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, এলিটতন্ত্র, দলতন্ত্র, বিশেষ বাহিনীর প্রবল দাপট বাংলাদেরেশর শাসক ব্যবস্থাকে বা পুরো দেশকে এশটি বিশৃঙ্খলা রাষ্ট্রে পরিণত করেছে । নেতৃত্বের দুর্বলতা বাংলাদেশের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী।

১২. সরকার বিরোধীদের সমালোচকদের ওপর চরম নির্যাতনের ফলেই আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনীতির জন্ম হয় যা নেতৃত্বের অগণতান্ত্রিক আচরণের ফল।

১৩. গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা নেতৃত্বে সফল স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করেও স্বাধীন দেশে একদলীয়, অগণতান্ত্রিক, শাসনের চরম পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায় এবং ভয়ঙ্কর পরিণতি বরণ করে।

১৪. কয়েকটি অভ্যুত্থানও পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সামারিক একনায়কের ক্ষমতা দখল।

১৫. স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের পুনরুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের নির্বাসন।

১৬. পাকিস্তানি সামারিক, সমাজতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের পুনর্বাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত।

১৭. নব্যবুর্জোয়া, সমাজতন্ত্র ও পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং রাষ্ট্রের ছত্রছায়া রাষ্ট্রীয় সম্পদের দেদার লুটপাট করে নব্য ধনীক শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার অবাধ প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

১৮. সর্ববৃহৎ ও সুসংগঠিত ও চৌকোশ বাহিনী হিসেবে সামারিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন, দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েমের মাধ্যমে বঞ্চিত বৃহৎ শ্রেণীর নামে ধোকাবাজির নেতৃত্ব পরিণত হয়।

১৯. জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয়সংহতিরবিনাশসাধনেরনেতৃত্ব রূপ লাভ করে।

২০. স্বাধীনতা বিরোধী মতাদর্শের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা যা মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি অবমানননার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

২১. খুনি ও হত্যাকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার নেতৃত্ব।

২২. বন্দুকের নলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে বন্দুদের নলের মাধ্যমে ভোট আদায়ের নেতৃত্ব।

২৩. বিভ্রান্ত বাম রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

২৪. অনুগত নির্বাচন কমিশন।

২৫. সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতির পুনরুদ্ধার

২৬. নেতৃত্বের কথামালার রাজনীতি।

২৭. নেতৃত্বের নীতিহীনতার রাজনীতি।

২৮.ক্ষমতারকেন্দ্রীকরণনিয়ন্ত্রণওপ্রয়োগেররাজনীতি

২৯.জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি নয় রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সামরিক শাসকের অসামরিক পোশাকে ফরমান জারির রাজনীতি।

৩০.রাজনৈতিক দল শ্রেণী স্বার্থের প্রতিভূতে পরিণত হল, নেতা বিশেষ শ্রেণীর নেতায় পরিণত হল।

৩১.ছাত্র ও ছাত্ররাজনীতি দলীয় রাজনীতির তল্পিবাহক পরিণত হল। হয়ে উঠল রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার হাতিয়ার।

৩২.বিরাষ্ট্রীয় করণের মাধ্যমে জনগণের রাষ্ট্রীয় সম্পদ মিল, কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় পরিণত হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদে বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পদে পরিণত হতে লাগল।

৩৩.রাষ্ট্রীয় আমলা শ্রেণী নিজেদের ভাগ্য বদল ও ক্ষমতার ভাগিদার হতে সামারিক শাসকের তল্পিবাহকে পরিণত হল

৩৪.রাজনীতিতে সামারিক বাহিনীর ভুমিকা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

৩৫.আর্ন্তজাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান বদল ঘটল।

৩৬.ইতিহাস বিকৃতিররাজনীতি।

৩৭.দুর্বলগণতন্ত্র।

৩৮.নেতৃত্বের নৈতিক অবক্ষয়।

৩৯.বিকাশমান স্বৈরতন্ত্র।

৪০.নেতৃত্বের সামরিকীকরণ।

৪১.অদুরদর্শীনেতৃত্ব।

৪২.রাষ্ট্র হয়ে উঠল বলপ্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

৪৩.অসহিষ্ণু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনল।

কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শাসকদের চালচিত্র, কর্মকান্ড, নেতৃত্ব গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থহল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব স্বাধীনতা পূর্ব অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিপক্ষে গনরায়। ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণরায়। কাজেই স্বাধীনাত্তোর বাংলাদেশের একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করে, এই সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের প্রয়াস পেলে হয়তো জাতির ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। হয়তো বা ঘটে যাওয়া ইতিহাসের

Dhaka University Institutional Repository

কলঙ্কজনক স্মৃতি আর অধ্যায় থেকে বাংলাদেশে রেহাই পেতেও পারত। যা হোক আমরা স্বাধীতা পেলেও আমাদের মুক্তি আজও সুদুর পরাহত রয়ে গেল।

(গ) জনগণের প্রাপ্তি ঃ

স্বৈরতন্ত্র, একনায়তন্ত্র, সীমাহীন দুর্নীতি, সীমান্ত পাচার, চরম বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, পুরনো কায়দায় মানুষেরওপর অত্যাচার, নির্যাতন, একদলীয় শাসন, রহিত হল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বন্ধ হয়ে গেল সংবাদপত্র, রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র হয় গেল সরকারের মুখপাত্র। অতঃপর রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড, জেলহত্যা, সামরিক অভ্যূত্থান, পাল্টা সামারিক অভ্যূত্থান, হাজার হাজার সাধারণ সৈনিকের মৃত্যুদন্ড, সামারিকঅফিসারদের আত্মকলহ ও হত্যাকান্ড,স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থান, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন, ভঙ্গুরগণতন্ত্র, শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, লাল ফিতায় দৌরাত্ম, প্রকট নেতৃত্বের সংকট । আজ রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্থ, সুশাসন ও সুযোগ্য নেতৃত্বের সুদুরপরাহত সর্বোপরি দেশের অর্থনীতি ও মানমর্যাদা বিপন্ন। মুক্তিযুদ্ধের মত মহান গৌরবের বিষয় আজ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের নিষ্ঠুর মাধ্যম।

প্রত্যাশা-প্রাপ্তি ও আশা-নিরাশার এই সন্ধিক্ষণে সবচেয়ে বেশী সহায় গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সর্বপোরি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

সপ্তম অধ্যায়

রাজনৈতিক সংস্কৃতি: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

৭.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচিতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক প্রাচীন যুগের গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন- মানুষ সামাজিক জীব-সে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা। মানুষ জীবনের বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত নানা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন গড়ে তোলে।এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি মানুষ একে অপরের প্রতি যে আচারণ করে এবং তাদের মধ্যে যে সব আচার বা সংস্কার গড়ে ওঠে তার সামগ্রিক রূপকে সংস্কৃতি বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দির লেখক এডওয়ার্ড টেনলর বলেছেন- মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচারণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যার্টান হলো সংস্কৃতি[১৭৮]।

নৃবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে আলোচিত সংস্কৃতি শব্দটিকে রাজনীতির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবদান রেখেছেন । **Gabrial Almond**তার মতে The pattern of individual attiudes and orientation towards politics shared by members of a political system.[১৭৯]। **অধ্যাপক এম সাইফুলাহ ভুইয়ার** ভাষায় Political culture like political socialization and communication is one of the concepts which in recent years is being widely used in political science literature. It has since been employed in the comperative not simply of the developing countries but of the developed naitons as well[180]. **Allan R. Ball** এর মতে "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, আবেগ ও মুল্যবোধের সমষ্টি যেগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদির সাথে সর্ম্পযুক্ত"[১৮১]**Lucian W. Pye** রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো ধ্যান ধারণা বিশ্বাস এবং অনুভুতির এমন এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অর্থপূর্ণ করে তোলা এবং এদের মধ্যে এক প্রকার ভাবের সমন্বয় ঘটানো। রাজনৈতিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এদের অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের সঠিক প্রকাশ ঘটে[১৮২]।

Almond and verbaতাদের বিখ্যাতে গ্রন্থ **The Civic Culture**এ বলেন "রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি দ্বারা সুনির্দিষ্ট কতিপয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝায়,

---

[১৭৮] গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা ২০১০, পৃষ্ঠা-১৩।
[১৭৯]Almond Gabrial, Comparative Political Systems; Journal of politics, PP 391-409G
[180] Bhuyan, M. Sayefullah, 199 ,Political Culture in Bangladesh, Dhaka University Journal, p 67.
[১৮১] ভুইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন; অজিজিয়া বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ; ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২৮৪।
[১৮২]L. W. Pye and Verba, end. Political Culture and Political Development, princeton University, pp 218.

রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে মনোভাব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশ করে।"[১৮৩]

Samuel H Beer বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো ক্ষমতা, স্বার্থ এবং নীতিমালার সাথে সম্পর্ক যুক্ত পরিবর্তশীল একটি ধারণা, এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরণ ও প্রকৃতিতে কোন রূপ পরিবর্তন আনয়নের জন্য দায়ী এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরিকল্পিত ও অনভিপ্রেত আচরণ, মুল্যবোধ ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে[১৮৪]।

অধ্যাপক কে বি সাঈদ বলেন That sector of the natonal or general culture which consist of values, beliefs and adutioes pertaning to political as a whole.[১৮৫]

David Paul তার মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো মূল্যবোধ, প্রতীক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের পর্যবেক্ষণ যোগ্য এক বহিরাকৃতি স্বরূপ যাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করলে মনোভাবনাতে উপাত্ত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর আলোকরাশ্মি বিতরণ করতে সক্ষম[১৮৬]।

সিডনী ভারবা বলেন, পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক ও মূল্যবোধের সমষ্টি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতিই রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতি ও পরিধি ব্যাখ্যা করে।[১৮৭]

গোপাল হালদারের মতে, মানুষের জীবনসংগ্রামের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।[১৮৮] আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো এই সাধারণ সংস্কৃতির সেই অংশ যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি ও মুল্যায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে **তালুকদারমনিরুজ্জামান বলেন,** রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রতিবেশ পরিচিতি সে সকল দিকের সমষ্টিকে বোঝায়, যা ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবহারকে

---

[১৮৩]Almond and verba, The Civic Culture , princeton University, pp 13.
[১৮৪]Civic Culture, Princeton University press 1963, pp 15.
[১৮৫]Sayeed, K.B. The Political System of pakistan, pp 159.
[১৮৬]Civic Culture, Princeton University press 1963, pp 15.
[১৮৭]L. W. Pye and Verba. S . 1965 , Political Culture and Political Development, princeton University, pp 218.
[১৮৮] হালদার, গোপাল, সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩।

প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক সামাজীকরণ ও নিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে সেই কার্যপ্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি এই প্রতিবেশ পরিচিতিকরণ লাভ করে[১৮৯]।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপরোলিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশেষণ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে ধ্যান, ধারণা, শ্রদ্ধাবোধ, নিয়মতান্ত্রিক আইনের প্রতি আনুগত্য, গণতন্ত্রের প্রতি সহযোগিতা, রাজনৈতিক চর্চা ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি ও মূল্যবোধের সমষ্টি। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক ব্যবস্থায় সংস্কৃতির যেমন গুরুত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব অত্যাধিক[১৯০]।

৭.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ

পৃথিবীর সকল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরণ এক নয়। তাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন দিক থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিন্যাস করেছেন । এ ক্ষেত্রে এ্যালমন্ড, ভারবা, কোলম্যান, লুসিয়ানপাই, রজেনব্যাম প্রমুখের নাম উলেখযোগ্য।

রজেনব্যামের রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণী বিভাগ

ওয়াল্টার এ রজেনব্যাম তার গ্রন্থে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দু ভাগে ভাগ করেছেন।

১. ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ

অধ্যাপক রজেনব্যামের মতে ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসমাজ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গোত্রতে বিভক্ত এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তাদের পরস্পর বিরোধী এবং অসঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

২. সমন্বিতরাজনৈতিকসংস্কৃতি ঃ

ভঙ্গুর রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংস্কৃতিকেই সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার রীতিনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য লক্ষ্য

[১৮৯]Muniruzzaman, Talukder, The politics of Development the case of pakistan 1947-1958, Green Book House Limited, Dhaka, page- 5.
[১৯০]L. W. Pye and Verba, S , Political Culture and Political Development, Translated in Bangali by Ahsan Habib,রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, গ্রন্থকুটির, ২০০৮।

সমূহ বিরোধ নিষ্পত্তির সিভিল নিয়মাচার, প্রতিষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে যেখানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা বিদ্যমান, সাধারণতঃ তাকেই অখন্ড বা সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে।

- **সংকীর্ণ রাজনেতিক সংস্কৃতি ঃ**

সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেই সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে, যেখানে এর সদস্যপদ জাতীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন কাঠামো ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন ধারণা বা জ্ঞান রাখে না। ব্যক্তি নিজেকে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মনেকরে না এবং ব্যক্তির ভুমিকা পালনের কোনো সুযোগও থাকে না। এরূপ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

- **অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ**

অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর উপাদন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা ও ধারণা বিদ্যমান এবং জনগণ এর মুল্যবোধের বন্টন আশা করে। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ ও কার্যাবলী সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণভাবে নীরব ও নিস্পৃহ থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের ভুমিকা নেই এবং তারা ভুমিকা পালন করতে আগ্রহী হয় না। তবে এরূপ সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী।

- **অংশগ্রাহক রাজনৈকি সংস্কৃতি ঃ**

অংশগ্রাহক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এর বিভিন্ন কাঠামো ও এর কার্যাবলী , দাবী দাওয়া ও উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পোষন করে। সেগুলো ব্যক্ত করে জনগণ রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে ক্ষমতা পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ঐক্যমত্য বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ নির্বাচনকে তারা ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ পদ্ধতি বলে মনে করে।

উপরিউক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ছাড়াও **পৌর সংস্কৃতি , এলিট সংস্কৃতি, গণ সংস্কৃতি, উপ সংস্কৃতি , ভুমিকা সংস্কৃতি, নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি ও মিশ্র সংস্কৃতি রয়েছে।**

- **পৌর সংস্কৃতি**

এটি এক ধরণের মিশ্র সংস্কৃতি যার মধ্যে সংকীর্ণ, প্রজাসুলভ ও অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়। পৌর রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পন্ন নাগরিকগণ রাজনীতিতে যৌক্তিক আচরণ করে এবং আবেগের পরিবর্তে যুক্তি ধারা পরিচালিত হয়।

- **এলিট সংস্কৃতি ঃ**

প্রতিটি সমাজের এলিটরাই অধিকতর শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন। তারা জনগণের চেয়ে উন্নত ধরণের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধিকারী।

- **গণ সংস্কৃতি ঃ**

গণ সংস্কৃতির বিষয়টি এলিট সংস্কৃতির সাপেক্ষে বিবেচ্য। সমাজের অীধকাংশ মানুষই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত নয় এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন নয়। এই সংখ্যাধিক্য জনগন বিশেষ ধরনের রাজনীতিক সংস্কৃতি ধারণ করে যা এলিটদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক। এ ধরনের সংস্কৃতিকেই গণ সংস্কৃতি বলা হয়।

- **উপ সংস্কৃতি ঃ**

প্রতিটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিই মিশ্র প্রকৃতির। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেক সময় ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। যখন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক প্রকৃতির হয় তখন তাকে উপ সংস্কৃতি বলা হয়।

- **ভুমিকা সংস্কৃতি ঃ**

জটিল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষীকৃত কাঠামো সমূহ যেমনঃ আমলা, সামরিক বাহিনী, প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতা ইত্যাদি বিশেষ ভুমিকা পালন করে । সমাজে বিশেষ ভুমিকা পালনকারী এসব ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই ভুমিকা সংস্কৃতি বলা হয়।

- **নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি ঃ**

যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সমাঞ্জস্য পূর্ণ তাকে নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি বলা হয় । বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক কাঠামো অধিকতার উপযোগী ও সংগতিপূর্ণ হয়।

৭.৩ তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত একটি দেশ। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর আয়তনে যেমনই হোক না কেন এর লোক সংখ্যা বহু এবং এ সকল দেশসমূহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। যার কারণে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি অসম ভাবে গড়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো,

১. এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের বেড়াজালকে ছিন্ন করে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক পটভুমিতে গড়ে উঠতে পারেনি।
২. এখানকার রাজনেতিক দল, সংঘ ও সদস্যগণের মধ্যে অতি মাত্রায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিদ্যমান।
৩. অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলো অধিকাংশ সময়ই আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ফলে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা আদর্শগত রাজনৈতিক কোন্দল এ সকল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায়।
৪. এই সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগণের অত্যাধিক আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে দেখা যায় যে জনগণ একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা নীতির প্রতি যতখানি অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল তদাপেক্ষা অধিক অনুগত কোন কোন রাজনৈতিক দল বা এর নেতার প্রতি।
৫. এ সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠী বৈপবিক ভুমিকা পালন করে থাকে। ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে । বিরোধী দল ও এলিট গোষ্ঠী সরকার কর্তৃক লব্ধ যে কোন পরিবর্তন বা উন্নয়নকে অনর্থক সমালোচনা করে বাধা প্রদান করতে চায়, যার ফলে এই জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।
৬. এ জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুসংহত ও যথাযথ যোগাযোগের অভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণকারী সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন রূপ একাত্তবোধ পরিলক্ষিত হয় না। এখানে সর্বজন স্বীকৃতি কোন রাজনৈতিক প্রণালী নেই। গ্রামীণ রাজনীতিবিদরা শহুরে রাজনীতির প্রতি একেবারেই উদাসীন ও সম্পর্কহীন। ফলে গ্রামীন ও শহুরে রাজনীতির ধারাও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়।
৭. তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বৈধ উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাব দেখা যায়। এই সংস্কৃতিতে কিছু লোক পাশ্চত্য সভ্যতা ও চেনতার উদ্ধুদ্ধ থাকে বা মূলত শহরাঞ্চলে পরিলক্ষিত হয় । অন্যদিকে গ্রামীন জনগণ পাশ্চত্য চেতনা ও সভ্যতার প্রতি একেবারেই উদাসীন থাকে তারা তাদের নিজস্ব চেতনা ও ভাবাদার্শে পরিপুষ্ট হয়।

৮. তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্যারিজমেটিক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন, রাজনীতিতে সামারিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ, অধিক মাত্রার দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক অস্তিতিশীলতা এবং অসাংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রবণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সমূহেও বিশেষভাবে পলিক্ষিত হয়।

৭.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ

বাংলাদেশ একটি নতুন রাষ্ট্র কিন্তু বহু পুরাতন দেশ। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস এখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও ভাষার দেশি বিদেশি শাসকেরা শাসন করেছেন এবং বাংলার মানুষ নানা ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় জন্ম নিয়েছে নানামুখী স্বার্থগোষ্ঠী বা এলিট গ্রুপ। এসব গ্রুপের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফসল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষত্ব হচ্ছে এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য দুবার লড়াই করতে হয়েছে। প্রথম লড়াইটি ছিল একাধারে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। অধিকতর অগ্রসর হিন্দু দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মুসলিম এলিটরা ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় এবং বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। স্বাধীনতার দ্বিতীয় লড়াইটি ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির বৈষম্য মূলক আচারণের বিরুদ্ধে মুক্তির আন্দোলন। এ সংগ্রাম ১৯৭১ সালে সশস্ত্র রূপ নেয় এবং জন্ম নেয় গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন মোড় নিতে থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল দেখা দেয়। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক চরিত্র বিশেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে ফুটে উঠবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা কতখানি। অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোকপাত করা হলো।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি ও প্রবনতা

৮.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবাদ

এই মানুষের জাতি কত প্রকার? কবির ভাষায় : জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি। আর একটু খন্ডিত করে দেখলে তাদেরকে নারী ও পুরুষ , বড় জোর এই ভাগে বিভক্ত করা চলে। আমরা সকলেই যখন একই মাতা পিতা অথ্যার্ৎ আদম হাওয়ার সন্তান, তখন মানুষের মধ্যে এত জাতিগত বিভক্তি কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে সভ্যতার অগ্রগতি, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের পেশা, ধর্ম, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত চিন্তা, দেশাচার, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামো এই জাতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। যেমন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানরা একটি জাতি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদীরাও একটি জাতি। পেশাগত কারণেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি হয়। যেমন লোকটি জাতিতে গোয়ালা কিংবা নাপিত। আবার বর্ণ বা সম্প্রদায়গত দিক দিয়েও জাতি হয় যেমন- নিশিবাবু ব্রাক্ষ্মণ, সুনীল বাবু জাতিতে কায়স্থ। আবার ভাষাগত পার্থক্যের জন্যও জাতি হয় যেমন ইংরেজ জাতি, বাঙালি জাতি, আরব জাতি[১৯১]।

হেনরি সেসিল উইন্ড এর ব্যাখ্যায় বলেছেন জাতীয় ঐক্যানুভুতি অর্থ্যাৎ Sense of national unity এই অনুভূতি দশজন ব্যক্তিকে একই কার্যেও অনুপ্রাণিত করে[১৯২]। **Dictionary**র ভাষায় Nationalism donotes a form of group consciounsness i. c consciounscess of nationality and identifies the fortunes of mombews with that of a nation state desired or actineved[193]. জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি জাতিতে দলবদ্ধ সামগ্রিক চেতনাবোদ যেখানে জাতি রাষ্ট্র ভিত্তিক যার ভাষা, ধর্ম এবং মূল্যবোধ রয়েছে। সুতরাং এর উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ রয়েছে[১৯৪]। **Kohn এর মতে,** জাতীয়তাবাদী চেতনা শুধু সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, যন্ত্রকৌশল, সম্বলিত অগ্রগতির ভিত্তি। জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটে নিজ জাতির ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং এ সকলের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধের মধ্যে[১৯৫]। **E.H. carr**এর মতে জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ১. সর্বগ্রাহ্য সরকার ২. নির্দিষ্ট ভূখন্ড ৩. জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ৪. সার্বজনীন আগ্রহ ৫. সম্মিলিত ইচ্ছা ও অনুভূতি[১৯৬]। **পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে,** জাতীয়তাবাদের মূলে রয়েছেঃ Common Language, value system, religion and literature, common economic

[১৯১] মূসা, আহমেদ সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, কেন বাংলাদেশী কেন বাঙালী নই, শেখ নূরুল ইসলামএর প্রবন্ধ, দিব্য প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা-২১১।

[১৯২] প্রফেসর ড. শওকত আরা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ রাজনীতি বিকাশ ও জনপ্রিয়তা, কমল কুড়ি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: একুশ বইশেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭৫-১৭৬।

[১৯৩] প্রাগুক্ত

[১৯৪] প্রাগুক্ত

[১৯৫] প্রাগুক্ত

[১৯৬] প্রাগুক্ত

and political creads, cmmon government, historical tradition, symbol and experiences, eonflic and common enemies, the grooth of communication system etc[197]. এসকল উপাদান জাতীয়তাবাদ নির্মাণে সহায়ক। কিন্তু প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে এবং জাতিতে সকল উপাদান সম পরিমাণে থাকে না। যেমন একই ভাষা, একই ধর্ম উপস্থিত নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ধর্ম, ভাষা বিবেচিত হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **গেটেল এর ভাষায়**, Nationality is mainly a psychological feeling; it is a belief on the part of its members that they belong together, that they posses a common pride or common grievances, that they have a common heritage and common tradition. It results from several instincts, including gregariousness or the herd instinct; pugnacity or the fighting instict; egoism which includs the self-preserveantion and self aggrandizement and wich is most intense in time of danger, and submission, on the tendency to follow leaders. Nationality, therfore, is largely matter of Sentiment; its is a state of mind; a way of living, thinking and feeling[198]. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে **প্রখ্যাত আইনবিদ গাজী শামসুর রহমান** লিখেছেন-" জাতীয়তাবাদ একটি বোধ; বলা যায় একাত্মবোধ। যখন কোনো মানবগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় চেতনায় একাত্ম অনুভূব করে, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বোধ জাগ্রত হয়। অর্থ্যাৎ জাতীয়তাবাদ জনগণের একাত্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী একই ভৌগলিক সীমায়বাস করে, একই ভাষায় কথা বলে, একই সংস্কৃতিতে আস্থাবান থাকে এবং এই সমস্ত কারণে অন্য জন সমষ্টি থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে মনে করে, তখন তারা রাজনৈতিক ভাবে একটা জাতিতে পরিণত হয়। জাতি যখন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে লিপ্ত হয়, তখন জাতি জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়"[১৯৯]।

জাতীয়তাবাদ প্রত্যয়টির সঠিক অনুধাবন করতে হলে জাতি, জাতিত্ব ও জাতীয়তাবোধ এ তিনটি শব্দের অর্থ বিশেষণ প্রয়োজন।

জাতি : জাতি হচ্ছে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত সেই করপোরেট সোসাইটি বা জনগোষ্ঠী, যার ভৌগলিক সীমারখো দ্বারা চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট টেরিটরি বা আবাস ভূমির বাসিন্দা[২০০]। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **জন স্টুয়াটং মিল** এর

---

[১৯৭] প্রাগুক্ত

[১৯৮] মূসা, আহমেদ সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ , আমিনুর রহগমান সরকার প্রবন্ধ, দিব্য প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি২০১৪, পৃষ্ঠা-২১৯।

[১৯৯] বাংলাদেশের সংবিধান । বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

[২০০] মূসা, আহমেদ সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ : বাংলাদেশী না বাঙ্গালী , রুহুল আমিন এর প্রবন্ধ, দিব্য প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৩৪।

মতে এক সঙ্গে বসবাসকারী একদল লোক যদি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং এক অন্যের কল্যাণে কামনা করে, যা তারা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য করে না, তারা নিজেদের লোক দ্বারা গঠিত সরকার কর্তৃক শাসিত হয় এবং স্বেচ্ছায় এই সরকারের অধীনে বাস করতে সম্মত হয় তবে তাদের নিয়ে গঠিত হয় একটি জাতি[২০১]।

জাতিত্ব : জাতি যে সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুণের অধিকারী, সেগুলোর সমাহারকে বলা হয় জাতিত্ব। জাতিত্ব হচ্ছে গুনবাচক রূপ। জাতি এবং জাতিত্বের মধ্যে কোনো মনস্তত্ত্বিক প্রেষণা সংযুক্ত নেই[২০২]।

জাতীতাবোধ: জাতীয়তাবোধ একটি মনস্তত্ত্বিক প্রেষণাযুক্ত প্রত্যয়। একটি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে জন্য জাতীয়তাবোধ খুব দরকার। পরিকল্পনা করে অল্পদিনে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা যায় না তবে যত্ন সহকারে লালন-পালনের দ্বারা এর বিকাশসাধন করা সম্ভব। জাতীয়তাবোধ থেকেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।[২০৩]।

জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায় একটি রাষ্ট্র সীমায় বসবাসকারী ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জনসত্তা, নির্বিশেষে একজন ব্যক্তির আবেগ, আকাঙ্খা, আত্ম-উপলবদ্ধি, একাত্মবোধ, ঐক্যবোধ, সংহতিবোধ ইত্যাদি।

১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার দশ মাসের মধ্যে রচিত হয় এর সংবিধান । বাংলদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ৮-২৫) রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু মূলনীতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি[২০৪]। এর একটি হলো 'জাতীয়তাবাদ'।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের (অনুচ্ছেদ ৯) বলা হয় ' ভাষা ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। অর্থ্যৎ আমাদের জাতীয়তাবাদ হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের পর তৎকালীন সামরিক শাসক জেনালে জিয়াউর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে নতুন মতাদর্শ প্রবর্তন করেন।[২০৫] তবে

---

[২০১] মূসা, আহমেদ সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, কেন বাংলাদেশী কেন বাঙালী নই, শেখ নূরুল ইসলামএর প্রবন্ধ, দিব্য প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৩৪।

[২০২] প্রাগুক্ত।

[২০৩] প্রাগুক্ত।

[২০৪] The Constitution of the People's Republic of Bangladesh 1972 (Part 11).

[২০৫] সংবাদ, ৫ মে, ১৯৭৮।

বিএনপি কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সভায় তার বক্তৃতা থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটা স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ হচ্ছে, আমরা বাংলাদেশী। আমাদের পৃথক ইতিহাস রয়েছে। আমাদের দেশ এক ভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পৃথক। আমাদের ভাষা পৃথক, আমরা তাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলছি, আমরা তাকে আধুনিক করছি। আমাদের পৃথক সাহিত্য ও কবিতা রয়েছে। আমাদের পৃথক শিল্প ও চিন্তাধারা রয়েছে। আমাদের ভৌগলিক অবস্থান পৃথক আমাদের নদী ও ভূমি পৃথক, আমাদের জনগণ পৃথক। আমরা সম্পূর্ন স্বাধীন ও সার্বভৌম।....... আজ আমাদের ও জনগণের মধ্যে এক চেতনা গড়ে উঠেছে, যে চেতনা আমাদের প্রতিবেশী দেশ ও এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জনগণের থেকে ভিন্ন[২০৬]।

ধর্মকেও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জিয়া ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করে সংবিধানে ইসলামী রঙ দেন। তিনি বিসমিলাহির রহমানির রাহিম বলে তার বক্তৃতা শুরু করতেন এবং বিএনপি ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাংলাদেশ সংবিধানের প্রারম্ভে এই শব্দগুচ্ছ উৎকীর্ণ করেন।এভাবে তিনি ইসলামী আচার ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভের প্রয়াস পান। তিনি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করতে চান। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ কিছুই নয়। .... আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলাম আমাদের সামজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করে[২০৭]। জিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী সহনশীলতা ও উদারতাবাদকে তুলে ধরেন। বিএনপির ঘোষণাপত্রে বলা হয়:

ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মপ্রিয়তা বাংলাদেশী জাতির এক মহান ও চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য ।.... বাংলাদেশী জনগণের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই বাস্তব সত্য (এবং ইসলামের) সুষ্ঠ ও উদার বৈশিষ্ট্য জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ইসলামের মহান শিক্ষাকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করে তাকে জাতীয় জীবনের মূলে সংহত করতে সমর্থ হওয়ায় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী উগ্রসাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পরেছে[২০৮]।

---

[২০৬] সংবাদ, ৫ নভেম্বর, ১৯৭৮।
[২০৭] সংবাদ, ৫ এপ্রিল , ১৯৭৮।
[২০৮] প্রাগুক্ত।

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগত ভাবে নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পরেও সে পরিচয় অক্ষুন্ন ছিল। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীসমূহ বাঙালি পরিচয় পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী বলেন:

"নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশী হতে পারি, কিন্তু জাতীয়তার বিবেচনায় আমরা বাঙালি।..... আমাদের ভুললে চলবে না যে, বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয় বাঙালি। এই পরিচয় শতশত বছরের । পাকিস্তান আমলে শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই পরিচয় মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না"[২০৯] ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (বর্তমান ওয়ার্কার্কর্স পার্টি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), জাতীয় জনতা পার্টি (ওসমানী), ন্যাপ প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকরী ইসলামপন্থী দলগুলো পুনরুজ্জীবন, বিএনপি দল ও প্রশাসনে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের পুনর্বাসন, পাকিস্তানের প্রতি তার নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, পাকিস্তানের অনুকরণে অ-বাংলা শব্দ ও শোগান প্রচলন, ইত্যাদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও আদর্শের পরিপন্থী পাকিস্তানবাদী ষড়যন্ত্র বলে মনে করে[২১০] । বুদ্ধিজীবিদের বৃহত্তর ও প্রভাবশালী অংশ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা অগ্রাহ্য করেন এবং তাদের লেখা ও বক্তৃতায় জাতিকে বাঙালি বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন[২১১] ।

কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, পার্বত্য এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে জাতীয় মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশী নাম করণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, ভুমি , খিংয়াং, মুরাং ও চাক নামে বিভিন্ন উপজাতির বাস। তারা একক ও বিচিত্র সংস্কৃতির অধিকারী পৃথক সত্তা হিসেবে সচেতন[২১২] । যদিও প্রতিটি উপজাতির পৃথক ভাষা রয়েছে চাকমা ও মগ ছাড়া অন্যান্যেরা লিখিত সাহিত্য নেই। কিন্তু তারা নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে নারাজ। চাকমা নেতা মানবেন্দ্র লারমা (১৯৭৩সালে নির্বাচিত সংসদ সদস্য) দাবি করেন, আমি একজন চাকমা, আমি বাঙালী নই। আমি বাংলাদেশের নাগরিক - বাংলাদেশী। আপনিও বাংলাদেশী , এবং আপনার জাতি সত্তার পরিচয় বাঙালি। উপজাতিরা বাঙালি হয়ে গেছে এ কথা কেউ জোর গলায় বললেই তারা বাঙালি হয়ে যাবে না[২১৩] । তিনি উপজাতীয়দের জন্য আঞ্চলিক

---

[২০৯] সংবাদ, ৫ এপ্রিল , ১৯৭৮।
[২১০]Abul Fazal Huq, ' Contemoporary Politics and the radical left in bangladesh' The journal of the institute of bangladesh studies, vol. 111, 1978.
[২১১] মামুদ শাহ কোরাইশী (সম্পাদক), ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি (রাজশাহী ১৯৭৯), পৃষ্ঠা ১-৪৩।
[২১২]A Sattar, Tribal Culture in Bangladesh (Dhaka, 1975), P-2.
[২১৩] জাতীয় সংসদ, বির্তক, খন্ড ১, সংখ্যা ৬ (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা ২৯২।

স্বায়ত্তশাসনে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির ওপর উপজাতীয়দের একচেটিয়া অধিকার দাবি করেন[২১৪]। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যান্য এলাকার মতো বাংলাদেশর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করেন এবং উপজাতীয়দের পৃথক জাতি সত্তা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রপতি জিয়াও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করলেও উপজাতীয়দের পৃথক জাতি সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি[২১৫]। অবশ্য জিয়া বাঙালী শব্দটি সংবিধান থেকে বাদ দেয়ায় ডানপন্থী মহল এতে বিশেষ প্রীত হয়। কারণ তাদের বিবেচনায় বাংলাদেশী শব্দটি ছিল বেশী ইসলাম ভাবাপন্ন[২১৬]।

বাংলাদেশের সীমানায় বসবাসকারী সকলে একই নাগরিত্বের পরিচয়ে আবদ্ধ করার লক্ষেই জিয়া নাগরিকত্বের সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত ও ব্যাপকভিত্তিক করতে চেয়েছিলেন। সীমান্তগত পরিচিতির চাইতে জাতি সত্তাগত পরিচিতিটি অনেক সংকীর্ণ[২১৭]। দেশের ভৌগলিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিবেচনায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত জিয়ার ধারণা দেশের সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। জাতীয়তাবাদ এই নয়া ভবধারায় অনুপ্রাণিত করে তিনি জনগণকে তার জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহে অংশ গ্রহণে উদ্বদ্ধ করতে সক্ষম হন। শাসন পরিচালনার শেষ দিনটি পর্যন্ত জিয়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে তার রাজনৈতিক দর্শনের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করেছেন যদিও নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক জীবনে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে নানাবিধ বিতর্কের এবং রক্তক্ষীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত জাতীয় ঐক্যমত্যের ওপর সৃষ্টি করেছে ভাঙনের হুমকি[২১৮]

[২১৪] গণপরিষদ, বিতর্ক , কন্ড ২, সংখ্যা ৯ (২৫ অক্টোবর, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৬।

[২১৫] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশর রাজনৈতক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০১৪।

[২১৬] আহমদ. মওদুদ, গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ পেক্ষাপট : বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামিরক শাসন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথমপ্রকাশ-২০০০, পৃষ্ঠা-৫৮।

[২১৭] প্রাগুক্ত

[২১৮] প্রাগুক্ত

৮.২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছবি ও ছবির রাজনীতি

দেশের অফিস-আদালতে জাতির জনকের ছবি টাঙানো থাকবে এটাই স্বাভাবিক বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অংশ। অনেক দেশেই এ রীতি প্রচলিত আছে। সেসব দেশে অবশ্য জাতির পিতা নিয়ে বিতর্কও নেই। বাংলাদেশে বিতর্ক রয়েছে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলে মানতে চান না অনেকেই। তাদের একটি অংশ আবার জাতির পিতা কনসেপ্ট নিয়েই প্রশ্ন তোলেন।

এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে নির্বাহী আদেশ এবং পরবর্তিতে আইন করে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অফিস আদালতে টাঙিয়ে ছিল। চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাস পর আর একটি আইন পাস করে ওই ছবি নামানোর। গত ২১ মার্চ জাতীয় সংসদে জাতির জনকের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ (রহিত করণ) বিল ২০০২ পাস হয়। এর মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিবের ছবি প্রদর্শন ও সংরক্ষণের যে বাধ্যবাধকতা ছিল, তার আর থাকল না। রাষ্ট্রপতি সম্মতিতে এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলা হয়। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে একটি প্রস্তাব রেখেছেন যাতে ভবিষ্যতে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের ছবি প্রদর্শনের কথা উলেখ করেন। কিন্তু এ প্রস্তাব আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, কাজেই এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ হরতাল আহ্বান করে। কী দুর্ভাগ্য এ জাতির ছবি প্রদর্শনের জন্য আইন পাস করতে হয়। আবার সেই ছবি নামানোর জন্যও আইন পাস করতে হয়। জার্মানিতে ইউরো চালু হওয়ার আগে তাদের জাতীয় কারেন্সিতে জাতীয় নেতাদের ছবি ছিল। সেখানে জাতীয় নেতাদের ছবি প্রদর্শন করা হয়। এ জন্য সেখানে কোনো আইন প্রণয়ন করতে হয়নি। ছবি প্রদর্শন বা কারেন্সিতে ছবি থাকার বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনো দিন আপত্তি করে না। যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে সেখানে ১০০ ডলারের নোটে রয়েছে ফ্রাঙ্কলিনের প্রতিকৃতি, ২০ ডলারের নোটে রয়েছে জ্যাকসনের ছবি। আর ১ ডলারের নোটে রয়েছে জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি। সবাই জানেন জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৭৮৯-১৭৯৭) আর ফ্রাঙ্কলিন ও জ্যাকসন ছিলেন জাতীয় বীর। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদান জাতি যুগ যুগ ধরে স্মরণ করছে। ফ্রাঙ্কলিন কখনো প্রেসিডেন্ট হননি। কিন্তু জাতি তাকে সম্মান

দিয়েছে। পাশের দেশ থাইল্যান্ডের জাতীয় কারেন্সীতেও রয়েছে রাজা ভূমিবলের ছবি। পাকিস্তানের স্বপ্নদষ্টা ছিলেন কবি ইকবাল পাকিস্তানের রূপরেখা প্রথম দিয়েছিলেন রহমত উলাহ। পাকিস্তানের দাবি জাতীয় লাহোর প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। কিন্তু সকল দাবি, প্রস্তাব, স্বপ্ন ও ধারণা বাস্তবায়িত করেছিলেন জিন্নাহ। তাই তিনি জাতির পিতা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন[২১৯]। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় নেতাদের সম্মান জানানো হয়। সেই সম্মান জানানোর জন্য সেসব দেশে কোনো আইন প্রণয়ন করার দরকার হয়না। জাতীয় নেতার সম্মানের পর তারা রাজনীতির উর্ধ্বে। এদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে খেটে খাওয়া কৃষক-মজুরদের জন্য মাওলানা ভাসানী আজীবন কাজ করে গেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি তিনি কোনো দিন করেননি। তার রাজনীতিতে বৈপরীত্য ছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তার অবদানকে কি ছোট করা যাবে?[২২০] শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে লাহোর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এছাড়া নানা উলেখযোগ্য কর্মকান্ড তার রয়েছে। সোহরাওয়ার্দীকে বলা হয় গণতন্ত্রের মানসপুত্র। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে আমরা এখন ধারণ করছি। এরা সবাই আমাদের জাতীয় নেতা। আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। শেখ মুজিবের অবদান কি কম? এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তার নেতৃত্ব ও অবদানকে কি অস্বীকার করা যাবে? ঠিক তেমনি অস্বীকার করা যাবে না জিয়াউর রহমানের নাম। তিনি একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন বটে, কিন্তু তাকে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে গণ্য করা হলে ভুল হবে। স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন এবং জাতীয় সংহতি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্ব যেখানে একুশ শতক নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, আমরা সেখানে ছবি টাঙানোর প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনীতি করছি। এতে লাভ হচ্ছে কার? ছবি নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে আমরা পিছিয়ে পড়ছি দিন দিন।[২২১]

ইতিপূর্বের বিএনপি সরকারের (১৯৯১-৯৬) সময় শেখ মুজিবের জন্ম বা মৃত্যু দিবসে সরকারি রেডিও টিভিতে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। এ কাজটিকে সমর্থন করা যায় না। কারণ অন্য নেতাদের বেলায় যেখানে প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান, আলোচনা হয়েছে, সেখানে মুজিবের বেলায় ব্যতিক্রম কেন? বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুজিবের স্থান কি এতই হালকা যে তাঁর জন্য বিশেষ দিনে সরকারি প্রচার যন্ত্রে আধঘণ্ট এক ঘণ্টা সময়ও ব্যয় করা যাবে না? জোট সরকারকে এক্ষেত্রে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, মুজিবকে সম্মান দিলে অবশ্যই অন্য নেতাদের সম্মান কমে যাবে না। এ বরং মুজিবকে সম্মান দিলে জোট সরকারের গণগ্রহণ যোগ্যতা আরো প্রসারিত হবে। তবে কাউকে সম্মান দেয়ার নামে, আবার তার

---

২১৯ এবিএম মূসা, কলাম, ছবি ওঠানো আর নামানো নিয়ে কেন এই বিভ্রান্তি, ২৮ মার্চ, ২০০২, পৃ: ৬।

২২০ ড. তারেক শামসুর রহমান, কলাম, ছবির রাজনীতি আর রাজনীতির ছবি, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ এপ্রিল, ২০০২, পৃ: ৫।

২২১ প্রাগুক্ত।

নামে নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে জনগণকে বিরক্ত করাও বিবেচনা প্রসূত নয়। তৎকালিন হাসিনা সরকার মুজিবকে দিয়ে সরকারি টেলিভিশনে যে বাড়াবাড়ি করেছিল তাতে দলমত নির্বিশেষে অনেক দর্শক শ্রোতাই বিরক্ত হয়েছিলেন।[২২২]

বস্তুত জোট সরকারের গত কয়েক মাসের শাসনে কোথাও শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সমস্যার সৃষ্টি করেনি। অপরাধ কমেছে কিন্তু খুন বাড়ছে বলে যে স্ববিরোধী উক্তি জাতিকে শুনতে হয়েছে তার কারণ হিসেবেও তার প্রতিকৃতি কাজ করেছে বলে মনে হয় না। আমাদের সরকারগুলো প্রায়শই অগ্রাধিকার তালিকা সাজাতে ভুল করেন। জোট সরকারের এখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমন ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার কাজে হাত দেয়া উচিত ছিল। অন্য বিষয়গুলো পরে আসতে পারে অথচ শেখ মুজিবের ছবি সরানোর মতো একটি গুরুত্ববিহীন কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ে হাত দিয়ে জোট সরকার একটি রাজনৈতিক অবিবেচনা প্রসূত কাজ করেছে বলে আমার মনে হয়। কারণ অযথা ঝামেলা বাড়ানোতে সরকারের বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।[২২৩]

আসুন আমরা সবাই আমাদের সকল প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কাছে তাদের গঠনমুখী ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরি। প্রয়াত নেতাদের সম্মান ও অসম্মান করার অশুভ প্রতিযোগিতা থেকে তাদের যথাসম্ভব দূরে রাখি এবং পাঠ্য পুস্তক ও ইতিহাসে নেতাদের অবদানকে সততার সঙ্গে উপস্থাপন করি এবং তাদের এক একটি ব্যক্তি না ভেবে, প্রতিষ্ঠান ভেবে তাদের কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং সেই শিক্ষা থেকে নিজেদের আলোকিত করি এবং কল্যাণ ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাই।

---

[২২২] ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, কলাম, নেতাদের ছবি দেয়ালে, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মার্চ, ২০০২ ইং, পৃ: ৫।
[২২৩] মোহিত উল আলম, কালাম, বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ, ২০০২, পৃ: ৫।

৮.৩ সরকারি দল ও বিরোধী দল ঃ পারস্পরিক দোষারোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা থাকে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে অবশ্য রয়েছে নিচক বৈরিতা। গণতন্ত্রে বহু রাজনৈতিক দল থাকে, বাংলাদেশে কিন্তু রয়েছে বহুদলীয় টানাপোরেড়নে নিশ্ছিদ্র সংঘাত এবং সন্ত্রাস । গনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের, সামজের, জাতির সবারই। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলো শুধু ক্ষমতাসীনদের। এ ক্ষমতায় অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। অন্য কেউ এর অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি তার আশপাশেও কেউ আসতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাংলাদেশে বন্ধী থাকে ক্ষমতাসীনদের তৈরী করা সংকীর্ণ, শক্ত দেয়াল ঘেরা, শত প্রহরায় আবদ্ধ দুর্গে। এই দুর্গের পাহারায় থাকেন শুধু দলীয় নেতাকর্মিরাই নন, দলীয় নেতৃত্বের অধীনে সযত্নে কো-অপট করা রাষ্ট্রীয় কৃত্যকরাও। বাংলাদেশ সফরে এসে বিল ক্লিনটন বলেছিলেন যে, বালাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে যতো কম বলা যায় ততই ভালো [২২৪]। বিল ক্লিনটন আরো বলেন- “বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে উত্তপ্ত তা বোঝা যায়। আমার ধারণা, এই পরিস্থিতি শান্ত হবে”। তিনি বলেন “ আমার নিজের দেশেও বিরোধী শক্তি রয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটু ভিন্ন”। ভিন্ন তো বটেই। বিল ক্লিনটন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষ মণি তা বাংলাদেশর সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে একটু ভিন্ন বটে। কিন্তু তা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক[২২৫]।

২৫ জুন ১৯৯৯ সালের প্রথম আলোয় “সংসদে অসভ্যতা ” শিরোনামে একটি সম্পদকীয় প্রকাশ হয়েছিল, এই শিরোনামের নীচে ছোট করে ছিল “ সাংসদদের মধ্যে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকও আছেন”[২২৬]। এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়, সংসদের কার্য-উপদেষ্ঠা কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সরকার ও বিরোধী দল কেউ কারও বিরুদ্ধে অশীল শব্দ প্রয়োগ করবেন না। এমনকি স্পিকারও সংসদে অশালীন বক্তব্যের ব্যাপারে রুলিং দিয়ে

[২২৪] আহমদ, ড. এমাজউদদীন, বাংলাদেশ : সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতি প্রকৃতি, হাসি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ -সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা- ৮৫।
[২২৫] প্রাগুক্ত।
[২২৬] ২৫ জুন ১৯৯৯ সালের প্রথম আলো, সম্পাদকীয়।

বলেছিলেন, আপত্তিকর বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ (বাদ দেওয়া হবে) করা হবে।[২২৭] এত কিছুর পরও গভীর হতাশা নিয়ে লক্ষ্য করা গেছে- সংসদে অসভ্যতা এতটুকুও কমেনি। বাজেট অধিবেশেনে প্রায় সব বৈঠকেই সাংসদেরা সাধারণ বক্তৃতাকালে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধা বানাম রাজাকার,, পঁচাত্তরের পর সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্র, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে অতীতাশ্রয়ী পরস্পর বিরোধী অপ্রাসঙ্গিক বহু বক্তব্য বা মন্তব্য করেছেন। তবে এসব গালাগালিতে কোন দল এগিয়ে রয়েছে সরকারী দল না বিরোধী দল, সে হিসেব মেলানো কঠিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ঈঙ্গিত করে বিএনপির এক সাংসদ বলেন- "একাত্তর সালে তারা ইয়াহিয়ার পরিবার থেকে ভাতা নিয়েছেন"[২২৮]। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন-"অনেকের স্বামীর পরিচয় ও সংসার করার অধিকারও আমার বাবা করে দেওয়া"। তিনি আরো বলেন রূঢ় সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করবেন না , ক্যান্টনমেন্টে কে কোথায় ছিলেন এবং কার সঙ্গে মেলামেশা করতেন , তা বলতে চাই না [২২৯]। হাসিনা সরকারের ভূমিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফ সংসদে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় লোক পাঠানো সত্বেও বেগম খালেদা জিয়া ভারতে না গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিলেন[২৩০]। এ ধরনের বক্তব্য সংসদ ছাড়াও বহু জন সমাবেশেও দিয়ে থাকেন। বিরোধীদলীয় নেতারাও সরকার দলীয়দের ছেড়ে দেন নি। যেমন তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদের প্রসঙ্গ এনে বিরোধী সাংসদগণ অরুচিকর মন্তব্য দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সম্পর্কে বলেছেনে মদ খেয়ে মাতলামি করে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিলেন[২৩১]। বিরোধীদলীয় নেত্রীর পুত্র তারেক ব্যাংক ডাকাত, ঋণখেলাপী এবং আরো বলা হয়েছে তারেক মদ খেয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন[২৩২]। বেগম খালেদা জিয়া যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন নয় জন বিউটিশিয়ান নিয়ে এই ধরনের পাগলের প্রলাবের মত বক্তব্য দিতেও দিধাবোধ করেননি[২৩৩]।

জাতীয় সংসদ ছাড়াও সরকার ও বিরোধী দলের মাঠে ময়দানের চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়, এক দলের সভা অন্যদল পন্ড করে দেবে । বিশেষতঃ সরকারী দল চাইবেই সরকারী ক্ষমতা, প্রশাসন ও মাসলম্যান লাগিয়ে

[২২৭] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ অমর একুশ বই মেলা-২০১৪, পৃষ্ঠা-৬৩
[২২৮] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ অমর একুশ বই মেলা-২০১৪, পৃষ্ঠা-৬৪।
[২২৯] প্রাগুক্ত।
[২৩০] প্রাগুক্ত।
[২৩১] প্রাগুক্ত।
[২৩২] প্রাগুক্ত।
[২৩৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বিরোধী দলের সভা সমাবেশ মিছিল ইত্যাদি পন্ড করে দিতে, তাদের ওপর জোর জুলুম চাপিয়ে দিতে। বিরোধী দলও সর্বাত্মক চক্রান্ত চালাবেই ক্ষমতাসীন সরকারকে মেয়াদ পূর্তির আগেই উৎখাত করে দিতে।[২৩৪]

সরকার ও বিরোধী দলের এই পরস্পর দোষারোপের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এখনো সুস্থ স্বাভাবিক রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে উঠেনি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একে অন্যকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে বরং চির শত্রু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত।[২৩৫]

ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন (২০০২) নিয়ে তৎকালীন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এবং চার দলের মেয়র প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকার মধ্যে চলেছে বাগযুদ্ধ। মোহাম্মদ হানিফ পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, তিনি মেয়র নির্বাচনে অংশ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন এজন্য সরকারকে ৪টি শর্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তা পূরণ করেনি। হানিফ চ্যালেঞ্জ করেন যে, যদি জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের ইচ্ছা থাকে তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন কমিশনারের অধীনে নির্বাচন দিলে তিনি মেয়র নির্বাচনে অংশ নেবেন। মেয়র হানিফ প্রশ্ন তোলেন যে, আদৌ খোকা সুস্থ রাজনীতি চান কি? এ প্রেক্ষিতে সাদেক হোসেন খোকা পুরান ঢাকার কয়েকটি নির্বাচনী জমায়েতে বলেছিলেন, মেয়র সাহেব কি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? তারা জানে যে, তারা যে অপকর্ম করছে তাতে নির্বাচনে দাঁড়ালে পরাজয় নিশ্চিত। এ কারণে এখন জাতির সামনে নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছেন। সাদেক হোসেন খোকার পক্ষে চার দলের নির্বাচন পরিচালনা আহ্বায়ক কমিটির নেতা ও বিএনপির নগর সম্পাদক আব্দুস সালাম এক বিবৃতিতে বলেছেন, ঢাকার ব্যর্থ মেয়র হানিফ তথাকথিত শর্ত হাজির করে দেউলিয়াত্ব আবার প্রকাশ করেছেন। তার হঠকারীপূর্ণ বক্তব্য হাস্যকর। তিনি বলেন, মেয়র হানিফ তার চরম ভরাডুবির ভয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেননি। এখন মুখ রক্ষার জন্য আবোল-তাবোল বকছেন।[২৩৬]

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে ফিরে গত ৯ মার্চ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বিরোধী দল সরকারকে অস্থিতিশীল ও আকার্যকর করতে পরিকল্পিত ভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। এ জন্য সন্ত্রাস দমনে নতুন আইন তৈরির কথাও তিনি জানিয়েছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের ত্বড়িত জবাব দিয়ে পরদিন ১০ মার্চ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন,

[২৩৪] রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, অফসার ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭৩।
[২৩৫] রশিদ, ড. হারুন-অর, বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্তিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন প্রথম প্রকাশ- ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠ-৩২০।
[২৩৬] আনোয়ার আলদীন, হানিফ ও বোকার মধ্যে চলছে বাগযুদ্ধ, দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ৪, ২০০২, পৃঃ ১।

প্রধানমন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা আড়াল করতে সব দায়দায়িত্ব বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। তিনি দেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য বিএনপি এবং তার অঙ্গসংগঠন গুলোকে দায়ী করেছেন।[২৩৭]

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য সম্মেলন (০৩/০৩/২০০২ ইং) বলেছেন, বর্তমান বিএনপি, জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে অত্যাচার, নির্যাতন, সন্ত্রাস, হত্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। সন্ত্রাস এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে বিদেশী দাতা সংস্থাগুলো সন্ত্রাসের কারণে সাহায্য দিতে চাইছেন না। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে একটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর কাছে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[২৩৮]

পাশাপাশি একই সময়ে (০৩/০৩/২০০২ইং) এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদকে জানান, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে দেশে সন্ত্রাস ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে তাঁরা পরাজিত হয়ে এখন নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে অপপ্রচার করছে। পত্রপত্রিকা এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমেও তারা এসব করছে। বাংলাদেশ ‘মৌলবাদ’ কিংবা ‘তালেবান’ রাষ্ট্র, তাদের এসব অপপ্রচার বিদেশীরা বিশ্বাস করছে না। বিদেশীরা বাংলাদেশ ‘মুসলিম মডারেট’ দেশ হিসেবে জানে, তিনি বলেন, ওয়েব সাইটে এবং পত্রিকার অপপ্রচার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ করা হয়েছে। আর যারা সরকার ও দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।[২৩৯] আমরা একটু পেছন ফিরে দেখতে পারি, ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রায় এক মাসের মধ্যেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, একটি বিশেষ মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশে আইন শৃঙ্খলা বিনষ্টের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা করছে[২৪০]। এ কথা বলার এক মাস পর শেখ হাসিনা আবার বলেন, বিএনপি প্রথম দিন হতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে দেশবাসীকে জিম্মি করে রাখতে চায়[২৪১]। এবার আমরা খুঁজে দেখতে পারি তখন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কী বলেছিলেন। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের দু’মাস পর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দেশব্যাপী চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। রক্ষীবাহিনীর কায়দায় বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করছে

---

[২৩৭] মতিউর রহমান কলাম, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার এই পারস্পরিক দোষারোপ আর কত দিন, দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৩, ২০০২, পৃঃ ১।
[২৩৮] ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য সম্মেলনে শেখ হাসিনা, দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ১৩, ২০০২, পৃঃ নং- ১।
[২৩৯] প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, যারা দেশে বিদেশে নির্বঅচিত সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে তাদের শাস্তি পেতে হবে, ইত্তেফাক রিপোর্ট, মার্চ ৪, ২০০২, পৃঃ ১।
[২৪০] ০৯/০৭/৯৬, দৈনিক ইত্তেফাক।
[২৪১] ১৩-০৮-৯৬, দৈনিক ইত্তেফাক।

তারা (২৫-০৮-৯৬, সংবাদ)। এ রকম উত্তরের তিন দিন পরই তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম জিয়া এক সংবাদ সম্মেলনে আবার বলেছেন, 'দেশব্যাপী যে নির্যাতন নিপীড়ন, রাহাজানি, পুলিশ প্রশাসন দলীয় করণসহ যা চলছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, তারা পুনরায় একদলীয় বাকশাল কয়েমের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে (২৮.০৮.৯৬, ইত্তেফাক)।[২৪২]

বাংলাদেশ খুব কম রাজনৈতিক নেতাকে বিরোধীদলের প্রতি, বিরোধী দলের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে দেখা গেছে। সরকারের বিরোধীতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরোধীতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এমন কি বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গের দেশপ্রেমের প্রতিও সন্দেহ পোষন করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, এখানে বিরোধতা সহ্য করা হয় না। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে অত্যাচারিত হয়েও যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তিনিও বিরোধীতা সহ্য করেননি। সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ক্ষমতাসীন দল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সরকারে অধিষ্ঠিত দল সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধী দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে উদ্যত হয়। নিজেদের মূল্যবান সময় এবং সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়োজিত হয় বিরোধী দলের অতীতকে কালিমা লিপ্ত করতে এবং তাদের বর্তমানকে বিশৃঙ্খলার আবরণে আচ্ছাদিত করতে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমকে দলীয় মাধ্যমে রুপান্তরিত করে। সরকাররের এ মনোভাব সমগ্র সমাজব্যাপী সৃষ্টি করে এক অসহনীয় অবস্থা। কোন গত্যন্তর না দেখে বিরোধীদল প্রতিবাদের নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিত্যাগ করে নেমে আসে রাজপথে। ফলে নেসে আসে হাজারো ধারায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সামাজিক জীবন হয়ে উঠে অনিশ্চিত। জ্বালাও-পোড়াও মনোভাব শক্তিশালী হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থা শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়[২৪৩]।

পরিশেষে বলতে হয়, কঠিন বাস্তবতাকে আড়াল করে প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা যতই নিজের দায়িত্ব এড়াতে চাই না যেন, তাতে কোনো লাভ নেই। বর্তমানের সাধারণ মানুষ অনেক সচেতন। তারা সত্যকে ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ '৯৬ এবং ২০০১ সালের জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা থেকে বিএনপি নেতৃত্ব বা বিএনপির ব্যর্থতাকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কোনো শিক্ষা নিয়েছে বলে এখনো মনে হয় না, কারণ তাদের পথ চলার ধরণ একই রকম । এসবের পরিণতি কোনো সরকারের জন্যই শুভ হবে না। কারণ দেশের সাধারণ মানুষ সরকার এবং

---

[২৪২] মতিউর রহমান, মন্তব্য প্রতিবেদন, কলাম, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার এই পারস্পরিক দোষারোপ আর কত দিন, দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৩, ২০০২, পৃঃ ১।

[২৪৩] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সংকট, শিকড়,প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩১।

বিরোধী দলের এই পারস্পরিক দোষারোপের রাজনীতি আর দেখতে চায় না। তারা এই পারস্পরিক দোষারোপের রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি অবসান চায়, এ থেকে মুক্তি চায়। চায় শক্তি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ।

৮.৪ আইন শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জন্ম এক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র -গোলাবারুদ সমর্পণ করলেও অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র সমাজ বিরোধীদের হাতে থেকে যায়[২৪৪]। তাছাড়া ওই সময়ে অনেক বামপন্থী দল ছিল, যারা সশস্ত্র বিপবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহিংস তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলদেশে আইন-শৃঙ্খলা অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অপর্যাপ্ততা ও দুর্বলতার কারণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় রক্ষী বাহিনী নামে একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও তাদের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা ঘটে[২৪৫]।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে প্রথম দিকে সামরিক আইনের কড়াকড়ি কারণে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও পরবর্তীতে খুন, রাহাজানি, চাঁদাবাজি ও সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। এরশাদের আমলে পুলিশের নিকট নিবন্ধনকৃত অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেলেও রাজনেতিক অস্থিরতা নাগরিকদের

[২৪৪] হক, ড. আবুল ফজল , বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪০৭।
[২৪৫] Moudud Ahmed, Era of Sheikh Mujibur Rahman (Dhaka, 1973), Chapter 3.

জীবনযাপন দারুণভাবে ব্যাহত করে। ঘন ঘন হরতাল, বিক্ষোভ, ঘেরাও আর্থসাামিজক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছরে ৫৯টি হরতাল পালিত হয়। তাতে জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ১৪,৭৫০ কোটি টাকা। বিরোধী দল ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০০ ব্যক্তি নিহত হন। ১৯৮৮ সালের প্রথম ৯ মাসে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগলোর মধ্যে অথবা ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে প্রায় ২০০টি সংঘর্ষ ঘটে, যার ফলে কমপক্ষে ৬০ জন ছাত্র নিহিত ও ৬০০ আহত হয়[২৪৬]।

বেগম খালেদা জিয়া প্রথম সরকারের শেষ বছরের ১৯৯৫ সালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে এক নিবন্ধে বলা হয় ১৯৯৫ এর জানুয়ারি-অক্টোবর সময়কালে পাঁচ হাজারের বেশি সহিংসতা ও ৬০ হাজারের মতো অপরাধের ঘটনা ঘটে। যা ছিল স্বাধীনতার পর যেকোন বছরের তুলনায় বেশী। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪০০ নারী ও শিশু বাংলাদেশ থেকে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হতো। কারণ সন্ত্রাস দমনে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে[২৪৭]।

১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা সন্ত্রাসকে দেশের এক নম্বর সমস্যা বলে উলেখ করেন। কিন্তু তার শাসনামলে এ সমস্যা সমাধানের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। বরং তার সরকারের শেষ বছরে আইন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ২০০০ সালের বাংলাদেশ সম্পর্কে এক নিবন্ধে বলা হয়, সারা বছর ধরে জনগণ এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগ ও ভীতির ব্যাপার ছিল দেশে অরাজক অবস্থা। বিগত ৪ বছরের প্রায় ১৫০০ হত্যাকান্ড সংঘঠিত হয়। ২০০০ সালে ৬১৭ জন নারী নিগৃহীত ১৬১ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হন। ঢাকা ও বিভিন্ন শহরাঞ্চলে চাঁদাবজির ঘটনা বৃদ্ধি পায়। দোকান মালিক ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্থানীয় ভাবে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলেন[২৪৮]।

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে সন্ত্রাস কে অন্যতম প্রধান ইস্যূ হিসেবে উলেখ করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বাধীন ৪ দলী জোট সরকারের শাসনামলে সন্ত্রাস সব চেয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ শাসনামলে তিনি বলেন, এই সরকারের পদত্যাগের পর আওয়ামী লীগ নেতাদের গণ ধোলাই দেয়া হবে। বিএনপি ক্যাডাররা নেত্রীর কথা রেখেছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষ ১৬ জুলাই, ২০০১ তত্ত্ববধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই তারা ধোলাই কার্যক্রম শুরু করে। সরকারি হিসাব অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ৪৭ দিনে সারা দেশে ৫০৩ জন খুন হয়।

---

[২৪৬]Holiday,, 21 Ocyober,1988.

[২৪৭]Golam Hossain, æBangladesh in 1995 : Politics of Intransigens" Asian survey, vol:36, No:2,(February 1996), p: 196-203.

[২৪৮]M Rasiduzzaman, 'Bangladesh in 2000 : Searching for Better Governance" , Asian Survey, Vol. 31 No. 1 (January- February , 2001) p: 122-130

বেসরকারি হিসাব মতে তত্ত্বাধায়ক সরকারের প্রথম ৯০ দিনে দেশে প্রায় ৮০০ খুন এবং দশ হাজার ব্যক্তি আহত হয়। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এর ভোট ব্যাংক বলে কথিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন নেমে আসে। অগ্নি সংযোগ, ভাংচুর , লুটপাট, মারধর,দখলবাজি ও চাঁদাবাজি চলে প্রকাশ্যে[২৪৯]। ইউরোপীয় কমিশন ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের অধীকার সুরক্ষার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি আহবান জানায়। ২০০৯ সালের ৬ মে হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামক এক মানবাধিকার সংগঠনের রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কথিত নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন[২৫০]।

পুলিশ সন্ত্রাসী আতাত গড়ে ওঠে। একজন চাঁদাবাজ খোলাখুলি বলে পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই। তাদেরকেও চাঁদার ভাগ দেওয়া হয়। ব্যবসয়ীদের চাঁদা দিতেই হবে[২৫১]। পুলিশের রেকর্ডপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ঢাকায় খুনের সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুন হয়[২৫২]।

এই পরিস্থিতিতে ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর দেশে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনে সেনা মোতায়েন করা হয়। অপারেশন ক্লিনহার্ট নামক এই অভিযান চলাকালে তিন মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফজতে প্রায় অর্ধশত ব্যক্তির মৃত্যুহয় এবং অসংখ্য ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার হন। এসব লোকের অধিকাংশই ছিলেন বিএনপির সঙ্গে সংশিষ্ট। দলীয় চাপ ও সিভিল সমাজের তীব্র সমালোচনার মুখে সরকার অপারেশন ক্লিনহার্ট বন্ধ করে দেয়, কিন্তু এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ওই অপারেশনের সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে দায় মুক্তি দেয়া হয়। দায় মক্তি অধ্যাদেশটি মানবতা বিরোধী জংলী আইন বলে দেশে-বিদেশে কঠোর সমালোচার সম্মুখীন হয়[২৫৩]।

সেনা অভিযান প্রত্যাহারে পর গা ঢাকা দেয়া সন্ত্রাসীরা বেরিয়ে আসে; গ্রেফপ্তারকৃতরা জামিনে ছাড়া পায়। রাষ্ট্র ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের এক রিং লিডার, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সেসব তথ্য রীতিমতো ভয়াবহ। সে জানায়, জাহাঙ্গীরের ভান্ডারে অস্ত্র আছে ৫ কোটি টাকার। মাসে তার অবৈধ আয় হয় ৩ কোটি টাকার বেশী। তার মতো ২০০ ক্যাডার রয়েছে জাহাঙ্গীরের গ্রুপে। ঢাকায় ৮টি ভাড়া ফ্ল্যাট আছে। জাহাঙ্গীরের লোক জন সেখানে থাকে। খাওয়া দাওয়া চিকিৎসা খরচ সেই চালায়। এরা দামি গাড়ীতে চড়ে বেড়ায়। গাড়ির বৈধ কাগজ পত্র আছে। জাহাঙ্গীরকে সে সচারাচর দেখে না। তার কাছে থেকে নির্দেশ আসে

---

[২৪৯] জনকণ্ঠ, ৯ অক্টোবর, ২০১১।
[২৫০] Daily Star , 26 April,2011. and ২ ডিসেম্বর , ২০১১ ইত্তেফাক,
[২৫১] ইত্তেফাক, ১৬ মে, ২০০২।
[২৫২] ইত্তেফাক , ৭ জুলাই ২০০১।
[২৫৩] যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০০৩ এবং Daily Star, 25 August 2003.

মোবাইলে[২৫৪]। অপর এক শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান রিমান্ডে জবানবন্দিকালে গডফাদার হিসেবে একজনমন্ত্রী , একজন সংসদ সদস্য ও একজন ওয়ার্ড কমিশনারের নাম বলে। সে সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের দিয়ে যারা অপরাধ করিয়েছে তাদের কী হবে?[২৫৫] উলেখ্য, পিচ্চি হান্নান এর ৪০ দিন পর ক্রসফায়ারে মারা যায়।

একুশে আগস্টের বর্বরোচিত হামলার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত না করে এক সাজানো নাটকের মাধ্যমে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা হয়। এই নাটকের খল নায়ক ছিলেন নোয়াখালি জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র ঘরের সন্তান ঢাকার ফুটপাতে ফল বিক্রেতা জজ মিয়া। তাকে ২০০৫ সালের ১০ জুন সিআইডি তার গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে এবং ঢাকায় নিয়ে এসে উর্ধ্বতন সিআইডি কর্মকর্তারা রিমান্ডের নামে দুই সপ্তাহ আটক রেখে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি আদায় করে। শারীরিক নির্যাতন ও প্রাণ নাশের ভয় দেখিয়ে ম্যাসিজট্রেট আদালতে তাকে দিয়ে বলানো হয় যে, অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে তিনি গ্রেনেড হামলায় অংশ গ্রহণ করেন। সিআইডি কর্মকর্তারা আশ্বাস দেন, এ মামলায় তাকে আসামি না করে রাজসাক্ষী করা হবে এবং মামলা শেষে তাক বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি শেষে জজ মিয়াকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সিআইডি কর্মকর্তারা জজ মিয়াকে করাগারে টাকা পয়সা, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতেন এবং তার পরিবারকে মাসিক ২৫০০ টাকা ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সিআইডি কর্মকর্তাসহ র‍্যাবের একজন উচ্চপদস্ত কর্মকর্তার জিজ্ঞাসাবাদ কালে জজ মিয়া স্বীকার করেন যে, তিনি গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং বলপূর্বক তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালে তাকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তিনি প্রায় ৪ বছর বিনা অপরাধে কারাবসের পর ২০০৯ সালের মার্চ মাসে কারাগার থেকে মুক্তি পান[২৫৬]।

২০০৯ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তিন বছর যাবৎ পুনঃর্তদন্তের পর পুলিশ ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলার সম্পূরক চার্জশীট দাখিল করে, যা ২০১২ সালের মার্চ মাসে আদালতে গৃহীত হয়। এই চার্জশীট অভিযুক্ত ৩০ জনের মধ্যে রয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান, তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বার, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম , জামায়াত-ই-ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল আলি আহসান মোজাহিদ, হরকাতুল জেহাদ (হুজি) নেতা মুফতি আব্দুল হান্নান, খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব

---

[২৫৪] যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩; Daily Star, April 2003.
[২৫৫] যুগান্তর, ২৭ আগস্ট , ২০০৪।
[২৫৬]Daily Star, 25 August, 2011.

হারিস চৌধুরী। অভিযুক্তদের মধ্যে আরও রয়েছেন, তিন জন সাবেক আইজিপি, দুইজন সাবেক উচ্চপদস্ত সেনা ও নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা। এই সব কর্মকর্তা ২১ আগস্ট হামলার সময় চাকরিরত ছিলেন।এই জঘন্য আক্রমণের প্রধান লক্ষ ছিল শেখ হাসিনাকে হত্যা করা এবং এটা ছিল বিএনপি, হুজি, জামায়াত নেতাদের চক্রান্তের ফসল[২৫৭]। এই মামলার শুনানিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এপ্রসঙ্গে বিএনপি, জামায়াত সরকার প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীকে কিভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তার অপর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ আহুত হরতালের আগের দিন ৪ জুন, ২০০৪ রাতে হোটেল শেরাটনের পাশের রাস্তায় বিআরটিসির একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নি সংযোগের ফলে ৯ জন যাত্রী মর্মান্তিক মৃত্যূ ঘটে। আহত হন প্রায় ২০ জন। অগ্নি সংযোগের অভিযোগে ৬ জন আওয়ামী যুবলীগ অফিসের পিয়ন দানেশকে ৭ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়নি। পুলিশ ১১ জুলাই মাসুম নামে এক ভবঘুরে চিছকে সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের কয়েক ঘন্টার মধ্যে মাসুম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি ৫/৬ জন যুবলীগ নেতার নাম উলেখ করে বলে যে, তাদের পরিকল্পনা ও কথামত সে এবং জনৈক কালুসহ তারা কয়েকজন সহযোগী বাসের মধ্যে সিরিঞ্জ দিয়ে পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। উক্ত কালু ২৮ জুলাই একই আদালতে মাসুমের জবানবন্দির পুনরাবৃত্তি করে। অথচ ৩ জুন থেকে ৮ জুন কালু একটি ছিনতাই মামলার আসামি হিসেবে কারাগারে বন্দি ছিল । সুতরাং প্রশ্ন ওঠে ৪ জুন তারিখে বাস পড়ানোর ঘটনায় কালু কিভাবে জড়িত থাকে? আর সিরিঞ্জ দিয়ে পাউডার ছিটানোই বা কিভাবে সম্ভব? আসলে মাসুম ও কালুকে নির্যাতন ও ভীতিপ্রদর্শন করে ওই স্বীকাররোক্তি আদায় করা হয়[২৫৮]। মানবাধিকার সংগঠন Institute of Human Rights এর হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সালের প্রথম ১০ মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ৩৪০ ব্যক্তি নিহত ও ২১২৭ জন আহত হয়। এদের মধ্যে পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিল ২৪৫ ও র‍্যাবের হাতে নিহত হয় ৯১ জন । পুলিশের হাতে নির্যাতনের শিকার হয় ১৯৬২ জন[২৫৯]।

সারণী ঃ ১৪

তিন বছরে বাংলাদেশে সহিংসতার চিত্র

২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সাল

---

[২৫৭]Daily Star, 19 March, 2012.
[২৫৮] প্রথম আলো, ১২ জুলাই,২০০৪; যুগান্তর , ৭ও ৮ আগস্ট, ২০০৪।
[২৫৯] যুগান্তর , ১ নভেম্বর ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সহিংসতার রূপ	২০০৯	২০১০	২০১১
বিচার বহির্ভূত রূপ	১৫৪	১২৭	৮৪
কারাগারে অপমৃত্যু	৫০	৬০	১০৫
গুম-অপহরণ	০২	১৮	৩০
নিপীড়ন	৮৯	৬৭	৪৬
সাংবাদিক আক্রমণ	১৪৫	১৭৮	২০৬
রাজনৈতিক সহিংসতায় মৃত্যু	২৫১	২২০	১৩৫
এসিড নিক্ষেপ	১০১	১৩৭	১০১
ধর্ষণ	৪৫৬	৫৫৯	৭১১
যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা	৩১৯	৩৭৮	৫১৬
গণপটুনিতে মৃত্যু	১২৭	১৭৪	১৬১

উৎস: Human Rights 2011, Odhikar Report on Bangladesh (January 07,2012), P. 140.

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে সরকার প্রধান সবসময় নিজেদের স্বার্থে প্রশাসনের সকল বিভাগকে ব্যবহার করেছে, যার ফলে দেশের জনগণ সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা সুগম হয়নি।

৮.৫ সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যেসব বিশ্ব নেতার ভূমিকা রয়েছে তারা সকলেই চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এমনকি অনেক সামজ বিজ্ঞানী মনে করেন, যে কোনো প্রকারেই হোক পাশ্চাত্য জগৎ এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যে পরিবেশ এই চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অনুকূল ছিল। ফলে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের রাজ্যে পাশ্চাত্য জগৎ নেতৃত্বের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে প্রাচ্য সামজিক ব্যবস্থায় মুক্তচিন্তার পরিমন্ডলের অভাবে প্রাচ্য দেশগুলো দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানে নেতৃত্বের ভূমিকায় আসতে সক্ষম হয়নি[২৬০]।

[২৬০] মনিরুজ্জামান, তালুকদার, বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০১, পৃষ্ঠা-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা গণতন্ত্র বিকাশের জন্য অত্যাবশকীয়। তবে এও স্বীকার করতে হবে যে, প্রচার মাধ্যম সব সময় দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়না। উপরন্তু সার্বিক আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমাদের দেশে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের মান ও স্তর এখনো অপর্যাপ্ত এবং দুর্বল। সংবাদ সংগ্রহের বুদ্ধিবৃত্তিমুলক উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধির মানের চাইতে অনেক নীচে অবস্থান করছে। তারপরও গণতন্ত্রের বিকাশ ও সমাজের উন্নয়নে তা একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে[২৬১]। বাংলাদেশে প্রচার মাধ্যমের দুই ধরণই বিদ্যমান, যথা-

- প্রিন্টমিডিয়া (সংবাদপত্র)
- ইলেক্ট্রনিক মিডয়া (সরকারী , বেসরকারী টেলিভিশন, বেতার ইত্যাদি)

মান ও পরিমাণ উভয়দিক থেকেই ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্টেড মিডিয়ার উন্নয়ন ঘটেছে। উভয় মিডিয়া এখন গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত পৌছে গেছে[২৬২]।

সংবাদপত্র তথা প্রচার মাধ্যমের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপক এবং তা নির্ভর করে একজনের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। কিন্তু তারপরও এর একটি মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য অভিধা আছে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ বন্ধনমুক্তি। আর বাধা আসে মূলত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝব সরকারি বাধানিষেধ থেকে মুক্তি।[২৬৩]

একটি জাতির সুস্থতার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল প্রানবন্ত, গতিশীল এবং স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের। যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত খ্যাতনামা রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন ১৭৮৭ সালে প্যারিস থেকে এডওয়ার্ড ক্যারিংটনকে লেখা এক চিঠিতে সংবাদপত্র ভূমিকা সম্পর্কে যা লিখেছেন আজও তা অতুলনীয়। তিনি লিখেছেন- "The basis of our Government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right, and were it left to me to decide whether we should have a government with out newspapers or newspapers without a government. I should not hesitate a moment to prefer the later"।[২৬৪] গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডিও ও টেলিভিশন পুরোপুরি ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং এরা শুধু ক্ষমতাশীলদের পক্ষাবলম্বন করছে বা স্বাধীন

---

[২৬১] আহমদ, মওদুদ, গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশর রাজনীতি এবং সামরিক শাসন, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৬৫।

[২৬২] রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, আফসার ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৩৬।

[২৬৩] মিঞা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সংবাদপতের স্বাধীনতা : সেকাল ও একাল, শিকড়,প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫৫।

[২৬৪] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলদেশের সমাজ ও রাজনীতি, দীপ্তি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী-২০০২, পৃষ্ঠা-৬৫।

ভাবে মত প্রকাশ করতে ভীত স্বন্ত্রস্ত। সরকার কিংবা সরকারী কোনো তৎপরতার সমালোচনা সেখানে অনুপস্থিত এবং এভাবে প্রচার মাধ্যমের একটি বৃহত্তর অংশকে যথাযথ গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে[২৬৫]।

ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ থেকে বিদায় নেয়। তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৬১ সালে আইয়ুব খাঁ পত্রিকা ও প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন।এর দ্বারা বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ছাড়াও পত্র-পত্রিকার ওপর প্রাক প্রকাশ সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। সাংবাদিকরা এর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আন্দোলন অব্যাহত রাখেন[২৬৬]। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ কিন্তু তৎকালীনের সরকারের রোষে পড়ে দৈনিক অভজারভরের প্রধান সম্পাাদক আবদুস সালাম তার চাকরি হারান। শেখ মুজিবর রহমানের নামের আগে বঙ্গবন্ধু না লেখার জন্য দৈনিক বাংলার হাসান হাফিজুর রহমান এবং তোয়াব খান পত্রিকার চাকরি থেকে অপসারিত হলেন। পরবর্তি সময়ে গণকন্ঠের সম্পাদক আল মাহমুদ, অবজারভারের বাবুল রব্বানী, চট্টগ্রামের একটি দৈনিকের মৃণাল চক্রবর্তী, হলিডের এনায়েতুলাহ খান ও হাবিবুর রহমান প্রমুখ সাংবাদিককে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার করা হয় [২৬৭]। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন ঘোষিত হয় " নিউজ পেপার ডিক্লারেশন এ্যানালমেন্ট অর্ডিন্যান্স"। এ আইনের আওতায় ৪ টি দৈনিক পত্রিকা বাদ দিয়ে বাকি সকল পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়। এর পূর্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংবাদ পত্র বন্ধ করার বিধান, খবর ছাপার ওপর বিধি-নিষেধ, সংবাদের সূত্র প্রকাশে সাংবাদিকদের বাধ্য করা, এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পত্রিকার হকারকে গ্রেফতার করার বিধানও নতুনভাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়[২৬৮]। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবাদপত্রের জগতেও পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন- পূর্বের সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল আইনটি সংশোধিত হয় যার ফলে বিলুপ্ত পত্রিকাগুলো পুনঃপ্রকাশিত হয়, ইত্তেফাক সরকারি মালিকানা থেকে ব্যাক্তি মালিকানায় ফিরে যায়, সাংবাদিকদের দাবির প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড পুনরুজ্জীবিত করেন, সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন, প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম হতে সরকারী ভাবে দৈনিক প্রকাশিত হয়, চাকুরিচ্যুত অনেক সাংবাদিক চাকুরি ফেরত পান[২৬৯]। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিশেষ ক্ষমতা আইন সংশোধনের জন্য কমিশন

---

[২৬৫] আহমদ, মওদুদ, গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশর রাজনীতি এবং সামরিক শাসন, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৬৫।
[২৬৬] মিঞা, মোহাম্মদম নিরুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সংবাদপতের স্বাধীনতা : সেকাল ও একাল, শিকড়,প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫৬।
[২৬৭] মিঞা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সংবাদপতের স্বাধীনতা : সেকাল ও একাল, শিকড়,প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫৬।
[২৬৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮।
[২৬৯] প্রাগুক্ত।

গঠন করা হয় এবং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত আইনের যে সব ধারায় প্রি-সেন্সরশীপ আরোপ করার ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র বন্ধ করার ক্ষমতা এবং সংবাদের সূত্র প্রকাশের বাধ্যবাধকতা ছিল সে-সব ধারা বাতিল করা হয়[২৭০]। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম জিয়ার নের্তৃত্বে পাঁচ বছরের শাসনামলে আবার গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এ সময় নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের বাধা নিষেধ সহজতর হওয়ায় অনেক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে সংখ্যার হিসেবে বলা যায় ১৯৯১ এর প্রথমে যেখানে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৬৬৯, এক বছরের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৪০। ১৯৯৬ সালের আওয়ামী সরকারের অধিন আবার সংবাদ মাধ্যম চাপের মধ্যে পড়ে যেমন প্রথমেই তারা ধাক্কা দেয় ট্রাস্টভুক্ত পত্রিকাগুলোকে। এগুলোর কোনো কোনোটিতে সরকারি লোক বসানো হয় এবং কোনো কোনো সাংবাদিককে চাকুরিচুত্য এবং সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং বাসস কে করা হয় দলীয় প্রতিষ্ঠান[২৭১]।

আওয়ামী সরকারের সময় সাংবাদিক ভয়বহ নির্যাতনের আরো কিছু চিত্র তুলে ধরলে বুঝা যাবে কিভাবে গণতান্ত্রি অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে- চুয়াডাঙ্গা সদর আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ সোলয়মান হক জোয়ার্দার ও তার ভাই মেয়র রিয়াজুল ইসলামের বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে প্রথম আলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ আলমের বিরুদ্ধে তিনটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছে। জামিন অযোগ্য ধারায় তথাকথিত ছিনতাই মামলা একটি এবং দুটি মানহানির মামলা করা হয়েছে। এলক্ষে ১ আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় প্রথম আলো পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করেন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল নিয়ে আমার দেশ পত্রিকার প্রতিনিধি ডালিম হোসেনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি ভাঙচুর করে। জনকন্ঠ প্রতিনিধি রাজীব হাসানের কার্যালয়ে হামলা ও ভাংচুর চালায় ছাত্রলীগ কর্মীরা। ২ সেপ্টম্বর ছাত্রলীগের কর্মীরা স্থানীয় সাংসদ এর ব্যক্তিগত ড্রাইভারের নের্তৃত্বে দা, চাপাটি, রামদা ইত্যাদি দিয়ে প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিনিধির শাহ আলমের বাড়ীতে হামলা চালায়। ২১ আগস্ট গলাচিপায় নদীর তীর ভরাট করে মার্কেট নির্মাণের কাজ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে । প্রতিবেদনে বলা হয় নদী দখল করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূচী (টিআর) চাল ও সাংসদের ব্যক্তিগত অর্থে এই মার্কেটের নির্মাণ কাজ চলছে। একই রকম স্থানীয় রণগোপালদী নদীর তীর ভরাটে তত্ত্ব সংগ্রহ কালে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাংসদ গোলাম মাওলা রনী প্রথম আলোর প্রতিবেদক ইশরাত হাসানের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা করে এবং জামিন অযোগ্য একটি ধর্ষণ মামলাও করা হয়। যশোরে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ঘোষনা করেন- আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে তার ঝাল

[২৭০] প্রাগুক্ত।

[২৭১] মিঞা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সংবাদপতের স্বাধীনতা : সেকাল ও একাল, শিকড়,প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

টের পাবে, হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকিদেয়। খুলনায়ও প্রথম আলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে স্থানীয় সাংসদ ননীগোপাল মন্ডলের অনুসারীরা[২৭২]। বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রে আরো বিষদগার করেছেন মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, প্রতিমন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়া ও ফজলুর রহমান পটল এবং জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান। জ্বালানি উপদেষ্টা তেল সংকট নিয়ে সংবাদের প্রতিবাদে সংসবাদপত্রের ওপর দোষারোপ করে বলেছেন "এ ধরণের সংবাদিকতা রাষ্ট্রবিরোধী, গণবিরোধী"[২৭৩]। একই ভাবে জোট সরকারের অপর এক শরিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান ও সাংসদ মুফতি ফজলুল হক আমিনী প্রথম আলো সহ কয়েকটি সংবাদপ্রত্রের বিরুদ্ধে বিষদগার করে বলেছেন- একশ্রেণীর মিডিয়া এখনো জেএমবির সঙ্গে আলেম সমাজের যোগসুত্র খুঁজে বের করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এসব মিডিয়া দেশ ও ইসলামের শুত্রু। তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে"[২৭৪]। জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংবাদপত্রের বিষোদগার করতে গিয়ে বলেন-"যেসব সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল জঙ্গিবদের সঙ্গে জামায়াতের জড়িত থাকার কথা প্রমাণ করতে চায়, তারাই এ বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত"[২৭৫]। বাংলাদেশে এই ভাবেই সংবাদ ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নানা মুখ প্রচারনা চালিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অগ্রযাত্রার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো।

কোন রিপোর্ট যদি সংশিষ্ট রিপোর্টারের স্বনামে ছাপা হয়, আর তা যদি কোনো মহল বিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী, অপ্রিয় এবং দু:সাহসী সত্যের প্রকাশ হয়, তাহলে ওই রিপোর্টারের পরিণতি কী ভয়বহ হতে পারে জনকণ্ঠের বিশেষ সংবাদদাতা শামছুর রহমানসহ একাধিক আত্মত্যাগী সাংবাদিক এ দেশে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এখনও প্রাণহানি ঘটছে সাংবাদিকের। প্রবীর, টিপুর মতো সৎ সাংবাদিকদের বরণ করতে হয় পঙ্গুত্ব।[২৭৬]

---

[২৭২] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশন,প্রথম প্রকাশ অমর একুশে বই মেলা -২০১৪, পৃষ্ঠা-৩৬২-৩৬৫।

[২৭৩] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশন,প্রথম প্রকাশ অমর একুশে বই মেলা -২০১৪, পৃষ্ঠা-২০৯।

[২৭৪] প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা-২১১।

[২৭৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১০।

[২৭৬] আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, কলাম বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংবাদপত্র, যুগান্তর, ১৯ মার্চ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৯।

অতীতে আমরা দেখেছি, যে শাসকরা রাস্তায় মিছিল করতে দেয়নি, মিছিল থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গেছে কিংবা মিছিলে উঠিয়ে দিয়েছে ট্রাক, তারাই রাতে আবার সংবাদপত্রের অফিসে এ্যাডভাইস পাঠিয়েছে এই বলে যে, অমুক রিপোর্টটি যাবে অমুকটা যাবে না। সুতরাং জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একজন রাজনৈতিক কর্মী ও একজন সাংবাদিককে একই কাতারে এসে দাঁড়াতে হয়। এখানে একজন দলীয় রাজনীতি করেন এবং অন্যজন দলীয় রাজনীতি না করলেও ন্যায়ের পক্ষে সত্য প্রকাশের জন্য লড়াই করেন। এখানে রাজনীতিক এবং সাংবাদিক দুজনকেই একই লক্ষ্য সামনে রেখে সংগ্রাম করতে হয়। কারণ দু'জনেরই মৌলিক ঐক্য রয়েছে ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতা প্রশ্নে।[২৭৭]

এ দেশের জনগণ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র চর্চার পক্ষে যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও পক্ষে। তারা চান সংবাদপত্র নির্ভয়ে নির্মোহে সত্য প্রকাশ করুক। এ দেশের জনগণের এই ঐতিহ্য বহুকালের। পাকিস্তান আমলে আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র দমনের বিরুদ্ধে তারা যুগপৎ সংগ্রাম করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাকশাল আমলে এবং এরশাদ স্বৈরশাসনামলে সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণ এবং সাংবাদিকরা যুগপৎভাবে সংগ্রাম করেছেন।[২৭৮]

গণতন্ত্রে পরমতসহিষ্ণুতা আর ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ অনিবার্য একটি শর্ত। অথচ এই শর্ত কেহই বা কোনো সরকারই পালন করতে চায় না। তথ্য জরিপ করলে দেখা যাবে যে, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আচরণ দিনে দিনে কেবল বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্রিডম হাউস অতি সম্প্রতিক এক রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশ ও হাইতিতে সংবাদ মাধ্যমকে তারা এখন স্বাধীন নয় বলে মনে করছে। ফ্রিডম হাউসের বার্ষিক ওই প্রতিবেদনে এও উলেখ করা হয় যে, অতীতে তারা এ দুটি দেশের সংবাদ মাধ্যমকে আংশিক স্বাধীন মনে করত, এখন তা করে না। কারণ এ দুটি দেশে এখন সংবাদ মাধ্যমকে প্রকাশ্যে হয়রানি করা হয়। সংগঠনের গবেষক ক্যারেন কার্নেকারের মতে, গত এক বছরে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধির কারণে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। উলেখ্য, এই আন্তর্জাতিক অভিমতকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য বাসস বিশিষ্ট সাংবাদিকদের দিয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়ে বলেছে, বাংলাদেশের সংবাদপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। অথচ বাস্তবতা এর ঠিক বিপরীত। সাংবাদিক নির্যাতন এবং সংবাদ মাধ্যমকে ভিন্নমত প্রকাশ বা বিরোধিতা থেকে বিরত রাখার জন্য যত ধরনের চাপ প্রয়োগ করা যায়, তা করা হচ্ছে। আইনি চাপের মুখে থাকা ইটিভির খবরের যে পরিবর্তন ঘটেছে সম্প্রতি তা থেকেই অবস্থা আঁচ করা যায়। এমনকি

---

[২৭৭] নাসির আহমেদ, ফ্রিডম দিবস ও বাংলাদেশের বাস্তবতা, বিশ্ব প্রেস, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মে, ২০০২, পৃ-৬।
[২৭৮] আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, কলাম, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংবাদপত্র, দৈনিক যুগান্তর, ১৯ মার্চ, ২০০২।

ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হতে হয় এ দেশের সাংবাদিকদের।[২৭৯] নির্যাতনের যে ঘটনাগুলো সংবাদ শিরোনামে উলেখ করা হলো, তার সবগুলোর সঙ্গেই ক্ষমতাসীন দলের সংশিষ্ট তার অভিযোগ পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এসব আলামত সুশাসনের নয়।[২৮০]

আর একটি বিষয় আলোচনায় আনা প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে এই যে, কিছু পত্রিকার দলমন্যতা তার পাঠকদেরও আর সর্বাংশে সবকিছু বিশ্বাস করাতে পারছে না। অর্থাৎ রাজনীতিবিদরা যা বলবেন কিংবা সংবাদপত্রে যা ছাপা হবে তার সবকিছুই পাঠকরা একবাক্যে বিশ্বাস করছেন না পাঠকশ্রোতারা বিশ্বাস করছেন নিজে একটি সিদ্ধান্তে এসে। বাংলাদেশে এখন এমন বহু পত্রিকা আছে যার একটি পড়লে দেশের সব খবর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও ঘটনার পুরোটা একটি পত্রিকা থেকে পাওয়া যাবে না। এসব ক্ষেত্রে পাঠকদের দুই ধারার দুটি পত্রিকা কিনতে হবে এবং দুটি পাঠ করে আসল সত্য বের করার কষ্টটা পাঠককেই করতে হবে। এই প্রবণতা খুব শুভ নয়।[২৮১]

দু:খজনক হলেও সত্যি, জাতির বিবেক বলে দাবিদার সাংবাদিকরা দুই শিবিরে বিভক্ত। যতই দিন যাচ্ছে এই বিভক্তি যেন আরো প্রকট হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর আজ সারা বাংলাদেশই দুই শিবিরে বিভক্ত। সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো কর্মসূচী কিংবা যৌগ কোনো বিবৃতি আজ আর দিতে পারছে না। সাংবাদিকদের বিভক্তির সুযোগ নিচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বৃত্তরা, নিরাপত্তার অভাবে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মুক্ত সাংবাদিকতার দ্বার। এ অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ নিজেদেরই দেখতে হবে। সাংবাদিকের দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে সুশীল সমাজও সাংবাদিকদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।[২৮২]

আমাদের দেশে মোট শিক্ষিতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পত্রিকা পড়ে থাকে। জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের মতো মানুষ পত্রিকা কেনে। তবু সংবাদপত্রের প্রভাব সমাজে অপরিসীম। ছাপার অক্ষরে লেখাতো প্রত্যাদেশের ইজ্জত লাভ করে, বিশেষ করে যেখানে স্বাক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক কম।[২৮৩]

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রিন্টমিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার উপযোগী করতে সুপারিশ

ক. সংবাদ প্রচার মাধ্যমকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা উচিৎ।[২৮৪]

---

[২৭৯] প্রাগুপ্ত।
[২৮০] নাসির আহমেদ, বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস ও বাংলাদেশের বাস্তবতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মে, ২০০২, পৃ-৬।
[২৮১] প্রাগুপ্ত।
[২৮২] আব্দুল কাইয়ুম, সপ্তাহের হালচাল, চাপ দিয়ে খবর চাপা দেয়া যায় না, প্রথম আলো, ৮ মে, ২০০২, পৃষ্ঠা-৮।
[২৮৩] নাসির আহমেদ, বিশ্ব প্রেস, ফ্রিডম দিবস ও বাংলাদেশের বাস্তবতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মে, ২০০২, পৃ-৬।

খ. সংবাদপত্র, সংবাদ শিল্প অবশ্যই স্ব-নিয়ন্ত্রিত হবে[২৮৫]।

গ. অবশ্যই সব সময় নৈতিক বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে সংবাদ বা সংবাদ পর্যালোচনা করতে হবে[২৮৬]।

ঘ. প্রেস ইনুস্টটিউট এর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে যাতে করে ঐ প্রতিষ্ঠা আধুনিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম হয়[২৮৭]।

ঙ.সংবাদপত্রে মালিক কোনোভাবেই সংবাদ কক্ষে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলিকে লোক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করতে হবে[২৮৮]।

চ. প্রেস কাউন্সিলকে পুনঃগঠিত করতে হবে যাতে সাধারণ জনগণ সংবাদ মাধ্যমের যে কোনো হয়রানির দ্রুত বিচার পায়, সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পাদকে প্রেস কাউন্সিল এর নিজট জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে[২৮৯]।

ছ. বিশেষ আইন প্রণয়ণ করতে হবে। যাতে সাধারণ নাগারকগণ দ্রুত ন্যায় বিচার পাইতে পারে এবং এই আইনের মাধ্যমে পত্রিকার মালিক পক্ষ ও সংবাদ কক্ষ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আলাদা করা সম্ভব হবে।

জ. ১৯৯১ সালে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির রূপরেখা অনুযায়ী সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম গুলোকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে হবে। এই সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ সরকারি, বেসরকারি, স্বতন্ত্র বেতার ও টিভি স্টেশনগুলির কার্যকলাপ দেখাশোনা করবে[২৯০]।

ঝ. রাজনৈতিক সংবাদ ও অভিমতের ক্ষেত্রে বেতার ও টিভিতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা ক্ষমতাসীন দলকে যতোখানি সময় দেওয়া হয় ততোখানি সময় বিরোধীদলীয় নেতা ও দলকেও দিতে হবে[২৯১]।

বর্তমানে বাংলদেশে প্রায় বাংলা- ইংরেজী মিলিয়ে একশটির মতো বৃহৎ জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত হচ্ছে। এর মাঝে বেশ কয়টি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলো থেকে প্রকাশিত হয়। তবে যেহেতু সরকারি বিজ্ঞাপনই

---

[২৮৪] মিন্টু, আবদুল আউয়াল, বাংলাদেশের পরিবর্তনের রেখাচিত্র, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা ৪০২।
[২৮৫] প্রাগুক্ত।
[২৮৬] প্রাগুক্ত।
[২৮৭] প্রাগুক্ত।
[২৮৮] প্রাগুক্ত।
[২৮৯]মিন্টু, আবদুল আউয়াল, বাংলাদেশের পরিবর্তনের রেখাচিত্র, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা ৪০২।
[২৯০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০৩।
[২৯১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০৩।

সংবাদ পত্রগুলোর মূল অর্থায়নের উৎস তাই স্বভাবতই সেখানে সেলফ সেন্সরশীপ বিদ্যমান[২৯২]। তারা পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত , বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে এবং কার্যকর জনমত গঠনে সব সময়ই সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে এই মিডিয়া সংবাদ কর্মী বা স্পট রির্পোটাররাও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের কর্ম প্রয়াস অব্যাহত রাখার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সু-সংহত করতে সহায়ক ভুমিকা পালন কারতে পারে[২৯৩]। সর্বোপরি সাংবাদিক, সম্পাদক ও খবরের কাগজ এবং প্রচার মাধ্যমের কর্মীগণ অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করবে তবে সেই সমালোচনা কার প্রতি বিদ্বেষ বা বৈরিতা থাকবেনা । সৎ সাংবাদিকতা দেশের সামজিক ও রাজনৈতিক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক, তেমনি তা আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে উদ্দীপ্ত ও দ্রুতর করতে পারে। কিন্তু বিপদ হলো হলুদ সাংবাদিকতা নিয়ে। এমনিতেও স্বার্থ সংশিষ্ট মহলের সরবরাহ করা সংবাদ (fed News) নতুন কিছু নয়। কিন্তু হলুদ সাংবাদিকতা ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বানানো সংবাদ, গুজবকে বিশ্বস্ত সূত্র, বা বিশেষজ্ঞের মতামত ইত্যাদি বলে সংবাদ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হলে তা ব্যাক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকারসহ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়[২৯৪]।

৮.৬ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও বাংলাদেশের রাজনীতি

রাজনীতি সাধারণভাবে দেশ-জাতি-জনসেবার স্বীকৃত মহত্তম এবং ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু কার্যকর পন্থা। এ পন্থা মহত্তম, কারণ ব্যাহ্যত ও নীতিগতভাবে এ কাজ ও দায়িত্ব পালনের বিপরীতে কোনো অন্তর্গত বিনিময়

[২৯২] Khan, A. Rob & Kabir, F æCivil Society in Bangladesh and its Empowerment", Mizan R. Khan & Kabir (Eds) Democracy in Bangladesh. Dhaka, BIISS, 2002.

[২৯৩] প্রাগুক্ত।

[২৯৪] মিন্টু, আবদুল আউয়াল, বাংলাদেশের পরিবর্তনের রেখাচিত্র, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা ৪০২।

অর্জনের প্রতিশ্রুতি অথবা দাবি থাকে না[২৯৫]। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির ক্ষেত্রটি ক্রমশ বিতর্কিত, জটিল ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ জন্য আরো কিছু অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্খিত কারণের সাথে প্রবল ও উৎকৃষ্টভাবে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। পলিটিক্যাল ক্রিমিনালাইজেশন অর্থে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির পন্থায় দুর্বৃত্তপনা বা অপরাধ করার বিষয়াদিকে চিহ্নিত করে। ধারণার দিক থেকে এটি ক্ষুদ্রতর। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন-এর ধারণাটি সেদিক থেকে বৃহত্তর। ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্স যদি হয় 'রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন' এর ইংরেজি রূপ, তবে এর দ্বারা রাজনীতিতে দুর্বৃত্ত বা অপরাধীদের অংশীদার করার প্রবণতাকে বোঝায়। রাজনীতিকে অপরাধী দুর্বৃত্তদের অংশীদার করার প্রদান দু'টি রূপ দেখা যায়;

- রাজনীতির নেতা কর্মীরা নিজেরাই ব্যাপক মাত্রায় বিভিন্ন ধরণের অপরাধমূলক দুর্নীতিপূর্ণ কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়া। ও
- রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বে (দলীয় ও রাষ্ট্রীয়) দুর্বৃত্ত-অপরাধী ব্যক্তিবর্গকে আসীন করা বা যুক্ত করা।[২৯৬] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে উলেখিত দুই প্রধান রূপককেই কার্যকর দেখা যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিলেন যে এ দেশের রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন এ দেশটিকে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। বলা হয়, আমেরিকার দেয়া খাদ্য সাহয্যের মাত্র শতকরা দশ ভাগ পৌছেছে সেসব দরিদ্রদের হাতে, যাদের এ সাহায্য খুবই প্রয়োজন ছিল[২৯৭]। স্বাধীনতাত্তোর আমলাতন্ত্রের নৈরাজ্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে ব্যথিত করেছিল যিনি ওই সময় সরকারি কর্মচারীদেরকে এ বলে হুশিয়ার করেছিলেন যে তারা যদি তাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সরকারি লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা না করেন তাহলে তাদের কে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে[২৯৮]। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে দুর্নীতি দমন তো নয় বরং নিয়ন্ত্রণেও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াও রাজনৈতিক স্বার্থে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারেননি বরং দুর্নীতিবাজদের নিজ দলে জায়গা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময় এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয় এবং রাজনীতি, প্রশাসন ও নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি

---

[২৯৫] রেহমান, তারেক শাসুর, সম্পাদিত, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড। প্রবন্ধ, রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ন: পেক্ষাপট বাংলাদেশ, লেখক তারেক এম
তরফীকুর রহমান। শোভা প্রকাশ, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৪।

[২৯৬]David Easton, The Political System, New York : Knof, 1953.

[২৯৭] রেহমান, তারেক শাসুর, সম্পাদিত, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড। প্রবন্ধ, বাংলাদেশের দুর্নীতি : একটি পর্যালোচনা, লেখক আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান। শোভা প্রকাশ, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৫৭। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Donald F. McHenry & Kai Bird, Food Bungle in Bangladesh', Foreign Policy, vol. 27, Summer, pp 72-88.

[২৯৮]Tusar Kanti Barua, Political Elites in Bangladesh; A Socio-Amthropological and Historical Analysis of thier Formation, Bern: Peter Lang, 1978, p80.

বলে অভিযোগ করতে শোনা গেছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা অনুদান নিতে হলে শিক্ষা ভবনে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়[২৯৯]। ১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের আমলেও দুর্নীতি পরিস্থিতির উলেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। খালেদা জিয়া সরকার (১৯৯০-১৯৯৫) দুর্নীতি রোধে উলেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এ সরকারের শাসনামলে ১৯৯৬ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশকে চতুর্থ সর্বাধিক দুর্নীতি যুক্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলেও (১৯৯৬-২০০১) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় দুর্নীতি আরো বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতি পরিস্থিতি এতটা আশংকাজনক হয়ে ওঠে যে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চাকরির সুপারিশও কার্যকরী হয় না, ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না, দুর্নীতির মামলা কোর্টে গেলে সহজে আলোর মুখ দেখে না, প্রভৃতি মন্তব্য করেন[৩০০]। ২০০১ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশকে প্রথম বারের মত সর্বাধিক দুর্নীতিযুক্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ ঘটনাটি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের দুর্নীতি বৃদ্ধির বিষয়টিকে পরিচিতি করে তোলে। একটি গবেষণা [৩০১] থেকে এসময়ে বিভিন্ন খাতে এক (১) বছরে সংঘঠিত দুর্নীতির একটি সহজ হিসাব পাওয়া যায় :

সারণী ঃ ১৫

২০০২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী খাত ওয়ারী দুর্নীতি তথ্য

দুর্নীতিগ্রস্ত খাতের নাম	মোট দুর্নীতির পরিমাণ
শিক্ষা	৯২০ কোটি (৪০% ছাত্র ছাত্রী দুর্নীতির শিকার)
স্বাস্থ্য	১২৫০ কোটি (খানা প্রতি ১৮৪৮ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে)
ভূমি প্রশাসন	১৫শ ১৫ কোটি
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	১শ ৮২ কোটি
কর	১২ কোটি
পুলিশ	২ হাজার ৬৬ কোটি
বিচার ব্যবস্থা	১ হাজার ১শ ৩৫ কোটি

তথ্যসূত্র : টিআইবি পরিচালিত এশটি গবেষণা, বাংলাদেশ দুর্নীতি : এশটি খানা জরিপ,২০০২

[২৯৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৯০।

[৩০০] মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, দুর্নীতি নির্বাচন ও রাজনীতি : স্বরূপ বিশেষণ-সংকট উত্তরণ, (ঢাকা :পরমা, ২০০৩), পৃষ্ঠা,৫৫।

[৩০১] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৭ সালের দেশব্যাপি ২০০৫ জনের উপর একটি খানা জরিপ পরিচালনা করে এবং মিডিয়াসহ দেশের সর্বমহলে বিষয়টি নজর কাড়তে সক্ষম হয়। এই জরিপের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো: দুর্নীতির ধরণ ও বিস্তার পরিমাপ করা; কীভাবে এভং কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে তা অনুমান করা দুর্নীতি এবং কারণ সম্পর্কে খানার ধারণাবের করা । খানা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে একজনের নেতৃত্বে একটি পরিবার অর্থ্যৎ এক হাড়িতে রান্না বান্না হয় এমন একটি পরিবার। ২০০২ সালের এই জরিপে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রশাসনিক বিভাগ নমুনা অনুসারে ৬ টি বিভাগে ভাগ এবং বিভাগগুলো কে গ্রাম ও শহর এলাকায় ভাগ করা হয়। জরিপের নমুনা ভৌগলিক ও অঞ্জল অনুসারে বিভাজন করা হয়। দেশের জাতীয় পর্যায়ের তথ্য বিবেচনা করে শতকরা ৭৬ ভাগ নমুনা শহর এলাকা থেকে নেয়া হয়। এভাবে উপজেলা, পৌরসভা পরিচালনার জন্য বাছাই করে ৩০৩০ খনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের আরেক নমুনা দলের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় পদে বাণিজ্যপ্রবণ ব্যক্তিদের আসিন করা। প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় পদ বহুলালোচিত চাঁদাবাজি কার্যক্রমে সহায়ক হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা প্রধান বিরোধী দলের নেতাদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে চাঁদাবাজি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেউ কেউ আবার সরকারি ও বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে একের পর এক দুর্নীতি করেছেন[৩০২]।

বর্তমানে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লুটেরা রাজনীতিবিদ এবং দুর্নীতিবাজ আমলাও পেশাজীবিদের দৌরাত্মে বাংলাদেশর সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত দুর্নীতির খানা জরিপ ২০০৫ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১০টি খাতের ২৫ টি সেবা নিতে প্রায় ৭০ শতাংশ লোক ঘুষ প্রদান করেছে [৩০৩]। অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এ দেখা যায় বিদ্যুৎ, পুলিশ ও কাস্টমস বিভাগ সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য পুলিশ ও স্থানীয় সরকার প্রশাসন পরের স্থান দখল করেছে [৩০৪]। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে [৩০৫]। এ অবস্থায় বিগত চারদলীয় জোট সরকার বিভিন্ন চাপে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করলেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের চাপে তা কার্যকর হতে পারেনি এবং ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী গোষ্ঠী বাংলাদেশকে লুটেপুটে খাওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে এ ভয়াল দানব একদিনে সৃষ্টি হয়নি।

২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টি আই বি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ পর পর কয়েকবার সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। টিআইবি কর্তৃক ২০০৪ সালে পরিচালিত খানা জরিপে দেখা যায় ৯টি খাতের ২৮টি সেবা নিতে জনগণকে বছরে ৬ হাজার ৭'শ৯৬ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অথ্যার্ৎ প্রতিটি বাংলাদেশী মানুষকে বছরে গড়ে ৪'শ ৮৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এর মধ্যে ভূমি সংশিষ্ট অফিস,থানা, এবং নিম্ন আদালতের সাথে সংশিষ্টরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ সংগ্রহ করেছে[৩০৬]। খাত অনুযায়ী সংঘঠিত এ দুর্নীতির চিত্র নিম্নরূপ:

[৩০২] রেহমান, তারেক শাসুর, সম্পাদিত, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড। প্রবন্ধ, রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ন: পেক্ষাপট বাংলাদেশ, লেখক তারেক এম তরফীকুর রহমান। শোভা প্রকাশ, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৪।
[৩০৩] বাংলাদেশে দুর্নীতি : একটি খানা জরিপ, ২০০৫, টিআইবি।
[৩০৪] দি স্টেট অব গর্ভনেন্স ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ২০০৮।
[৩০৫] অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ (এজিবি) এর অডিট প্রতিদিন।
[৩০৬] বাংলাদেশে দুর্নীতি : একটি খানা জরিপ, ২০০৫, টিআইবি।

সারণী ঃ ১৬

টিআইবি পরিচালিত ২০০৫ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী খাতওয়ারী দুর্নীতির তথ্য:

দুর্নীতি খাতের নাম	মোট দুর্নীতির পরিমাণ (১বছরে) টাকায়	প্রধান উপখাত অনুযায়ী দুর্নীতির খাত
শিক্ষা (১১টি উপখাত)	৬০ কোটি ৬৫ লাক্ষ	৯টি খাতে চাঁদা ও ফি আদায় ৫৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা
স্বাস্থ্য (৫টি উপখাত)	৬০ কোটি ৬৫ লাক্ষ	আন্তবিভাগে দুর্নীতি ৩০কোটি টাকা বর্হিবিভাগে দুর্নীতি ১৫ কোটি ৭৯ লক্ষ্য টাকা অপারেশনে দুর্নীতি ২১ কোটি টাকা এক্সরে করতে দুর্নীতি ১৪ কোটি ৬ লক্ষ্য টাকা রক্ত, মল-,মূত্র পরীক্ষা ৩২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা
ভূমি (৪টি উপখাত)	১ হাজার ৯'শ ৬১ কোটি ২ লক্ষ টাকা	জমি রেজি: খাতে দুনীতি ১ হাজার ৪শ ৫৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ভুমি খারিজে দুর্নীতি ১'শ ৩৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা খাস জমি ভোগকারীদের কাছ থেকে দুর্নীতি ৩'শ ৬৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।
পুলিশ (৪টি উপখাত)	১ হাজার ৫'শ ৩১ কোটি টাকা	এফআইঅর করতে দুর্নীতি ২'শ ২৭ কোটি ১৩ লক্ষ জিডি করতে দুর্নীতি ৭৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিতে নিতে দুর্নীতি ৯৩ কোটি টাকা বিভিন্ন মামলার আসামীর কাছ থেকে ঘুষ ১ হাজার ২'শ ২৯ কোট ৬১ লক্ষ
বিচার বিভাগ (২টি উপখাত)	২হাজার ৪২ কোটি টাকা	মামলার বাদীদের কাছ থেকে ঘুষ ৮'শ ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ মামলার বিবাদীদের কাছ থেকে ঘুষ ১ হাজার ২'শ ২৯ কোটি ৬১ লক্ষ
ব্যাংক ও পেনশন	৩'শ ২৮কোটি টাকা	ঋণ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে ঘুষ ২'শ ৪৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা পেনশন উত্তোলনকারীদের কাছ থেকে ঘুষ ৮২ কোটি টাকা শুধুমাত্র পেনশন ভোগকারীদের ৭১% কে গড়ে ৮০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে
কর	২'শ ৬ কোটি ৯১ লক্ষ	আয় কর প্রদানকারীকে ঘুষ দিতে হয়েছে ১'শ ৬৭কোটি ৭৩লক্ষ হোল্ডিং কর প্রদানকারীদের ঘুষ দিতে হয়েছে ৩৯ কোটি ১৮ লক্ষ
বিদ্যুৎ	১'শ ৬৯ কোটি ১৬ লক্ষ	বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে ঘুষ ১শ ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল কমানোর জন্য এর সাথে সংশিষ্টরা ঘুষ নেনন ৬৫ কোটি টাকা
সালিশ ও ত্রাণ	৪শ ১৩কোটি ৬৮ লক্ষ	সালিশে ৪১৩ কোটি ত্রাণে ৬৮ লক্ষ টাকা

সূত্র : টিআইবি পরিচালিত একটি গবেষণা, বাংলাদেশ দুর্নীতি : একটি খানা জরিপ, ২০০৫

সরকারী প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র ক্ষমতা পরিমাপের জন্য একজন মাত্র নিয়ন্ত্রক সরবরাহকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক কে সূচক হিসেবে বিবেচনা করে টিআইবি ২০০৫ সালে করাপশন ডোঁবেজ রিপোর্টে ২১২৮টি প্রতিবেদন বিশেষণ করে দেখিয়েছেন কোন দুর্নীতি সংঘটনের পেছনে এটি একটি অন্যতম কারণ। শতকরা ৭০.৮০% ঘটনায় একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল উচ্চ, ২৬.৭% ঘটনায় ছিল নিন্ম আর মাত্র ০.৫% ঘটনায় একচ্ছত্র ক্ষমতা অনুপস্থিত ছিল।এ রির্পোটে শতকরা ২% ঘটনায় একচ্ছত্র ক্ষমতার মাত্রা জানা সম্ভব হয়নি[৩০৭]। দুর্নীতির বিভিন্ন ধরণ;

সারণী ঃ ১৭

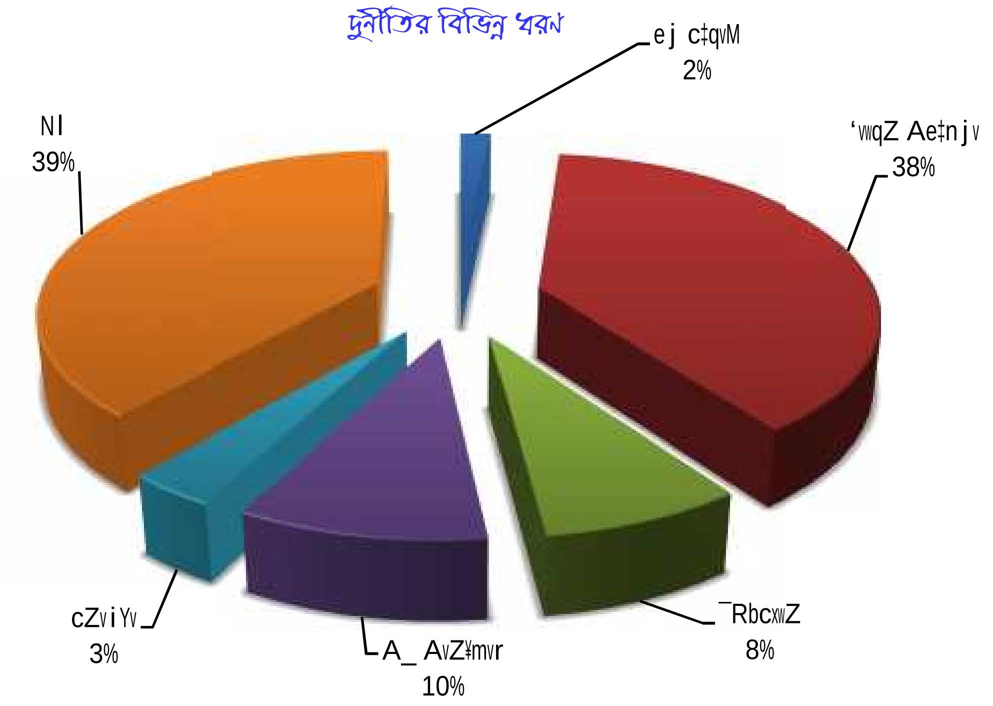

সূত্র : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ পরিচালিত একটি গবেষণা, বালাদেশ দুর্নীতি : একটি খানা জরিপ, ২০০৭।

এভাবে দুর্নীতির মাত্রা যদি দিন দিন বাড়তে থাকে এবং এর বিরুদ্ধে যদি সরকার কোন বা অর্ন্তবমুখী জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে সত্যিকার পেশাদার, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের অভাবে স্বার্থান্বেষী, চাঁদাবাজি, দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব বাংলাদেশ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চর্চাকে ব্যহত করবে। যা কিনা গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়া কে করে বাধাগ্রস্থ। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকী করণের পূর্বশর্ত হিসেবে যে সকল মৌলিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন জাতীয় সংসদ বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারী প্রশাসন যন্ত্র, কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন,

---

[৩০৭]করাপশন ডোঁবেজ রিপোর্ট, ২০০৫।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা ও সক্রিয়তার সাথে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং দুর্নীতি রোধে জাতীয় সততা ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান গুলোকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সারণী ঃ ১৮

চিত্র : জাতীয় সততা ব্যবস্থা

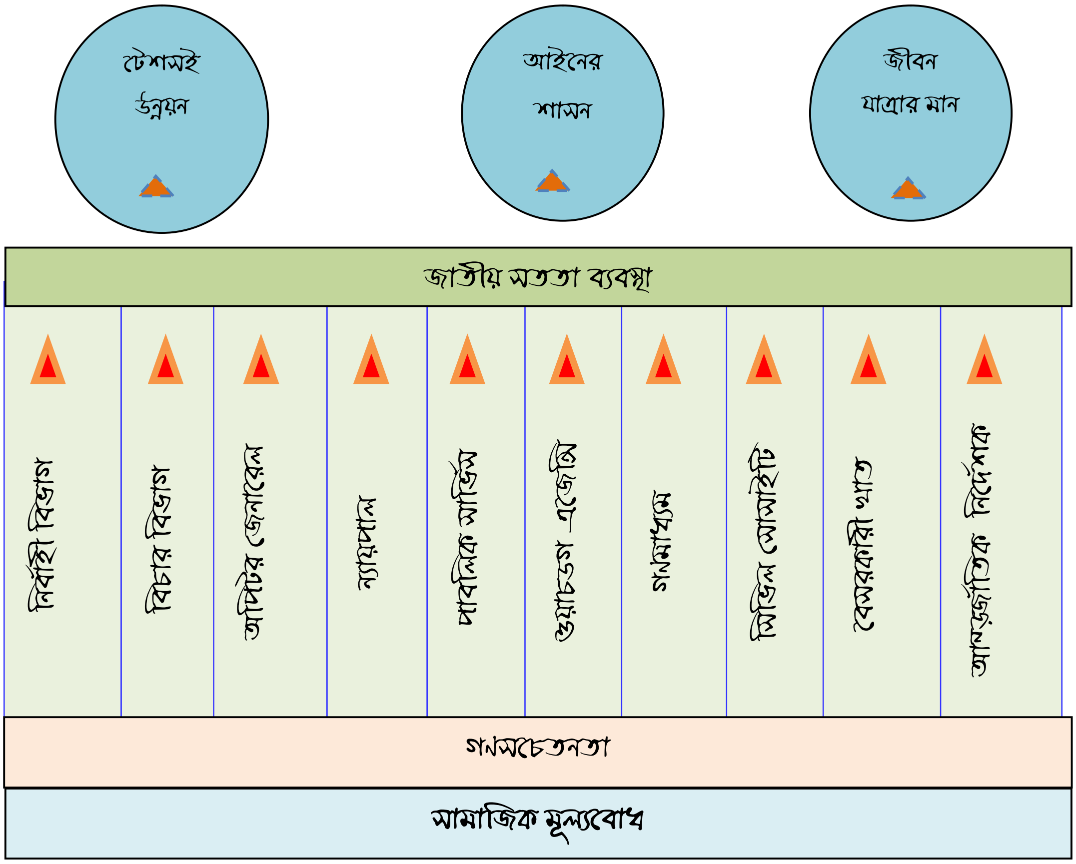

গবেষক কর্তৃক প্রস্তুত কৃত

রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বৃত্তায়নের ফলে রাজনীতিক দলগুলো ক্ষমতার রাজনীতিতেই আসক্ত। গদি দখল করে এমনকি সাংসদ হয়ে ধন-মন-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট অর্জন করে সপরিবারে ও স্বজন-সমাজে অর্থ-সম্পদে পদে-পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই এদর লক্ষে পরিণত হয়েছে। এই দুর্বৃত্তরা দেশপ্রেমী বা জনদরদী নন , তাদের আদর্শে-উদ্দেশ্যে-নীতিতে-বিবেচনায় গণমানবের স্বার্থ রক্ষাপায়নি। তাই তাদের শাসনে গরিব গরীবতর হয়, ভিখারীর সংখ্যা ও বাড়ে, বাড়ে বেকারের সংখ্যাও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে[৩০৮] ।

[৩০৮] শরীফ, আহমদ, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা, মহাকাল,প্রথম প্রকাশ ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন থেকে ও বৃহত্তম পরিমন্ডলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি- বিরোধী সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা এখন সময়ের দাবি।

৮.৭ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংসদ বর্জন সংস্কৃতি

সংসদ বর্জন রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমাদের দেশে প্রায় প্রতিষ্ঠিতই হয়ে গেছে। তা হচ্ছে বিরোধী দলে থাকলে নানা ছুতোনাতায় সংসদ বর্জনকরা। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কম্পিউটারকে সবদিকে আপগ্রেড করা হয়। দলীয় নির্দেশে আমাদের বিরোধী দলীয় সংসদগণ নিজেদের সংসদীয় আচারণকেও প্রতিদিন আপগ্রেড করে নিচ্ছেন। প্রথমে তারা কিছু সময়ের জন্য ওয়াকাউট করতেন। তারপর দু'এক দিনের জন্য প্রতীকী সংসদ বর্জন করতেন। তারপর করেন লাগাতার সংসদ বর্জন। বর্জনের কারণ গুলো স্থূল হতে হতে এখন থলথলে চর্বিদার হয়ে গেছে। বিরোধী দলকে মাননীয় স্পীকার কথা বলতে দেন না। এই গুরুতর অভিযোগে অতীতে আওয়ামী লীগ বিএনপি উভয়েই লাগাতার সংসদ বর্জন করেছে। আবার এক তৃতীয়াংশ এর কম আসন পাওয়া বিএনপি সংসদে সামনের সারিতে দাবিকৃত আসন না পাওয়ায় জনপ্রতিনিধিরা সংসদে আসবেন না। অথচ জনগণ যে আশা নিয়ে জনপ্রতিনিধিকে সংসদে পাঠান নৈতিকভাবে তাদের এতটা স্বাধীনতা নেই যে, সংসদ জনগণের জন্য অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে সংসদ বর্জন করে বেড়াবেন আর গলা উঁচু করে বিবৃতি দেবেন[৩০৯]। এই কারণে বলা যায়, সংসদ বর্জন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি কালো অধ্যায়। তবে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার প্রেক্ষাপটে সংসদ বর্জন করা অযৌক্তিক বা বিধি বহির্ভূতও নয়[৩১০]। অতীত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলো স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি করে যাচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক দলগুলো। আবার জনগণের আশা আঙ্খার প্রতীকে পরিণত না করে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ অর্জনের জন্য সংসদকে ব্যবহার করতে সরকারী বিরোধী দুইপক্ষই অসাধারণ ঐক্যমত্যে পৌছে যায়[৩১১]। সংসদ বর্জনের আর একটি ব্যতিক্রম দিক হলো বিরোধী দলের মতো সংসদ বর্জন না করে সরকারী দলের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় সংসদে আসছেন না। তাই কোরাম সঙ্কটে ভুগছে সংসদ[৩১২]। ২০০১ সালে শুধু শপথ নিয়ে অধিবেশনের শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ সংসদে যায়নি। তারা বলছে সংসদে যাওয়ার পরিবেশ নেই। সরকারি দলের এক দায়িত্বশীল নেতা বলেছেন, আপনারা সংসদে আসুন, সব সুবিধা দেয়া হবে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ তথা বিরোধী দল

---

[৩০৯] এ কে এম শাহনাওয়াজ, সমাজ- রাজনীতির এক দশক, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৯৭।
[৩১০] ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৬৪১।
[৩১১] প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৯৭।
[৩১২] প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৯৭।

আজকে নিপীড়িত-নির্যাতিত। আওয়ামী লীগের লোকেরা গ্রাম-গ্রামান্তরে টিকতে পারছে না। আওয়ামী লীগ কী করে যাবে সংসদে, তাই সংসদে যাওয়ার পরিবেশ চাই। বিরোধী দলের এ প্রশ্নের জবাব খুবই স্পষ্ট। বিরোধী দল বা আওয়ামী লীগ বলতে চাইছে দেশে গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্রের নিয়মনীতি সব লঙ্ঘিত হচ্ছে। এখানে অনেকের বক্তব্য হচ্ছে, দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে সংসদের প্রয়োজন আরো বেশি। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস এদিক থেকে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল এবং তারা সংসদেও যোগ দিচ্ছিল, জমজমাট সংসদ চলছিল, এমন সময় অনুষ্ঠিত হলো মাগুরা উপনির্বাচন। আর এই নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থী হারান বিরোধীদলের প্রার্থীকে। আর এই উপনির্বাচনের জের ধরে শুরু হলো সংসদ বর্জন ও বয়কট। রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে। বিরোধীদলের পক্ষ থেকে দাবীও উঠল, কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে বা নেতৃত্বে নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও তার অধীনে নতুন নির্বাচন চাই। আর এ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বছরের পর বছর বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে চলছিল। সেই আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালে, ফেব্রুয়ারি মাসে একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ নির্বাচনে কোনো বিরোধী দল যোগ দেয়নি। এই নির্বাচন সকল বিরোধী দল বর্জন করে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী করে সেই সংসদ ভেঙে যায়। অতঃপর নতুন নির্বাচন হয় ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। সে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। এবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংসদ অধিবেশন শুরু হয়।

সংসদ অধিবেশনের পথম দিনেই বিএনপি নেতৃবৃন্দের সংসদ বর্জন। তারপর যা হওয়ার তাই হতে থাকল। সংসদ বসে কিন্তু বিরোধী দল আসে না। আবার সময়-সুযোগ পেলে দুই নেত্রীই বলেন, সংসদ হচ্ছে দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু কেউ সে কেন্দ্রবিন্দুতে তারা যেতে চান না। ক্ষমতায় গেলে সবাই আদর্শবান রাজনীতিক আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে একেবারে আহত সিংহ। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস পাঠ করলে মনে হবে এ দেশে বড় দুটি দল ক্ষমতার বাইরে একান্তই বিপবী।[৩১৩]

দেশের সাধারণ নাগরিকরা কিন্তু দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সংসদ সংক্রান্ত এই বাগ-বিতণ্ডায় খুব একটা আগ্রহ বোধ করে না। একটা প্রাণবন্ত পার্লামেন্ট দেখতেই বরং জনগণ অনেক বেশি আগ্রহী। পরপর দুই আমলেই বিরোধী দলের পার্লামেন্ট বর্জনের কারণে একদিকে যেমন আমাদের জাতীয় সংসদ তার ঔজ্জ্বল্য

[৩১৩] নির্মল সেন, সংসদ নির্বাচন করবেন অধিবেশনে যাবেন না একে কোন রাজনীতি, ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃঃ ৫।

হারিয়েছে।[৩১৪] তেমনি অপরদিকে সংসদ সেশনে দেখা দিচ্ছে কোরামের গুরুতর অভাব, কারণ বিরোধী দলবিহীন সংসদ।

দুই দলের নেতা-নেত্রীদের এই ধারণা আছে, বিরোধী দলে থেকে ক্ষমতায় যেতে হলে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন করে বিজয়ের বেশে পরবর্তী নির্বাচনে যেতে হবে। এই ধারণা থেকে এক সময় সংসদ বর্জন করেছিল আওয়ামী লীগ এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ আমলে তারা পাঁচটি বছর সংসদ নিয়ে খেলেছে বিএনপি। ২০০১ সালের সংসদ নিয়ে খেলছে আওয়ামী লীগ। এখন নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ জিজ্ঞাসা করতে পারে, আপনারা নির্বাচন কেন করেন? আমরা আপনাদের ভোট দিই সংসদে যাওয়ার জন্য, লাগাতার সংসদ বর্জনের জন্য নয়। আপনারা কথায় কথায় পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেন, সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম কেমন পরিবেশ আপনারা চান?[৩১৫]

এত সব কথা এ জন্যই বলা হলো যে, পার্লামেন্টারি প্রাকটিস শেখার জন্য সময় দিতে হয়। সংসদ সদস্যরা যদি সংসদের অধিবেশনেই উপস্থিত না থাকেন, তবে তারা এই প্রক্রিয়ার নিয়মকানুন শিখবেন কী করে?[৩১৬]নবম জাতীয় সংসদের রাজনীতিতে একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ অধিবেশন। এ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে একটি রিপোর্টে উলেখকরা হয় যে চলতি সংসদে এ পর্যন্ত ৯৫ কার্যদিবসে বিরোধী দল ২৩ দিন প্রধানমন্ত্রী ৭৩ দিন ও বিরোধী দলীয় নেতা ৩ দিন উপস্থিত ছিলেন[৩১৭]।

সুশানের জন্য নাগরিক (সুজন) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন বিরোধী দল সংসদের প্রাণ। বিরোধী দল ছাড়া সংসদ কার্যকর হতে পারে না। তাই সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে বিরোধী দলকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে এ ব্যাপারে বিরোধী দলেরও দায়িত্ব আছে। বড় কোন ইস্যু ছাড়াই টানা সংসদ বর্জন মানুষ ভালভাবে নেয় না। দেশের স্বার্থের বিষয়টিও বিরোধী দলকে আমলে নিতে হবে[৩১৮]।

সারণী ঃ ১৯

সংসদে বিরোধী দলের ওয়াক আউট

[৩১৪] ড. শাখাওয়াত আলী খান, জাতি প্রাণবন্ত সংসদ দেখতে চায়, ইত্তেফাক, ২০ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃঃ ৫।
[৩১৫] নির্মল সেন, সংসদ নির্বাচন করবেন অধিবেশনে যাবেন না একে কোন রাজনীতি, ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃঃ ৫।
[৩১৬] ড. শাখাওয়াত আলী খান, জাতি প্রাণবন্ত সংসদ দেখতে চায়, ইত্তেফাক, ২০ ডিসেম্বর, ২০০১।
[৩১৭] দৈনিক আমার দেশ, ২০১০, জানুয়ারি ২৬, পৃষ্ঠা-১
[৩১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২০০৯, অক্টোবর ৭, পৃষ্ঠা-১

সংসদ অধিবেশন	কার্যদিবস	ওয়াক আউট
প্রথম সংসদ (০৭.০৪.১৯৭৩ থেকে ০৬.১১.১৯৭৫)	১৩৪	৭ বার
পঞ্চম সংসদ (০৫.০৪.১৯৯১ থেকে ২৪.১১.১৯৯৬	৪০০	৬০ বার
সপ্তম সংসদ (১৪.০৭.১৯৯৬ থেকে ১৩.০৭. ২০০১)	৩৮২	৬২ বার
অস্টম সংসদ (২৮.১০.২০০১ থেকে ২৭.১০.২০০৬)	**৩৭৩**	৯৫ বার

উৎস : সংসদ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আশা করা গিয়েছিল এবার হয়তো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে। সত্যিকার অর্থে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ হবে। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। নবম জাতীয় সংসদের বিরোধীদল প্রথম অধিবেশনে যোগ দিলেও ২টি অধিবেশন বর্জন করেছে[৩১৯]। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বিএনপি সংসদ বর্জন করে চলেছে। এমন কি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনেও তারা যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি[৩২০]। গত ১০ জুন বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সংসদে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন। সে সময়ে মহাজোটের সংসদরা ছাড়াও অতিথি হিসেবে বিদেশী কুটনীতিক, অর্থনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন পেশাগত দায়িত্ব পালনকারী সাংবাদিকেরাও। কিন্তু বিরোধী দল বিএনপি ও তাদের সহযোগী জামায়েত সংসদেরা ছিলেন না[৩২১]। দেশের সাধারণ নাগাকিরা কিন্তু সংসদ বর্জনের এ সংস্কৃতিকে খুব ভাল দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেনি। তবে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি দেশবাসীকে হতাশ করলেও বিরোধী দল সমূহের কোন বোধোদয় ঘটেছে বলে মনে হয় না। কেননা বিগত সরকারির বিভিন্ন আমলে বিরোধী দল এভাবে বাজেট অধিবেশন বর্জন করেছে বহুবার।

বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থার এ ভঙ্গুর অবস্থা বিশেষণ করে সাউথ এশিয়ান গ্রুপের বিশেষজ্ঞ **জ্যোতি এম পথানিয়া** বলেছেন আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে-ই হোক বাংলাদেশে বিরোধী দলের ভুমিকা গঠনমূলক নয়[৩২২]। সংসদ বর্জন না করে সরকার ও বিরোধী দল নিন্মোক্ত বিষয় বিবেচনা করে দেখতে পারেন-

১. সংসদকে কার্যকর ও সচল রাখার মাধ্যমেই জাতীয় স্বার্থ নিহিত একথা সরকার ও বিরোধী দল উভয়কে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

[৩১৯] সূত্র দৈনিক পথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩।
[৩২০] হাসান, সোহরাব, বিএনপি সংসদে যাবে কি যাবে না, দৈনিকক প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৩।
[৩২১] হাসান, সোহরাব, বর্জন কি অর্জন হয়, দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন, ২০১০, পৃষ্ঠা-১৩।
[৩২২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২. বিরোধীদল যাতে নির্ভয়ে, নির্বিবাদে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারে এ জন্যে সরকারকে সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিপক্ষের ওপর পুলিশি হামলা একটি ফ্যাসিবাদী অপশক্তিরই পরিচয় বহন করে। তা বন্ধ করতে হবে।

৩. বিরোধী দলের দাবি সমূহ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করার উদ্যোগ নিতে হবে[৩২৩]।

৪. সসংদীয় দলসমূহের জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকগণের যথাযথ আচারণ এবং সংসদীয় কাঠামোতে আন্তঃদলীয় সমন্বয় ও মতৈক্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে[৩২৪]।

৫. সত্যিকার অর্থে জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে হলে গণতান্ত্রিক পন্থায় সকল সংসদ সদস্যের সমানধিকার নিশ্চিত করাসহ সকল সদস্যের বক্তব্য নিরপেক্ষ ও বস্তু নিষ্ঠভাবে প্রচার মাধ্যমে প্রচার করার ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ[৩২৫]।

৬. বিরোধী দল কে সংসদে কথা বলার সময়ের ব্যাপারে আরো যত্নশীল হতে হবে।

৭. সংসদে অমিমাংসিত বিষয় সমাধানের জন্য স্বৈরতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন না করে গণভোটের ব্যবস্থা করা।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল শুধু সংসদের শোভা নয় একটি অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আমাদের দেশে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সংসদের কার্যকরিতার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি শুরু হয় দ্বিতীয় সংসদ আমলেই[৩২৬]।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষাকর্তারা অল্পেই অধৈর্য্য হয়ে যান। পাচ বছর পর পর ক্ষমতায় আসেন, কিন্তু বিরোধী দলের আসনে বসতে পছন্দ করেন না। পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে বামফ্রন্ট। বিরোধী কংগ্রেস ও তৃণমুলের আসন সংখ্যা কখনোই এক তৃতীয়াংশের বেশি ছিল না, যা এখানে নেই। কিন্তু তাই বলে তারা বছরের পর বছর অধিবেশন বর্জন করে না। অথচ এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্র একেবারেই ভিন্ন এবং তা সংসদীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। সংসদ বর্জন ও ওয়ার্ক আউট সংস্কৃতিকে যদি পরিহার না করা যায় তাহলে এ সকল নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে না।

---

[৩২৩] মিঞা; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নিবার্চিত প্রবন্ধ, শিকড়, প্রথম প্রকাশ কাল-২১ বই মেলা ২০02, পৃস্ঠা-৯১।

[৩২৪] হাসানউজ্জামান, আল-মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স,দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশকাল ২০০৯, পৃষ্ঠা-৬৫।

[৩২৫] ইসলাম, ড. নজরুল, বাংলাদেশ সন্ত্রাস, রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, মৌলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা-৮৩।

[৩২৬] হক. ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি , মাওলা ব্রাদর্স, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী-২০0১৪, পৃষ্ঠা- ২২৩।

৮.৯ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। গণতন্ত্র চর্চায় অন্যতম এক পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থা। এ শাসনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংসদ তথা পার্লামেন্ট সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্র থাকায় নির্বাহী কর্তৃত্ব সংসদ থেকে উৎসারিত হয় এবং সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের কাছেই নির্বাহী তার সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্বশীল থাকে[৩২৭]। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা মূলত সংসদ তথা পার্লামেন্ট কেন্দ্রিক। আর সংসদ বা পার্লামেন্ট শব্দটি এসেছে ফরাসি "Parly" থেকে, যার উৎপত্তি ল্যাটিন æParliamentum" এবং এর অর্থ ছিল কথোপকথন। এ শব্দটিকে সম্মেলন বা কূটনৈতিক বাক্যালাপ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছিল যথাক্রমে ১২৪৫ সালে ফ্রান্সে একাদশ লুই এবং পোপের মধ্যে ও তৎপূর্বে স্কটল্যান্ডে ২য় আলেকজান্ডার ও করওয়েলের রিচার্ড আর্ল এর মধ্যে। লেখকদের বর্ণনা মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সেন্ট এডামস্ এর ম্যাথিউ প্যারিস **পার্লামেন্ট** শব্দটি প্রয়োগ করেন প্রিলেট, আর্ল এবং ব্যারনগণের গ্রেট কাউন্সিলকে বোঝানোর জন্য[৩২৮]।

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। গণতন্ত্র চর্চায় অন্যতম এক পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা[৩২৯]। সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্মার্থ হলো সংসদ দেশের সমগ্র জনগণ বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করায় এ ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হলো সংসদের পাটফর্মে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কিভাবে জনমতের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন এবং তারা কতটুকু সংসদীয় কর্মকান্ডে সফলভাবে অবদান রাখছেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী

[৩২৭] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃষ্ঠা-১।

[৩২৮] Noman Wilding and Philip Laundy, An Encyclopedia of Parliament, London: Cassel,1968, পৃষ্ঠা ৫০৯ বর্ণিত হয়েছে Iftekharuzzaman and Sabur (eds.) Bangladesh Society Polity and Economy, ঢাকা প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫।

[৩২৯] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১।

যেমন নিজস্ব কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়িত্বশীল তেমনি প্রতিটি সাংসদকে (এমপি) তার কাজের জন্য নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের কাছে জবাবাদিহি করতে হয়। এভাবেই সংসদে দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলকার জনগণের আশা, আকাঙ্খা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে[৩৩০]।

অধ্যাপক মুনরোর কথায়, " সুসভ্য মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লাভ করেছে প্রাচ্য দেশ থেকে, অক্ষর পেয়েছে ইজিপ্ট থেকে। এলজেব্রা পেয়েছে মুরদের নিকট থেকে। ভাস্কর্য লাভ করেছে গ্রীকদের কাছ থেকে। আইন পেয়েছে রোমানদের কাছ থেকে। রাজনৈতিক সংগঠনের জন্যে প্রধানত ঋণী ইংলিশ মডেলের নিকট"। বৃটিশ পার্লামেন্ট হলো পার্লামেন্ট এর জন্মদাত্রী। এর ভিত্তিতেই সংগঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি বৃটিশ মডেলের এবং বৃটেনের গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকে ধারণ করেই। তারপরও কেন সংসদীয় ব্যবস্থা এদেশে প্রাণবন্ত হচ্ছে না। কেন এ দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে?। আজকের বাংলাদেশে বৃটিশ মডেলে নির্বাচিত সংসদ রয়েছে। রয়েছে বৃটিশ পদ্ধতির মন্ত্রিপরিষদ। রানী নেই বসে শীর্ষস্থানে, কিন্তু রয়েছেন রাষ্ট্রপতি, শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে। রয়েছে রাজনৈতিক দল। বৃটিশ মডেলের বহুদলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আছেন শাসন কাজ পরিচালানার দায়িত্বে। সংখ্যালঘু দল বিরোধীতায়। ছায়া কেবিনেট গঠিত হয়নি বটে, কিন্তু বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ কেবিনেট সদস্যদের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। গণতন্ত্রের কাঠামো রয়েছে, নেই শুধু এর সুষ্ঠ কার্যকারিতা। রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র অলংকার। বৃটেনে এখনও বিশ্বাস করে, যতক্ষণ রানী বার্মিংহাম প্রাসাদে রয়েছেন জনগণ ততক্ষণ ঘুমায় নিশ্চিন্তে। বঙ্গভবনের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এখনও তা প্রযোজ্য হয়নি[৩৩১]।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সংসদীয় গণতন্ত্র একটি উলেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতার প্রথম দশকে পূর্ব বাংলায় দুটি সংসদীয় সভা যথাক্রমে ১৭১ এবং ৩০৯ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। প্রথম পরিষদ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং এতে মুসলিম লীগের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে ১৯৪৭-১৯৫৪ সময়ের সংসদের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল দুর্বল । মুলিম লীগের একচেটিয়া মনোভাব সংসদকে নিয়ন্ত্রণসহ সরকার অভিমুখী করে রাখে । সংসদের স্পিকারও ঈস্পিত ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি[৩৩২]। ১৯৫৪ সালে গঠিত দ্বিতীয় পরিষদের ভুমিকাও ছিলও তথৈবচ। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও কার্যত তা কোনো ভূমিকা রাখতে

---

[৩৩০]হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

[৩৩১] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশ : সাপ্রতিক কালের রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি, হাসি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা-৬৭।

[৩৩২]Najma Chowdhury, The legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Leslature, 1947- 1958, The University of Dhaka. 19820, Page- 339.

সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কুঠারঘাত করে এবং ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন জারি করে। এরপর শুরু হয় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন । আইয়ুব খানের শাসনামলেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী অত্যধিক জোরালো হয়ে ওঠে এবং তা এক ব্যাপক ও গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। অবশেষে এই উভয় দাবি সংবলিত কর্মসূচী নিয়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে মূলত আওয়ামী লীগ ওই নির্বাচনে ব্যাপক জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়[৩৩৩]। এপ্রসঙ্গে বলা হয়- " Such a political order, according to the Bengali intelligentsia, could rectify the situation in which they suffered from acute economic deprivation and political domonation "[৩৩৪]। সঙ্গত কারণে নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য অধীর আগ্রহে ক্ষমতা হস্তান্তরের অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু পাকিস্তান শাসক চক্রের ফলে শুরু হয় বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্র আবির্ভাব ঘটে। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমেদ তাঁর- 'Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ The constitution of Bangladesh envisaged a westminister type of parliamentary system reflection the aspirations of the people nurtured for nearly two decades. The Awami League's commitment since its inception of the establishment of a 'Real living democracy' for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled because of the absolute power of the government.[৩৩৫]

"সংসদীয় ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে দেশের নিয়মতান্ত্রিক নির্বাহি প্রধান হিসেবে রাখা হয় প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার কেবিনেটের হাতে ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রপতির অবারিত ক্ষমতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই বাংলাদেশের সংবিধানে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়, যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে। কাজেই প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত নির্বাহীর মর্যাদা প্রদান করা হয়। তিনিই হবেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃত

[৩৩৩] মোহাম্মদ আব্দুল ওদুধ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩১৯।

[৩৩৪] Dilara Choudhury, Constitutional Development in Bangladesh: Stresses and Strains, Dhaka: UPL , 1995, Page-49.

[৩৩৫] Maudud Ahmed: 'Bangladesh Era of Sheikh Mujibur Rahman' Dhaka, UPL, P. 104.

অধিকারী প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের অবিসংবদিত নেতা হিসেবে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। কেবিনেট সদস্যগণ যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করতে হবে।[৩৩৬] "১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর পাশ্চ্যত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই এসব রাষ্ট্র পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিহার করে,এবং একদলীয় ব্যবস্থায় নতুন সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।[৩৩৭]

এ দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সংসদীয় সরকার। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিবরের দেশে প্রর্ত্যাবর্তনের পর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকার ব্যবস্থার আমূল পারবর্তন কল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি এবং প্রত্যাশা পূরণ করা হয়[৩৩৮]। বাংলাদেশের জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশ ২২ জারি করা হয়[৩৩৯]। এই পক্রিয়ার মধ্যে সংবিধান ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকরী হয়। সংবিধানে রাষ্ট্রের মৌল নীতি হিসেবে গণতন্ত্র স্বীকৃত পায়। বাংলাদেশে ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতির সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে[৩৪০]। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অন্যান্য চৌদ্দটি দলের সাথে প্রতিদ্বন্ধিতা করেন[৩৪১]। নির্বাচনে শতকরা ৭৩.২০ ভাগ ভোট পায়[৩৪২]। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ও অর্জন করে[৩৪৩]। প্রথম সংসদে ট্রেজারি বেঞ্চের ব্যাপক প্রাধান্য এবং বিরোধী দলের খুবই কম আসন প্রাপ্তির ফলে সংসদে 'সরকারি ও বিরোধী দল' (Official Opposition) বলে কিছু থাকে না এবং সংসদীয় বিরোধী দলের স্বীকৃতি না থাকার বাস্তবতায় সংসদীয় কাঠামোয় দায়িত্বশীল নির্বাহী প্রতিষ্ঠা সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে[৩৪৪]। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধনের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী একদলীয়

---

[৩৩৬] মোহাম্মদ আব্দুল ওদুধ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০

[৩৩৭] প্রাগুক্ত।

[৩৩৮] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃষ্ঠা-২৩।

[৩৩৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪।

[৩৪০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪।

[৩৪১] রেহমান ,তারেক শামসুর ,জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ,প্রকাশকাল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৩।

[৩৪২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৩।

[৩৪৩] ভুঁইয়া, ড. মো: আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮৯, পৃষ্ঠা৩২৩।

[৩৪৪] Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, Dhaka: UPL, Page-49.

রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আওতায় রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেন। ইতোমধ্যে ৬ জুন ১৯৭৫ এ ঘোষিত 'দ্বিতীয় বিপব' কায়েমের লক্ষ্যে জাতীয় দল বাকশাল বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করা হয় এবং রাষ্ট্রপতিসহ কেবিনেট সদস্যগণ ও মন্ত্রীবর্গ সকলেই বাকশালের সদস্যপদ গ্রহণ করেন[৩৪৫]। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ক্ষমতা কেড়ে নেয় হয়[৩৪৬]। সরকারী দল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সংসদের যে সকল সদস্য এই সরকারী দলে যোগ দেননি তাদের আসন শূণ্য হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করা হয়[৩৪৭]। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক কাঠামোর এ ধরণের পরিবর্তনের ফলে সাংবিধানিক রাষ্ট্রের বদলে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এ সময়ের সংসদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে-æThe passage of the Constitution (Fourth Amendment) Bill, 1975, was a monumental example of the impotence of the first parliament of Bangladesh"[৩৪৮]। ১৯৭২-১৯৭৫ সালের টুটি চেপে হত্যা করা হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও মূল্যবোধকে[৩৪৯]। নতুন রাষ্ট্রিক কাঠামোর কার্যক্রম এবং ঘোষিত নীতিমালা প্রকৃত বাস্তবায়নের মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশে সামরিক অভ্যূত্থান ঘটে। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের অনেককে হত্যা করা হয় এবং নতুন সৃষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো বাতিল করা হয়। দেশে সামরিক শাসন জারি করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড এক বছরেরও বেশী সময় ধরে নিষিদ্ধ করা হয়। আরো তিন মাসকাল অতিক্রান্ত হলে দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়[৩৫০]। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ বসে ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির আওতায়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক প্রধান হিসেবে পুনঃনিযুক্তি লাভের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতার মধ্যমণি হন এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার করেন। ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে সীমিত রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালানোর অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল বিধি বা Political Parties Regulation পাশ করে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হয়[৩৫১]। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে[৩৫২]। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭ টি আসন পায়[৩৫৩]।

---

৩৪৫ হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃষ্ঠা-২৬।
৩৪৬ আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি,দীপ্তি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি-২০০২, পৃষ্ঠা-৭২।
৩৪৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩।
৩৪৮ Dilara Choudhury, Constitutional Development in Bangladesh: Stresses and Strains, Dhaka: UPL , 1995, Page-126.
৩৪৯ ভুঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩২৫।
৩৫০ হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃষ্ঠা-২৬।
৩৫১ প্রগুক্ত।
৩৫২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সর্ববৃহৎ বিরোধী দলের মর্যাদা পায়[৩৫৪]। জেনারেল জিয়ার শাসনামলে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত কাঠামোয় এবং এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থাকেন। নির্বাহী এবং সংসদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অসম সম্পর্ক বিরাজমান থাকায় সংসদীয় কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের পদক্ষেপ নেয়া হলেও নির্বাহীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে নির্বাহী তথা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার ব্যক্তিকরণ ঘটে[৩৫৫]। ১৯৮১ সালের মে মাসে জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার তার স্থলাভিষিক্তহন। তবে অচিরেই জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নেতৃত্বে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ২৪শে মার্চ ১৯৮২ বাংলাদেশ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয়[৩৫৬]। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ তার শাসনকে বৈধ করতে প্রয়াস চালান এবং বেসামরিকীকরণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন[৩৫৭]। জেনারেল এরশাদ ১লা জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি গঠন করেন এবং মার্চ ১৯৮৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষনা দেন। এ সময়ে অন্যতম প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে মত দেয়ায় ৭ মার্চ ১৯৮৬ সালে তৃতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়[৩৫৮]। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন পেয়ে বিজয় লাভ করে[৩৫৯]। বিরোধী জোটের আন্দোলন জোরদার হওয়ার প্রেক্ষাপটে ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয় এবং জরুরি অবস্থা বলবৎ করা হয়[৩৬০]। চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দিন দার্য হয় ৩রা মার্চ ১৯৮৮ সাল, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট এবং দল এ নির্বাচন বয়কট করে। চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৬৮টি কার্যদিবসে সর্বমোট ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয়[৩৬১]। ১৯৮৯ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদে সংবিধানের নবম সংশোধনী বিল সংসদে পাস করে রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতির প্রত্যেকের পাঁচ বছর মেয়াদি দুটি টার্ম ক্ষমতায় থাকার বিধান চালু করে[৩৬২]। ইতোমধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলোর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান হতে থাকে এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মধ্যস্থায় ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ সালে তারা যৌথ ঘোষনায় স্বাক্ষর করে এবং এই আন্দোলন অবশেষে

---

[৩৫৩] রেহমান ,তারেক শামসুর ,জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ,প্রকাশকাল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৫।

[৩৫৪] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃষ্ঠা-২৭।

[৩৫৫] প্রাগুক্ত।

[৩৫৬] প্রাগুক্ত।

[৩৫৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯।

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০

[৩৫৯] রেহমান ,তারেক শামসুর ,জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ,প্রকাশকাল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৭।

[৩৬০] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃষ্ঠা-৩০।

[৩৬১] প্রাগুক্ত।

[৩৬২] প্রাগুক্ত।

গণঅভ্যূত্থানে রুপলাভ করলে জেনালে এরশাদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে চতুর্থ সংসদ ভেঙে দেন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। দীর্ঘ ১৬ বছর গণতন্ত্রের যাত্রা পথের চড়াই-উতরাই এর পর বাংলাদেশে আবারও ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল পঞ্চম সরকারের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাংলাদেশে আবারও সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আইন অনুমোদিত হলো গণভোটে। যদিও গণভোট সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ ছিল সীমিত, তথাপি যারা ভোট দিয়েছেন তাদের চার পঞ্চমাংশেরও বেশি সমর্থন লাভ করেছে সংবিধান সংশোধন আইন। এসব কারণে এ মুহুর্তটি এ স্বস্তির জন্য যেমন পরম পরিতৃপ্তির, তেমনি সীমাহীন দায়িত্ব গ্রহণের। যতটুকু আনন্দের, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়বদ্ধতার।[৩৬৩]

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার জন্ম মূলত ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অর্থাৎ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স মাত্র ২৫ বছর। এই ২৫ বছরে সংসদীয় গণতন্ত্রের পদযাত্রায় আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি সে হিসাবের সময় এখনও আসেনি। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা নিম্নরূপ হওয়ার কথাঃ

প্রথমত ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা মূলত দলীয় শাসন ব্যবস্থা এক বা একাধিক দল বা জোট ক্ষমতায় থাকে, পাশাপাশি এক বা একাধিক দল বা জোট বিরোধী দলে থাকে। সরকারি দল ও দলীয় নেতারা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং বিরোধী দল দলীয় নেতার সরকারের ব্যর্থতা ও ভুলত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সরকারি ও বিরোধী দল উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সরকারের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সরকারি দলের থাকে মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট, বিরোধী দলের থাকে ছায়া কেবিনেট। একটি কায়া আর অন্যটি ছায়া। দুইয়ের সমষ্টিই সরকার। সরকারি দলের নেতা সংসদেরও নেতা তেমনি বিরোধী দলের নেতারও রয়েছে সংবিধানিক মর্যাদা। তিনিও একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সরকারি ব্যয়ে তাঁর আবাসিক এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা হয়। সরকারি দল ব্যর্থ হলে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব বিরোধী দলের ।

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ঃ

[৩৬৩] মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০ ।প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।

প্রথমত ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স বেশী নয়। এই কারণে এখনও সংসদীয় গণতন্ত্র পরিপক্বতা লাভ করেনি।

দ্বিতীয় ঃ জনগণের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব।

তৃতীয়ত ঃ সংসদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়া অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া, যার কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র বিকৃত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থত ঃ বিরোধী দলের সংসদ বয়কট বা বর্জন করা এবং সরকারি দলের সংসদ অধিবেশনে যোগদানে অবহেলা।

পঞ্চমত ঃ সব সরকারের আমলে সংসদে সরকারের এক নায়ক কর্তৃত্বের আচারণ প্রতিষ্ঠা করে।[৩৬৪]

ষষ্ঠত ঃ সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে বিরোধীদলীয় সদস্যদের প্রতি ক্ষমতাসীনদের অসহযোগিতা বাংলাদেশে আরেকটি সমস্যা।

সপ্তমত ঃ সংসদ হাউসে উভয় পক্ষের সদস্যদের মন্দ আচরণ ও কটুক্তি একটি সমস্যা।

অষ্টমত ঃ স্পিকারের ন্যায্য আচরণ ও সুষম ব্যবহারের অভাব আর একটি সমস্যা।

নবমত ঃ সংসদ সদস্যদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ একটি সমস্যা।

দশমত ঃ সংসদীয় কমিটিগুলিকে তেমন সক্রিয় এবং কার্যকর না করা ও একটি সমস্যা।

এত কিছুর পরও বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে দারুণ আশাব্যঞ্জক বলা যায়। স্বল্পকালীন অনুশীলনই রাজনীতি ও দেশবাসীকে ইতোমধ্যে এ ব্যবস্থার সমস্যা ও দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন করে তুলেছে। নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার স্বার্থেই রাজনীতি এবং জনপ্রতিধিরা নিজেদের প্রকাশ্য দুর্বলতাগুলো সংশোধন করে নেবে, এটা আশা করা সঙ্গত।[৩৬৫]

নবীন জাতির নবীন সংসদীয় পদ্ধতির যাত্রা পথকে যে বিষয়গুলো বেশি পীড়া দিচ্ছে সে বিষয়গুলো অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিরোধী দল ও সরকারি দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সেগুলো দ্রুত নিরসন করার প্রয়াস চালাতে হবে। ক্রমবর্ধমান আইনশৃঙ্খলার অবনতি রুখতে হবে, বাংলাদেশের দারিদ্র এবং মাথাপিছু আয় বাড়ানোর জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারি এবং বিরোধী দলকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষা বিস্তরের জন্য মহতি উদ্যোগে নিতে হবে। বাক স্বাধীনতা মজবুত করতে হবে। সর্বোপরি সংসদীয় ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিরোধী দল ও সরকারি দলকে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে চলতে হবে। তবেই আমরা সফল হব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল গণমানবের কল্যাণে আসবে।

---

[৩৬৪] এমাজউদ্দীন আহমদ, সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, ঢাকা, ১৯৯৩ইং, পৃষ্ঠা-২।
[৩৬৫] প্রাগুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১০ বাংলাদেশ রাজনীতিক সংস্কৃতি ঃ নির্বাচনে মনোনয়ন কেনা-বেচা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটরগণ নির্ধারণ করেন দেশ কে শাসন করবেন এবং কিভাবে শাসিত হবে। অর্থাৎ নির্বাচন শুধু কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করা নয়, সেই ব্যক্তি বা তার দলের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সর্মথন জ্ঞাপন করার ব্যাপার[৩৬৬]। ১৯৭৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলদেশে জাতীয় পর্যায়ে ১৫ টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ৯ টি সংসদ নির্বাচন, ৩ টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ৩টি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন গুলোর প্রেক্ষাপট, নির্বাচন প্রচার-প্রচারণা, প্রক্রিয়া, পরিবেশ, প্রধান ইস্যূ সমূহ, ফলাফল ইত্যাদি বিশেষণ করলে আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে নির্বাচনের সময় মনোয়ন বেচাকেনা করার সংস্কৃতি ফুটে উঠবে[৩৬৭]। সংসদীয় গনতন্ত্রে নির্বাহী বিভাগ সংসদের নিকট দায়বদ্ধ বিধায় সংসদকে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র গণ্য করা হয়। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ পদ ও পদাধিকারীগণ

[৩৬৬] হক, ড. আবুল ফজল, বাংদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৩৩।
[৩৬৭] প্রাগুক্ত

যদি অনৈতিক ভাবে মননোয়ন বেচাকেনার মাধ্যমে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হয় তাহলে সেই অনৈতিকতার ছোয়া সমগ্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অশুভ দিকে ঠেলে দেয়[৩৬৮]।

বাংলাদেশের রাজনীতিক দলগুলোর নীতি সব সময়ই বিপন্ন, আর রাজনীতিক সততা সম্পর্কে জনগণ সব সময়ই পোষণ করেছে সন্দেহ। রাজনীতি আর অসততা অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। যারা ক্ষমতায় যায় তারা সততার কোন চিহ্ন রাখে না চারপাশে, যারা যায় না বা যেতে পারে না তারাও একই গোত্রের। টাকাই গরিব বাঙালির পতনের মূল কারণ। এদেশে রাজনীতি হয় টাকা দিয়ে, ও টাকার জন্যে। নীতি রাজনীতিক ব্যবসায়ে বড়ো কথা নয়,যদিও প্রকাশ্যে বাজারে আদর্শের কথাই বলে বেড়াতে হয়। টাকার জন্যে বাঙলার রাজনীতিকরা সব আদর্শ বর্জন করতে পারে; তারা গণতন্ত্রী থেকে একনায়কতন্ত্রী হয়ে উঠতে পারে, আবার টাকার কল্যাণে হয়ে উঠতে পারে গণতন্ত্রী। তারা টাকার জণ্যে বিক্রি করে দিতে পারে ন্যায়, নীতি, আদর্শ; তারা বিক্রি করে দিতে পারে ঐতিহাসিক গণঅভ্যূত্থানকেও। স্বৈরাচার উৎখাত করেছে এবার জনগণ; কিন্তু উৎখাতের পর জনগণ আর নেই, এখন রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। তারা সুফল তুলবে গণঅভ্যূত্থানের। তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিলেও শুরুতেই দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে গণঅভ্যূত্থানকে। নির্বাচনের প্রাক্কালে যেসব প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে তাদের অনেকেই ছিল স্বৈরাচারের পক্ষে। তাদেরই বিরুদ্ধেই ঘটেছিল গণঅভ্যূত্থান কিন্তু তারা মনোনয়ন কিনতে পেরে (কোটি টাকার বিনিময়ে) গণতন্ত্রী হয়ে উঠেছে। এই সব স্বৈারচারের কাছে দেশের বড় দু'টো দল বিক্রি করেছে গণতন্ত্র এবং গণঅভ্যাত্থান । মনোনয়ন বেচাকেনা কোটি টাকার বিনিময়ে হয়েছে বলে সংবাদ রয়েছে।[৩৬৯] ফলে টাকা ওয়ালারা কিনে ফেলছে গণতন্ত্র। নিজেদের স্বার্থেই কি তাদের তুলতে হবে না ঐটাকাটা জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জালী দিয়ে। মনোনয়ন কোটি টাকায় ক্রয় করায় গণতন্ত্রটাকেই তারা কিনে নিয়েছে, এখন তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়া। তার প্রথম প্রাপ্য ক্ষমতা যার কিছুটা সে পেয়েছে, তবে আরো অনেক প্রাপ্য তার এবং তার প্রাপ্য টাকা। আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করে যদি একশো কোটি টাকা তুলতে না পারে তবে মনোনয়ন কোটি টাকায় কেনার অর্থ কি হবে? কিছু দিনের তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং প্রদর্শন করবে শিল্পপতির বিস্ময়কর প্রতিভার দূর্নীতির উপাদান। মনোনয়ন বেচাকেনার কুফল প্রকৃত অর্থে ভয়াবহ[৩৭০]। নির্বাচনে মনোনয়ন নগদ অর্থে বেচাকেনার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো কোনো সময়

---

[৩৬৮] প্রাগুক্ত

[৩৬৯] আজাদ, হুমায়ুন, রাজনৈতিক প্রবন্ধসমগ্র, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৮; পৃষ্ঠা-৬০।

[৩৭০] প্রাগুক্ত ; পৃষ্ঠা-৩৭।

শর্ত বিনিময়ের ইতিহাস রয়েছে যেমন- নিজ দলের নেতা কর্মীদের মুক্তি এবং রাজনীতির সাথে সম্পর্কবিহীন আবদার-যেমন অর্থ সাহায্য, সরকারী অনুদান ইত্যাদি[৩৭১]।

বর্তমানে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে টাকার মালিকরা। তারা ভবিষ্যতে অধিক মুনাফার আশায় রাজনীতিতে বিপুল অর্থ মনোনয়ন পেতে বিনিয়োগ করেছেন। বড় দলগুলো অধিক সংখ্যক আসন লাভের আশায় ৪০/৫০ বছরের অভিজ্ঞ অনুগত নেতাকর্মীদের ছুড়ে ফেলে যারা নগদ টাকার ভোট কেনার সামর্থ্য রাখে, যারা লাখ লাখ টাকা খরচ করে সন্ত্রাসী পোষার ক্ষমতা রাখে তাদের মনোনয়ন দিচ্ছে। রাজনীতিতে আদর্শ, আনুগত্য, সততা, শিক্ষা, মেধা, ত্যাগ এসব এখন আর কোনো মানদন্ড নয়। পার্টি ফান্ডে কে কত টাকা চাঁদা দিয়েছেন, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের কত টাকা খরচ করে তুষ্ট করতে পারলেন এটাই মুখ্য বিষয় [৩৭২]। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ে তাদের দলে কিনে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জানা যায় আওয়ামী লীগ বিএনপির চেয়ে বেশী অর্থ দিতে সম্মত হয়েছিল। বিএনপির অগ্রীম দুই কোটি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছিল বলে জানা যায়। এমনকি আওয়ামী লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তালেবান আদর্শের সমর্থক খেলাফত মজলিসকে মহাজোটে নেওয়া হয়েছিল[৩৭৩]। মনোনয়ন বেচাকেনার এই চক্করে পড়ে দলের ত্যাগী ও দীর্ঘ দিন মাঠ পর্যায়ে রাজনীতি করা ত্যাগী নেতাদের কুনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে ফেলে ভুঁইফোড় বণিক নির্বাচনের টিকেট পেয়ে যান। এই বণিক-রাজনীতিকরা সাংসদের টিকেট বুক পকেটে রেখে নির্বাচনে লগ্নি করা টাকা বহুগুনে ফেরত আনার নানা তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন[৩৭৪]।

সারণী ঃ ২০

নবম সংসদের সদস্যদের শিক্ষারমান[৩৭৫]

(সাধারণ আসনে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের পরিসংখ্যান)

শিক্ষা	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	অন্যান্য দল	মোট
¯œাতকোত্তর	৯৫	১০	০৫	০৭	১১৭(৩৯%)
স্নাতক	৮৬	১০	১৬	০৫	১১৭(৩৯%)
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৫	০২	০৪	-	৪১(১৩.৬৭%)
মাধ্যমিক	০৮	০৩	০২	-	১৩(৪.৩৩%)
মাধ্যমিকের নীচে	০৫	০৫	-	-	১০(৩.৩৩%)
অথনা	০১	-	-	০১	০২(০.৬৭%)

[৩৭১] আহমদ, মওদুদ; গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রেক্ষাপট: বালাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; প্রথম প্রকাশ ২০০০; পৃষ্ঠা-১০১।

[৩৭২] নূরুল আমিন দুদু, "বাংলাদেশ রাজনীতির অধঃপতিত রূপ-মনোনয়ন কেনাবেচা" দৈনিক ইনকিলাব ৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

[৩৭৩] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী-২০১৪, পৃষ্ঠা: ২৮৩-২৮৪

[৩৭৪] এ কে এম শাহনাওয়াজ, সমাজ-রাজনীতির এক দশক, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী: ২০১৪; পৃষ্ঠা: ২৮১।

[৩৭৫] নাগরিক সংস্থা 'সুজন' কর্তৃক সংগৃহীত

মোট	২৩০	৩০	২৭	১৩	৩০০(১০০%)

উৎস: নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত প্রার্থীদের এফিডেবিটে উলেখিত তথ্য
(নাগরিক সংস্থা 'সুজন' কর্তৃক সংগৃহীত ও গবেষক কর্তৃক ইষৎ সংশোধীত)

সারণী ঃ ২১

নবম সংসদের সদস্যদেরপেশাগত প্রতিনিধিত্ব[৩৭৬]

(সাধারণ আসনে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের পরিসংখ্যান)

পেশা	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	অন্যান্য দল	মোট
ব্যবসায়ী	১২৮	২২	১৪	০৪	১৭২(৫৭.৩৩%)
আইনজীবী	৩১	০৩	০৪	০৪	৪২(১৪%)
কৃষিজীবী	১৯	-	০৩	-	২২(৭.৩৩%)
সামরিক অফিসার(অব.)	১৪	-	০৩	০১	১৮(১৮%)
ডাক্তার	১৩	-	০১	-	১৪(৪.৬৭%)
সরকারী কর্মকর্তা (অব.)	১০	০১	০১	-	১২(৪%)
শিক্ষক	০২	-	-	-	০২(০.৬৭%)
সাংবাদিক	০১	-	-	-	০১(০.৩৩%)
অন্যান্য	১২	০৪	০১	-	১৭(৪%)
মোট	**২৩০**	**৩০**	**২৭**	**১৩**	**৩০০(১০০%)**

*অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন এমন ১০ জন যারা রাজনতিকে তাদের পেশা বলে উলেখ করেন।
উৎস: নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত প্রার্থীদের এফিডেবিটে উলেখিত তথ্য
(নাগরিক সংস্থা 'সুজন' কর্তৃক সংগৃহীত ও গবেষক কর্তৃক ইষৎ সংশোধীত)

সংসদ-সদস্যদের পেশাগত অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবম সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক হচ্ছেন ব্যবসায়ী। কৃষিজীবী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক চাকুরেদের অনকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যবসা-বানিজ্যের সঙ্গে জড়িত সেহেতু ব্যবসা স্বার্থ সংশিষ্ট সদস্যদের সংখ্যা কার্যত ৫৭ শতাংশের চেয়েও বেশী। সাংসদদের শিক্ষা অবস্থা হতাশা ব্যঞ্জক নয়।

সারণী ঃ ২২

বাছাইকৃত পাঁচটি সংসদে পেশাগত প্রতিনিধিত্ব[৩৭৭]

[৩৭৬] প্রাগুক্ত।

[৩৭৭] **উৎস:** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, Bangladesh Parlament : A handbook(ঢাকা, ১৯৭৪), সদস্যদের বৃত্তান্ত (ঢাকা,১৯৮১); মোস্তফা হারুন (সম্পাদক), Who's Whoin Parliamenr (Dhaka,1979), আহমদ উলাহ, পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য : প্রামান্য গ্রন্থ (ঢাকা, ১৯৯২); আমিনুর

পেশা	প্রথম সংসদ ১৯৭৩-৭৫	দ্বিতীয় সংসদ ১৯৭৯-৯৮	পঞ্চম সংসদ ১৯৯১-৯৬	সপ্তম সংসদ ১৯৯৬-২০০১	নবম সংসদ ২০০৯
আইনজীবী	৩১%	২৪%	১৪%	১৬%	১৪%
ব্যবসায়ী	১৭%	২৫%	৩৮%	৪২.৫%	৫৭%
কৃষিজীবী	১২%	১৩%	৭%	৮%	৭%
শিক্ষক	১১%	৬%	১১%	৮%	০.৬৭%

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, Bangladesh Parlament : A handbook(ঢাকা, ১৯৭৪), সদস্যদেও বৃত্তান্ত (ঢাকা,১৯৮১); মোস্তফা হারুন (সম্পাদক), Who's Whoin Parliamenr(Dhaka,1979),আহমদ উলাহ, পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য : প্রামান্য গ্রন্থ (ঢাকা, ১৯৯২); আমিনুর রশীদ (সম্পাদক), প্রামাণ্য সংসদ (ঢাকা-১৯৯৭): টransperancy International Bangladesh (TIB), Report : Parliament Watch(Dhaka, 18December,2003);নবম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

এভাবে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ ব্যবসায়ীদের ক্লাবে পরিণত হতে চলেছে। ব্যবসায়ী সাংসদদের বেশীর ভাগই কোটি কোটি টাকার মালিক এবং টাকা নির্বাচনী ফলাফলের নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, যশোর-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন আকিজ গ্রুপের মালিকের ছেলে শেখ আকিল উদ্দিন। আকিল উদ্দিনের কারণে এ আসনে মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হয়েছেন যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও একাধিকবারের নির্বাচিত সাংসদ তবিবুর রহমান সরদার। শোনা যায়, আকিল উদ্দিন আওয়ামী লীগের নির্বাচন ফান্ডে ৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। নীলফামারী-১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন মালা শাড়ি গ্রুপের মালিকের স্ত্রী ড. হামিদা বানু শোভা। দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ত্যাগী নেতা মোঃ আবদুর রউফ টাকার কাছে হেরে গেছেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ফান্ডে মালা শাড়ী গ্রুপ বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ঢাকা-১ আসনে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিল্পপতি সালমান এফ রহমান ও ঢাকা-২ আসনে নূর আলী আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ফান্ডে প্রায় ২০ কোটি টাকা দিয়ে মনোনয়ন নিয়েছেন বলে আওয়ামী লীগ মহলে জোর গুঞ্জন রয়েছে।

এদিকে বিএনপির মনোনয়ন বেচা-কেনার রাজনীতিতে সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী, সাবেক মন্ত্রী শফিকুল গনি স্বপন, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, বরকত উলাহ বুলু, সাবেক মন্ত্রী রফিকুল ইসলামসহ অনেকেই

রশীদ (সম্পাদক), প্রামাণ্য সংসদ (ঢাকা-১৯৯৭): ট Transperancy International Bangladesh (TIB), Report : Parliament Watch (Dhaka, 18 December,2003);নবম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। খুলনা-২ আসনে নিশ্চিত মনোনয়ন দেয়ার কথা থাকলেও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আলী আজগর নবীর কারণে শেখ রাজ্জাক আলীকে এবার ওই আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। প্রথম নবীকে দেয়া হলেও পরে কৌশলগত কারণে বেগম খালেদা জিয়া ওই আসনে প্রার্থী হন। নীলফামারী-১ আসন থেকে মনোনয়ন দেয়ার জন্য। অভিযোগ আছে, কৌশল করে প্রথমে জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোটকে আসন দেয়ার প্রস্তাব করা হলে তারা রাজি হয়নি। পরে খালেদা জিয়ার বোনের ছেলে মোঃ শাহরিন ইসলাম তুহিনকে ওই আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়। চট্টগ্রামের দু'নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও তার ভাই গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী মনোনয়ন চট্টগ্রামের রাজনীতির হিসাব-নিকাশ হলেও এজন্য এই দুই ভাইকে ২ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে বলে শোনা যায়। বরিশাল-৬ আসনে নিশ্চিত মনোনয়ন পাওয়ার কথা ছিল দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ খানের। কিন্তু শোনা যায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদার আবুল হোসেন খানের কাছে দেড় কোটি টাকায় আসনটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এই আসনের অপর মনোনয়ন প্রত্যার্শী নেতা ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আনোয়ার হোসেন চৌধুরীকে দলের পক্ষ থেকে আগে সবুজ সংকেত দেয়া হলেও মনোনয়ন থেকে তিনি বঞ্চিত হন। সিলভার লাইনের মালিক এম এইচ সেলিমের বাগেরহাট-২ থেকে মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টি বহুল আলোচিত ঘটনা[৩৭৮]।

বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনকে বিরোধ-মিমাংসার বৈধ পন্থা হিসেবে স্বীকার করে, তারা নির্বাচকে জয়লাভের জন্য ন্যায়-অন্যায় যে কোন পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা-বোধ করেন না। আমাদের দেশে পেশিশক্তি ও টাকার ছড়াছড়ি অতি পরিচিত ব্যাপার। বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন আই ওয়ালিক ঢাকা অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেন, নির্বাচনী ব্যয়ে বাংলাদেশ শীর্ষে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা , যা জিডিপির ৫%। বাংলাদেশে দুর্নীতির অন্যতম উৎস হচ্ছে নির্বাচন[৩৭৯]। তৎকালীন মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও দাতাগোষ্ঠীর এক বৈঠকে স্বীকার করেন, বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ভোট কেন্দ্র দখল করার জন্য অনেকে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করেন (টাকার বিনিময়ে)। আর যিনি প্রচুর টাকা ব্যয় করে নির্বাচিত হন তিনি পরবর্তী সময় ওই টাকা ওঠানোর চেষ্টা করেন। এতে দুর্নীতিও বেড়ে যায়[৩৮০]। গত ২০০১ সালের নির্বাচনে একজন শিল্পপতি ৬ কোটি টাকায় বিএনপির মনোনয়নপত্র ক্রয় করেন বলে খবর প্রকাশিত হয়[৩৮১]।

---

[৩৭৮] সুজন সাত্তার, এনাম আবেদীন, আসাদুজ্জামান সম্রাট, "পত্রিকা রিপোর্ট", প্রধান দু'দলে বিক্রয় হয়েছে শতাধিক আসন, সর্বনিম্ন দর ১৫ লক্ষ টাকা সর্বোচ্চ ১০ কোটি, আজকের কাগজ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

[৩৭৯] দৈনিক যগান্তর, ৩০ আগস্ট, ২০০৫।

[৩৮০] দৈনিক যুগান্তর. ১৮ নভেম্বর ২০০৫।

[৩৮১] দৈনিক জনকন্ঠ, ২৭ আগস্ট, ২০০১।

মান-সম্মান, জশ-খ্যাতির জন্য অর্থবিত্তবানগণ সমাজে গণ্যমান্য হওয়ার নিমিত্তে অর্থের, বিত্তের ও বিদ্যার পরিমান অনুসারে প্রত্যেক উচ্চাসী শক্তিমান ও সাহসী ব্যক্তিমাত্রই সমিতির, সংস্থার, সংঘের, পর্ষদের, পরিষদের, প্রতিষ্ঠানের, সংসদের সদস্য হওয়ার বাসনা পোষন করে। বড় ধনিক বণিকরা যেমন-অব. সেনানী, অব. আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতী, ঠিকাদার প্রভৃতি নির্বাচনের মৌসুমে হঠাৎ রাজনীতিক অঙ্গনে বিচরণ করতে থাকেন, টাকা দিয়ে কোনো দলের মনোনয়ন কেনন। কেননা তারা তো পেশাদার বারো মেসে রাজনৈতিক নন কিংবা রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। তাদের প্রয়োজন কোনো দেলর সমর্থন ও জনবলের সহায়তা। তারা ভুঁইফোড় রাজনীতিক অর্থের জোরে এবং সমাজে অপরিচিত। তবু ভোট ক্রয়ে কোনো প্রবল দলের সহায়তা পেয়ে তারা সাংসদ হন। যদিও তাদের চিন্তা-চেতনায়-মন-মগজে-মননে জনকল্যাণের কোনো স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, পরিকল্পনা নেই[৩৮২]।

৮.১১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ নেতাদের গণতান্ত্রিক মনোভাব ও পরিভাষার অভাব

æWhat a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving! how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god!”

[৩৮২] শরীফ, আহমদ; অপ্রকাশিত রানৈতিক ও অন্যান্য রচনা রাজনীতির সঙ্কট;মহাকাল; প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ২০১৪; পৃষ্ঠা-৪৪।

বাংলাদেশে উইলিয়াম শেকসপিরিয়ান ক্যাটাগরির প্রায় ষোল কোটি মানুষ বসবাস করি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন এবং আমাদের দিকে তাকাতেন আজ কী লিখতেন ভাবুন তো। অবয়বের দিকে তাকিয়ে শৈল্পিক হয়ত লিখতেন, কেননা নিজেদের সুন্দর বলেই আমরা ভাবি। ভাবি লাবণ্যময়। মেয়েরাও আমাদের রূপবতী, কমলামন্ডিত। কিন্তু যুক্তিবাদে সৌকর্য কোথায়? মন-মানস-মননশীলতায় যে দৈন্য তার কী কোনো তুলনা আছে? গতিবিধি এবং চালচলনে আমরা হয়ে পড়েছি এক একটা দনুজ। পারলে প্রতিপক্ষকে গিলে খাই। প্রকাশ ভঙ্গিতে একদিকে যেমন নির্মম, অন্য দিকে তেমনি অনুচ্চারণীয় , অশীল, অপরিশীলিত। অধিকাংশ সময় দুর্গন্ধময়, অমার্জিত। কাজকর্মে অনেকটা খাটাল, কুটিলতাপূর্ণ, দজ্জাল যেন। অনুধাবনে সংকীর্ণ অনুদার। যা কিছু বিদ্যমান তা ভাঙতে পারঙ্গম। নতুন সৃষ্টিতে অক্ষম। এমনি তো আমরা। এর বেশী কি? হীনতায় আক্রান্ত। আশা নহৈ। সুন্দর ভাষা নেই। মনের সৌন্দর্যকে বন্ধক দিয়েছি। হিংসা প্রতিহিংসার আধিক্যে সমগ্র জনপদকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছি। ক্ষমতার দাপটে চার দিককে জীর্ণ ও বিদীর্ণ করে তুলেছি। বিভক্ত করে ফেলেছি সমগ্র সমাজকে। ঐক্য মতের মহান চেতনা কে দলিত-মথিত করা হয়েছে।[৩৮৩] সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক এমন সম্পর্কের মাঝে অসহায় হয়ে পড়েছে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র।

সংসদয়ি গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হলো, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মাঝে সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব। সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মাঝে সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে **১৯৯১** সালে এক সাপ্তাহিকীতে বলা হয়- দুজন " দুজনকে বৈরী মনে করেন। সংসদ অধিবেশনে এক নেত্রী থাকলে আর এক নেত্রী থাকেন না। এক নেত্রী বক্তৃতা দিলে আর এক নেত্রী মুখ ঘুরিয়ে রাখেন। সংসদে দুজন সামনাসামনি বসেন, কিন্তু কোন দিন চোখাচোখি হতে দেখা যায় না। দু'জন তাকিয়ে থাকেন দুদিকে"।[৩৮৪] এই বৈরী পরিস্থিতির কিছু উদাহরণ দেয়া হলো-

"বিএনপি গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে না, গণতন্ত্রের চর্চা জানে না , কথায় কথায় আওয়ামী লীগ কে গালি দেয়া তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,ধানের শীষের ধোকাবাজি আজ পরিষ্কার, দেশের সব কিছূ আজ স্থবির হয়ে পড়েছে, ক্ষমতাসীন দের আচরণে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই"[৩৮৫] **১৯৯১** সালের নির্বাচনে জয় লাভের পর দেশে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক বছর না ঘুরতেই বিরোধী দলগুলো সরকারকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে না দেবার লক্ষ্যে হরতাল, ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচী পালন করার পাশাপাশি এহেন মন্তব্য করে আসছিল। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর মাস না যেতেই বিরোধীদলের নেত্রী-নেতারা খুব জোরেশোড়ে বলতে শুরু

[৩৮৩] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশের রাজনীতি সমস্যা ও সম্ভবনা, শিকড়,প্রথম প্রকাশ , একুশ বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-১১০।
[৩৮৪] হক, ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, সপ্তম পুনমুদ্রণ,জুন ২০০০, পৃষ্ঠা-২৪৯।
[৩৮৫] সিদ্দিকি, ড. রেজোয়ান, গণতান্ত্রিক পরিবেশ আওয়ামি লীগের রাজনীতি, মনি পাবলিশার্স,প্রথম প্রকাশ: সেপ্টম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩২।

করেন যে, এই সরকার ব্যর্থ হয়ে গেছে, এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের ঘটনার কোন নজির নেই।[৩৮৬]

বিরোধী দলের অনেক নেতারাই এমন কথা বলেছেন যে, এই সরকার ঝাঁকুনি দিয়ে গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা, গণতন্ত্রের শিক্ষাদানের রীতিনীতি যে ও রকম ঝাঁকাঝাঁকি নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে- বিল ক্লিনটন ইলেকটোরাল ভোটে বিজয় সূচক ২৭০ পাবার পরপরই জর্জ বুশ বিল ক্লিনটনকে অভিনন্দ জানিয়ে বলেছেনে , আমরা সকলেই নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকবো। আমরা তার কল্যাণ কামানা করি। পরে তিনি বলেছেন যুক্ত রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে কাজ করে যাব।[৩৮৭] জর্জ বুশ যেমন শুক্ষ্ম কারচুপির প্রশ্ন তোলেননি , তেমনি ডেমোক্র্যাট দলের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবেনা , এমন কথাও বলেননি। আসলে গণতন্ত্রের নিয়মই এই, নির্বাচনেরও নিয়ম একই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যও তাই।[৩৮৮] অথচ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মি. ক্লিনটনের কাছে মি. বুশ পরাজিত হয়েও অভিষেক অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমেরিকানরা নি:সন্দেহে আমার চেয়েও যোগ্যতম একজন নেতা নির্বাচন করেছেন, যিনি আমেরিকানদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বাস্তবায়নে ততটাই সফল হবেন, যতটা সফল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আমিও হইনি এবং আমি আমার পক্ষ থেকে মি. ক্লিনটনকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।[৩৮৯]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক রাজনীতিতে কিন্তু দেশ গড়ার মহান দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রকাশ করেন, এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠানেও। আমরা লজ্জিত হই, ব্যথিত হই তাদের এহেন আচরণে। অথচ আবার আমরাই অপূর্ণ স্বপ্নকে, প্রত্যাশাকে বুকে নিয়ে নির্বাচন এলে আনন্দিত হয়ে উঠি। বড় কষ্ট হয়, সাধারণ মানুষের এ আনন্দকে একটি বক্তব্যের মাধ্যমেই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বগুলো কী নিদারুণভাবে নিরানন্দ করে তোলে।[৩৯০]

সুদীর্ঘ সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সূচিত হয় গণতন্ত্রের এক নতুন ধারা। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে সেদিন যে গণতন্ত্রের বীজ রোপিত হয়েছিল, বাংলাদেশের রাজনৈতিক

---

[৩৮৬] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৭।

[৩৮৭] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৭

[৩৮৮] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৭।

[৩৮৯] মামুন আশরাফী, দ্বিমত পোষণ করুন, কিন্তু গণরায়কে শ্রদ্ধা করুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর, ২০০১, পৃঃ ৫।

[৩৯০] প্রাগুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তা আজ ধীরে ধীরে চারাগাছ হয়ে বেড়ে উঠছে। শিকড় প্রোথিত হচ্ছে তার আরো গভীরে।[৩৯১] জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ এবং কারচুপিমুক্ত নির্বাচন হলেও বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই নির্বাচনগুলোকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বাতিলের পর ১৯৯৬-এর জুনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনও যথেষ্ট অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হলে এবং এই নির্বাচনে বিএনপি পরাজিত হলে, বিএনপি এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ আনয়ন করে এবং সরকারকে একটি অবৈধ সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে এবং সরকার বিরোধী ঐক্যজোট গঠন করে। যা পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী ঐক্যজোটে রূপান্তরিত হয়।[৩৯২]

অপ্রত্যাশিত নির্বাচনী ফলাফল কিন্তু গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল নয়। তাই বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো এ ধরনের পরাজয়ের পর কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিল সে খবর নেয়া। ১৯৫৭ সালে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এর চেয়ে শোচনীয়ভাবে হেরে যাওয়ার পর কংগ্রেস কিভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছিল এবং উঠে এসেছিল সে অভিজ্ঞতা কি খতিয়ে দেখা হচ্ছে মনে হয় না। তার বদলে যা শুরু হয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক। আওয়ামী লীগের মধ্যে শুরু হয়েছে অহমিকা ও প্রতিহিংসা থেকে পরস্পরকে দায়ী করার প্রবণতা, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন নেতাকে বলির পাঠা বানানোর অপচেষ্টা। শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক সীমিত শব্দকোষ থেকে কতিপয় পছন্দনীয় শব্দ অহরহ ব্যবহার করে থাকেন। এর একটি শব্দ 'ক্যু'। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংক্ষিপ্ত শাসনকে 'ক্যু' আখ্যায়িত করেছেন। এটাকে শেখ হাসিনা দেশে জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্বভাষ্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন। হাসিনা দাবি ইতোমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বারো শত অফিসার বিএনপির তালিকা মোতাবেক বদলি হয়েছে।[৩৯৩] এক সময় শেখ হাসিনা কোনো রাখঢাক না করেই বলে দিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নীলনকশা নির্মাণ করেছে।[৩৯৪] বেতার ও টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে নয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রদত্ত ভাষণটিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অহেতুক ঢালাওভাবেগালাগালি করা ছাড়া জাতির জন্য কোনো দিক নির্দেশনা পর্যন্ত দেননি। এটা অনেকটা পল্টন ময়দানের বক্তৃতা হয়েছে। ২৭ অক্টোবর একটা রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাই পীর সাহেব সৈয়দ

---

[৩৯১] প্রাগুপ্ত।
[৩৯২] ড. খলিলুর রহমান, বনচোরাদের সম্পর্কে বিএনপিকে সতর্ক থাকতে হবে, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর, ২০০১, পৃ: ৫।
[৩৯৩] হাসান মামুন, কাঁদা ছোড়াছুড়ি নয়, প্রয়োজন সামগ্রিক মূল্যায়ন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর, ২০০১, পৃ: ৫।
[৩৯৪] ড. আলী নওয়াজ, সব লণ্ডভণ্ড, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ: ৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল করীম বরিশাল শহরে এক ইসলামী জলসায় একই নি:শ্বাসে বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগকে চোরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি একজন বিরোধীদলীয় নেতা বিধায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করবেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চারদলীয় জোটের অনাশরিক দলগুলোকে সরাসরি 'চোরের দল' বলা নিশ্চয়ই বৈসাদৃশ্য। এখানেই শেষ নয়, দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত রিপোর্টের অবশিষ্টাংশ ছিল নিম্নরূপ 'চরমোনাই পীরসাহেব সৈয়দ ফজলুল করীম বলিয়াছেন, 'এ দেশে অশান্তিকারী হইতেছে নারী নেতৃত্ব'। পুরুষ নেতৃত্ব থাকলে তিনি যে কোন দলের সাথে যোগ দিতে পারেন। ২৬ অক্টোবর ২০০১ বরিশালে টাউন হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে পীরসাহেব বলেন, জামায়াত কোন ইসলামী দল নয়, যদি ইসলামী দল প্রমাণ করতে পারে, তবে তিনি তওবা পড়ে সেই দলে যোগদান করবেন বলে ঘোষণা করেন।[৩৯৫] আসলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অভিধানই অভিনব। এই অভিনব অভিধানে আমদানি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক পরিভাষা, যেমন- সূক্ষ্ম কারচুপি, স্থূল কারচুপি, ভোটচোর, ঐকমত্য সরকার ইত্যাদি।[৩৯৬]

বাংলাদেশে নেতা নেত্রীদের এমন বৈরী মনোভবের দরুণ রাজনীতিতে যে সহিংস রাজনীতি ও অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে দেশের এলিট শ্রেণীর কোন ক্ষতি হবে না, শেখ হাসিনার পুত্র-কন্যার সমস্যা হবে না, খালেদা জিয়ার পুত্রের কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না, সাংসদগণ লাল পাসপোর্ট ও করমুক্ত গাড়ি ঠিকই পাবেন, আমলাদেরও কোনো অসুবিধা হবেনা, বড় ব্যবসায়ীরাও ভালো থাকবেন, লেখক-শিল্পিদের জীবনও চলে যাবে। কিন্তু দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামের অগণিত কৃষক-ক্ষেত-মজুর, শহরের বেকার যুবক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন, পোশাক কারখানা শ্রমিকদের জীবন দিশেহারা হয়ে উঠবে। কিন্তু নেতা নেত্রীদের কাছে মন্ত্রী-সাংসদদের কাছে এসবের কোনো মূল্য আদৌ আছে কি?[৩৯৭]

পরিশেষে সকল রাজনৈতিক দলে মেনে নেয়া উচিৎ বহুদলীয় গণতন্ত্রের এই বাংলাদেশে বহু দল থাকবে, বহু মত থাকবে, ঠিক একই বাগানে সুশোভিত বিভিন্ন রংঙের ফুলের মতো। আর দেশ গড়ার মহান কাজে আমরা সবাই সহকর্মী।[৩৯৮]

---

[৩৯৫] প্রাগুপ্ত।

[৩৯৬] ড. আলী নওয়াজ, সব লণ্ডভণ্ড, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ: ৫।

[৩৯৭] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ অমর একুশ মেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-১০৫।

[৩৯৮] মামুন আশরাফী, দ্বিমত পোষণ করুন, কিন্তু গণরায়কে শ্রদ্ধা করুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর, ২০০১, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১২ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব

আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে সাধারণত সৎ সেবাপরায়ণ শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, সমাজসেবী, দেশপ্রেমী, রাজনীতিসচেতন, স্বাধীনতাপ্রিয় সংগ্রামী লোকেরাই আমজনতার ভোটে গণপ্রতিনিধি হতেন বিধান-সভায়, সংসদে। তারা সাধারণভাবে সৎ পরার্থপর এবং জনসেবায় ও জনকল্যাণ চেতনায় উৎসর্গীত প্রাণ ব্যক্তি হতেন। তাদের মধ্যে শতে আশিজন হচ্ছেন অব সেনানী, অব আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ঠিকাদার। আবার সমাজে তাদের অনেকেরই নানা কারণে সজ্জন-সুজন বলে সুনামও নেই। তবু ধন যখন আয়ত্তে এসেছে, টাকার পাহাড়ে মালিকানা যখন মিলেছে, তখন তাদের অবশ্যই মানের ও ক্ষমতার সোনর হরিণ চাই।[৩৯৯]সেনাবিভাগের কাজ হলো নিজে মরার ঝুঁকি নিয়ে অন্যকে ঘরের ও বাইরের শ্রক্রকে বা শুক্রকল্প ব্যক্তিকে, দলকে, বাহিনীকে মারা। আর সওদারগরের পেশার লক্ষ্যহচ্ছে পণ্য ক্রয়ে-বিক্রয়ে মুনাফা লোটা। কাজেই সেনানীর ও সংদাগরের দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনায়, আদর্শে ও লক্ষ্যে গণমানবের আমজনতা অর্থ-বাণিজ্যিক, সামজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনীতিকভাবে জনসেবার, জনহিতৈষিগণ কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কেননা এসব তাদের পেশার ও নেশার বিষয় নয়[৪০০]। মানুষের সেবা করার প্রথম ও প্রধান যোগ্যতা হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা। মানুষকে ভালো না বাসলে মানুষের সেবা করার ইচ্ছা জাগে না। বরং লাভে, লোভে ওস্বার্থে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার প্রবৃত্তিই বৃদ্ধি পায়। কাজেই জনসেবার জণ্যে জনগণ থেকে জনপ্রনিধি নির্বাচন আবশ্যিক বা জরুরি[৪০১]।

দেশপ্রেমী মানবসেবী, মানবতার প্রসারকামী অভিজ্ঞ, ত্যাগী রাজনীতিকের সংখ্যাধিক্য না ঘটলে সংসদে, 'গণতন্ত্র' তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের রাষ্ট্রেও উৎকর্ষ লাভ করবে না, আমরা রাজনীতিক সংযম, সহিষ্ণুতা,সৌজন্য, গণমানবপ্রীতি প্রভৃতির অনুশীলনে রাজনীতিক সংস্কৃতিতে উন্নত ও পরিশীলিত হবো না, এজন্যে আমাদের সংসদকে অবসেনানীর ও সওদাগরের আধিক্যমুক্ত করতেই হবে। যদিও বুদ্ধিজীবি নামে পরিচিত উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক প্রভৃতি পেশার লোকদের মধ্যেও সুযোগ সন্ধানী, সুবিধাভোগী, নগদপ্রাপ্তী লোভী, আত্মমর্যাদারোধহীন পদ-পদবীলিপ্সার সংখ্যা কম নয়, তবু এদেরই বেশী করে 'গণতন্ত্র' অনুশীলনের সুযোগ দেয়া দরকার সুদূরপ্রসারী সুফল পাওয়ার লক্ষে[৪০২]। পাশ্চাত্যের উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পরিকল্পিত সমাজ- উভয়েরই **দুটি বৈশিষ্ট্য**।

---

[৩৯৯] শরীফ, আহমদ, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা রাজনীতি সঙ্কট, মহাকাল,প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১৪,পৃষ্ঠা-৭২।

[৪০০] শরীফ, আহমদ, ,পৃষ্ঠা-৪৪।

[৪০১] প্রাগুক্ত।

[৪০২] প্রাগুক্ত।

এক. রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি। এ ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের প্রকৃতি, কত দিন তারা এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, কখন, কোন অবস্থায় তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে-এসব বিষয়ে সমাজব্যাপী, বিশেষ করে রাজনৈতিক দল সহ রাজনীতি সচেতন নাগরিকদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্যমত।

দুই. অন্য বৈশিষ্ট্য হলো সাংগঠনিক ঐক্যসুত্রের গভীরতা ও ব্যাপকতা। সাংগঠনিক মিলন সূত্রের গভীরতা ও ব্যাপকতার ফলে সমাজে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, প্রাসনিক ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা, ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবহারবিদদের সংস্থা এবং অন্য পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানগুলো এমনভাবে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত হয়, যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজব্যাপী বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হয় অনেকটা সুষমভাবে[৪০৩]।

তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর নব্য গণতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশই ক্ষমতা লোভী ও ক্ষমতা লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত। সামরিক বাহিনীও রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে আগ্রহী হয়ে পড়ে, কেননা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক বাহিনী তিনটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী।

১. সাংগঠনিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব

২. স্বাধীনতা সার্বভোমত্বের প্রতীকরূপে একধরণের আবেগময় মর্যাদা

৩. দেশের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ওপর একচেটিয়া সামরিক বাহিনী অধিকার।[৪০৪]

১৯৭৫ সালে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর একমাত্র জাতীয় দল বাকশাল সংগঠনে আমলাদের অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা চালু হয় প্রকাশ্যে। বাকশালের ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির ২১ জন ছিলেন জ্যৈষ্ঠ পদের আমলা। তৎকালীন সরকারের প্রবর্তিত জেলা গভর্নর পদেও জ্যৈষ্ঠ আমলাদের নিয়োগ দেয়া হয় এবং ৬১টি জেলার ১৪ জন জেলা গভর্নর ছিলেন আমলাদের সদস্য। তবে বাকশালসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূবেই ১৯৭৫ সারের ১৫ আগস্ট সারা দেশে সামরিক শাসন জারি হয় এবং উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও কর্মসূচী বাতিল করা হয়। ১৯৭৫ এর নভেম্বর মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পর সামরিক কর্মকর্তা এবং আমলাতান্ত্রিক এলিটদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ় হতে থাকে। জেনারেল জিয়ার বেসামরিকী করণ প্রক্রিয়া জনমুখী উন্নয়ন প্রসাশনের পদক্ষেপ সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্বের ক্ষমতা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে অবদান রাখে।এ সকল কার্যক্রমের সার্বিক আমলাতান্ত্রিকরণ জনগণের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। জেনারেল জিয়ার নিহত হওয়ার পর তার নির্মিত

[৪০৩] আহমদ,এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশের রাজনীতি সমস্যা ও সম্ভাবনা, শিকড়, প্রকাশকাল একুশ বইমেলা-২০১৪, পৃষ্ঠা; ৬১-৬২।
[৪০৪] প্রাগুক্ত।

রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে আরেকটি সামরিক অভ্যূত্থানকে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। তবে জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর সামরিক এবং বেসামরিক আমলা জোটে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বরং এরশাদের উপদেষ্টা কাউন্সিলে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং একই ধরণের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। ১৯৯১ সালের বাংলাদেশে সর্বসম্মতক্রমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে আমলাতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়। তবে এ সময়ে আমলাদের ওয়েবারীয় পদ্ধতিতে পরিচালনা করা বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যকরী প্রচেষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়নি[৪০৫]।

তালুকদার মনিরুজ্জামান তার একটি নিবন্ধনে দেখান-১৯৬১ সালের পৃথিবীর প্রায় মোট ১২%, ১৯৬৬ সালে ১৯% এবং ১৯৭৩ সালে ২৭% অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতা পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল সামরিক শাসন জারি ছিল[৪০৬]।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি নতুন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তা হল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনীতি অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও আমলাদের অতিমাত্রায় অংশগ্রহণ। ৯০ পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনগুলি অর্থাৎ ৯১, ৯৬, ২০০১ এবং সর্বোপরি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরিসংখ্যানগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এই তিন প্রধানদলের মনোনীত প্রার্থী তালিকায় ৫১০জন নতুন মুখের সমাবেশ ঘটেছিল যারা কেউই ৯১ এর নির্বাচনে উলেখিত তিন দলের কোনটারই প্রার্থী ছিল না ৯৬ এর নির্বাচন এই তিন দল থেকে প্রায় ৬০ জন অবসরপ্রাপ্ত সামারিক ও বেসামরিক আমলা মনোনয়ন পেয়েছিলেন[৪০৭]।

গুন্ডার মিরাডাল এশিয়ান ড্রামা গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলোকে Soft Stateবলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোতে আমলাতন্ত্র দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী। এই নরবড়ে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাধারণত কোন সরকার স্থায়ী হয় না। হয়ত গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এক সরকার এল, সেই সরকারের ব্যর্থতাকে পুঁজি করে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে বসে। সামরিক সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ অভ্যূত্থানে ফেটে পড়ল। এই যে বারবার সরকার পরিবর্তন হয় আমলারা এই পরিবর্তনরে মধ্যেই রাষ্ট্রের হালটি ধরে থাকে। যেহেতু

---

[৪০৫] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশর সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্নন্যান্স,দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯।
[৪০৬] ভুঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ , আধুনিকক সরকারের সমস্যাবলী, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা৩২২-৩৩৩।
[৪০৭] দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ মে, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১।

গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাটা আমলাদের হাতে থাকে যে-কোন ধরণের সরকার আসুক না কেন আমলাতন্ত্রের কাছে সারেন্ডার করতে হয়। আমলাতন্ত্রের স্বার্থে যে সরকারই আঘাত করুক না কেন তাকে খেসারত দিতে হয়[৪০৮]।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও নির্বাচনে ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং অন্যান্য পেশার লোকদের অংশগ্রহণ আকস্মিক নতুন কোনো বিষয় নয়। ১৯৯১-এর নির্বাচন, ১৯৯৬-এ নির্বাচন, সর্বোপরি ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচন-সব নির্বাচনে ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং অন্যান্য পেশার লোকেরা অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এই তিন প্রধান দলের মনোনীত প্রার্থী তালিকায় ৫১০টি নতুন মুখের সমাবেশ ঘটেছে তারা ৯১-এর নির্বাচনে উলেখিত তিন দলের প্রার্থী ছিলেন না। আওয়ামী লীগের প্রকাশিত ৩০০ জনের প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখ ১৫৮টি, বিএনপির ৩০০ জনের তালিকায় ১৫৭টি এবং জাতীয় পার্টির ২৯৯ জনের তালিকায় ১৯৭টি নতুন মুখ স্থান পেয়েছে। ৯১ সালে এই তিন দল থেকে নির্বাচিত এমপিদের ৫৩ জন ৯৬-এ মনোনয়ন পাননি। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬ জন, বিএনপির ৩১ জন এবং জাতীয় পার্টির ৬ জন। ৯৬-এ তিন দল থেকে প্রায় ৬০ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি মনোনয়ন পেয়েছেন। এদিকে দলবদলকারী, রাজনীতিতে নতুন যোগদানকারীদের বেশির ভাগই ১৯৯৬-এ এই তিন দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছে। এ কারণে তিন দলের কেন্দ্রীয় অনেক ত্যাগী নেতাকেও বাদ পড়তে হয়েছে[৪০৯]।

১৯৯৬ সালের নির্বাচন যদি অমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দল যেসব তালিকা প্রকাশ করেছে, তা থেকে পাওয়া যায় এই চিত্রটি। হিসাব করে দেখা গেছে আওয়ামী লীগ, বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ও জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন (এরশাদ) ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৪২৫ জনই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ক্রমবর্ধমান হারে ত্যাগী ও পরীক্ষিত রাজনীতিবিদদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলাসহ অন্য পেশার লোকজন। অতীতের মতো এবারও মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হলেও তাদের অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। ১৯৯৬ নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের পরই দ্বিতীয় অবস্থানে ব্যবসায়ী, তৃতীয় অবস্থানে আইনজীবী, চতুর্থ অবস্থানে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলারা রয়েছেন। একইভাবে এরশাদ পরিবার থেকে রাজনীতিতে আসেন জি এম কাদের ও ড. আবদুর রহমান। রাজনীতিতে আসার আগে জি এম কাদের ব্যাংকার ও আবদুর রহমান শিক্ষক ছিলেন।

[৪০৮] ছফা, আহমদ, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি-২০১১, পৃষ্ঠা-২৭০।
[৪০৯] দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ মে, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১।

রাজনীতিবিদদের জায়গা অব্যাহতভাবে দখল হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি দলে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ বাড়ছে। যার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত। সারা দেশে মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী প্রার্থীরা হরতাল-অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছিলেন[৪১০]।

সারণী-২৩

পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নমব জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

সাল	সামারিক আমলা	বেসমারিক আমলা	ব্যবসায়	আইনজীবি	রাজনৈতিকবিদ	অন্যান্য
৫ম সংসদ	৪%	২.৩৩	৩৬.৬৭	১৯.৩৩	১৭.৬৭	৬
৭ম সংসদ	৫.৩৩%	১.৩৩	৪৩.৬৭	১৬.৬৭	৮.৬৬	১০.৩৩
৯ম সংসদ	৫%	৩%	৫৬.৬৭	১১	৮.৬৬	৫%
৯ম সংসদ	৩%	৪%	৫৭.৩৩	১৪	৪	৪%

উৎসঃ এ কে এম শামছুল , বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেসন্স, চিত্রঃ পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, ও নবম জাতীয় সংসদে সদস্যদের পেশাগত অবস্থান। উৎসঃ আরেফিন এ কে এম শামছুল, বাংলাদেশ নির্বাচন ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন ২০০৩, ২০০৯ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।সূত্র : আরেফিন এ কে এম সামছুল ২০০৩, বাংলাদেশ নির্বাচন, ১৯৭৩-২০০১ , বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সংসদ সদস্যদের রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির ওপর। নবম জাতীয় সংসদ সদস্যদের বিপুল অংশ উচ্চ শিক্ষিত। তবে কেবল শিক্ষাই সংসদ সদস্যদের দক্ষতার মাপকাঠি নয়। সংসদীয় অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন। কিন্তু নবম সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের মধ্যে ১৬৪ জন প্রায় ৫৫% নবাগত, যারা ইতঃপূর্বে কোন দিনই সংসদে বসেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এর ২৩০ সদস্যের মধ্যে ১৩৫ জন প্রায় ৫৯% নতুন। যথাক্রমে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামী দলের ১৩, ১৪, ও ২ জন সদস্য নতুন। তবে সংসদ সদস্য হিসেবে নতুন হলেও তারা রাজনীতিতে আনকোরা নন। বরং তাদের অনেকেই নিজ নিজ দলের অভিজ্ঞ নেতা এবং দক্ষ রাজনীতিক। যেহেতু তাদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী সেহেতু তারা অচিরেই সংসদীয় কলাকৌশল ও রীতিনীতি আয়ত্ত করতে পারেন বলে আশা করেন অনেকে[৪১১]।

[৪১০] সুজন সাত্তার/লোটন একরাম, রাজনীতিবিদদের জায়গা দ্রুত দখল করে নিচ্ছে ব্যবসায়ী আমলা, দৈনিক আজকের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, শেষ পৃষ্ঠা।

[৪১১] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা:১৮৭-১৮৮।

সারণী ঃ ২৪

নবম জাতীয় সংসদ সদস্যদের পেশা

সাধারণ আসনে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের পরিসংখ্যান

পেশা	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	অন্যান্য দল	মোট (শতাংশ সহ)
ব্যবসায়ী	১২৮	২২	১৪	০৪	১৭২(৫৭.৩৩)
আইনজীবী	৩১	০৩	০৪	০৪	৪২(১৪)
কৃষিজীবী	১৯	-	০৩	-	২২(৭.৩৩)
সামরিক অফিসার(অব.)	১৪	-	০৩	০১	১৮(৬.০০)
ডাক্তার	১৩	-	০১	-	১৪(৪.৬৭)
সামরিক কর্মকর্তা (অব.)	১০	০১	০১	-	১২(৪)
শিক্ষক	০২	-	-	-	০২(০.৬৭)
সাংবাদিক	০১	-	-	-	০১(০.৩৩)
অন্যান্য*	১২	০৪	০১	-	১৭(৪.০০)
মোট	২৩০	৩০	২৭	১৩	৩০০(১০০)

*অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন এমন ১০ জন যারা রাজনীতিকে পেশা বলে উলেখকরেন।

উৎস : নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত প্রার্থীদের এফিডেবিট উলেখিত তথ্য (নাগরিক সংস্থা 'সুজন' কর্তৃক সংগৃহীত) ও গবেষক কর্তৃক ইষৎ সংশোধীত।

সারণী ঃ ২৫

বাছাইকৃত পাঁচটি সংসদে পেশাকৃত প্রতিনিধিত্ব

পেশা	প্রথম সংসদ ১৯৭৩- ৭৫	দ্বিতীয় সংষদ ১৯৭৯-৯৮	তৃতীয় সংসদ ১৯৯১-৯৬	সপ্তম সংসদ ১৯৯৬-২০০১	নবম সংসদ ২০০৯-
আইনজীবী	৩১%	২৪%	১৪%	১৬%	১৪%
ব্যবসায়ী	১৭%	২৫%	৩৮%	৪২.৫%	৫৭%
কৃষিজীবী	১২%	১৩%	৭%	৮%	৭%
শিক্ষক	১১%	৬%	১১%	৮%	০.৬৭%

উৎস : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, Bangladesh Parliament : A Handbook (ঢাকা, ১৯৭৪),সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত (ঢাকা, ১৯৮১); মোস্তাক হারুন (সম্পাদক), Who's Who in Parliament (Dhaka, 1979), আহমদ উল-াহ, পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য : প্রামান্য গ্রন্থ (ঢাকা, ১৯৯২); আমিনুর রশিদ (সম্পাদক), প্রামাণ্য সংসদ (ঢাকা-১৯৯৭); Transperancy International Bangladesh (TIB), Report : Parliamnet Watch (Dhaka, 18 December, 2003); নবম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র থেকে সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য[৪১২]।

[৪১২] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা:১৮৭-১৮৮।

এভাবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ব্যবসায়ীদের ক্লাবে পরিণত হতে চলেছে। ব্যবসায়ী সাংসদদের বেশির ভাগই কোটি কোটি টাকার মালিক, এবং টাকা নির্বাচনী ফলাফলের নিয়ামক হয়ে দাঁড়িছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টি আই বি) পরিচালিত এক নমুনা জরিপে দেখা যায় যে, প্রার্থীদের ৮৭% আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকার স্থলে গড়ে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এমনকি একজন প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয় ছিল ২.৮১ কোটি টাকা। উলেখযে, ১৩% প্রার্থী যারা নির্ধারিত ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখেন তাদের কেউ জয়লাভ করতে পারেননি।[৪১৩] । আরও প্রতিয়মান হয় যে, সামরিক ও বেসরকারি আমলাতন্ত্র অন্যতম শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একজন নিবেদিত আদর্শবান রাজনীতিবিদ এবং একজন দক্ষ, শিক্ষিত সুশৃঙ্খল আমলার জীবন পদ্ধতি, ক্রিয়া কর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলনা মূলক ভাবে বিশেষন করলে দেখা যাবে যে, এই দুই ব্যক্তির ভিতর মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। ত্যাগ তিতিক্ষা গণমুখী নেতা ও চরিত্রের দৃঢ়তায় একজন রাজনৈতিক কর্মী একজন দক্ষ, শিক্ষিত, নিয়তান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী আমলার চাইতে অনেক বেশি অগ্রসরমান বলেই মনে হয়[৪১৪] ।

রাজনীতিতে যে ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন তা ব্যবসায়ী কিংবা আমলা কেউই করতে প্রস্তুত নন। রাজনৈতিক দলের নামে কোন প্রকার নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বৈরশাসকদের সুবাদে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশিদারিত্ব লাভ করে অবাধ লুটপাটের মাধ্যমে রাতারাতি ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে এই সব তথাকথিত আমলাদের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সংসদ সদস্য কোন না কোন রাজনৈতিক দলের থেকে নির্বাচিত হন কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়নের সময় প্রার্থীর রাজনৈতিক আদর্শ, ত্যাগ, ব্যক্তিগত চরিত্র, সততা দেশ ও জগণের প্রতি ভালবাসা, নৈতিকতা ইত্যাদি গুণাবলী কে বিবেচনা করা হয় না। এজন্য দূর্বৃত্ত ও দুর্নীত পরায়ন নতুন আদলে রাজনীত করার সুযোগ পায়, নতুন করে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে এবং টাকার জোরে ক্ষমতায় যায়। এসব ক্ষমতালোভী আমলা ও ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থে সামাজিক, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন, পত্রিকার মালিক হন কিংবা সম্পাদক হন। এসব রাজনীতিক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের দলে ও সমাজে প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই। একজন কালো টাকার মালিক সরকারি অর্থ আত্নসাতের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি, খুন, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও দলীয় মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য হয়ে যান, জনগণের সেবক বনে যান। এ ধরনের লোকেরা নির্বাচিত হলো তাদের স্বভাব চরিত্র পরিবর্তন হয় না[৪১৫] । রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত কোন

[৪১৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯০।
[৪১৪] মালেক, ডা. এস এ, ২০০৯, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।
[৪১৫] প্রাগুক্ত।

পরিবর্তন হয় না। এরা সত্যিকার অর্থে সংসদী রাজনীতি বোঝে না, আর এর চর্চাও করেন না। ফলে এদের দ্বারা পরিচালিত রাজনীতি হয় দুঃসহ , হয় প্রশ্নবিদ্ধ।

৮.১৩ বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতিকদের দলবদলের রাজনীতি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনেতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে রাজনেতিক দল। এসব দলের মাধ্যমে জনগণ সাংবিধানিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে নিজেদের অধিকারগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যখন কোনো নির্দিষ্ট জনসমস্টি কোনো নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণে একত্রিত হয় তখনই একটি দলের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তনে সাহায্য করা। দলীয় সরকারই হচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল কার্যকর থাকে[৪১৬]।

বাংলাদেশেও একাধিক দল ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনীতিকদের দলবদলের রাজনীতি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলবদল সব সময়ই ছিল এবং থাকবে। এ দলের নেতাদের সে দলে যাওয়া, সে দলের নেতাদের এ দলে আসা সাধারণ ঘটনা। দল ত্যাগ করা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে দলীয় কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের দল ত্যাগ প্রায়াশই দৃষ্টিগোচর হয়। ক্ষমতা লাভের আশায় ও ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন দল পরিবর্তন ও রং বদলান অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। নমনীয় দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাই এ প্রবণতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী[৪১৭]।

আদর্শের কারণে দলবদল আমাদের দেশে কদাচিৎ ঘটতে দেখা যায়। অধিকাংশ দলবদলের ঘটনা ঘটে ব্যক্তিস্বার্থের কারণে, তখন ব্যক্তি আদর্শ নিক্ষিপ্ত হয় বর্জ্যের স্তুপে । ব্যক্তির স্বার্থ শিকারি প্রবণতা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, দল তো দল, দেশের স্বার্থও মূল্য পায় না। পদ-পদবি, অর্থ ও ক্ষমতা প্রত্যাশীদের ভিড় রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আদর্শের ধার ধারেন না। লাভ-সুবিধা যেখানেই

[৪১৬] মফিক, মাহমুদ, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, অনন্যা, বাংলাবোজার , ঢাকা,প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৩।
[৪১৭] ভুঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ -১৯৮৯,পৃষ্ঠা-৪২৯।

তারা সুযোগমতো সেখানে ভিড়ে যান। এ কারণেই প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই আদর্শের বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়েছে।[৪১৮]

সাধারণত রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য হলো জনগণ ও দেশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি দলের আদর্শ, পথ ও প্রক্রিয়া আলাদা। আলাদা বলেই তারা পরস্পর থেকে পৃথক। আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য থাকলে কোনো দলের নেতার পক্ষেই অন্য কোনো দলে যোগদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু আদর্শের বন্ধন যেহেতু যথেষ্ট মজবুত নয়, সুতরাং দলবদল স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে[৪১৯]।

রাজনীতিকদের দলবদলের একটা বড় মৌসুম হলো জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন পূর্বে কয়েক মাস। এ সময় মৌসুমি রাজনীতিকরা হিসাব-নিকাশে বসেন। দলে থাকলে লাভ না অন্য দলে যোগ দিলে লাভ, এটা এই হিসাব-নিকাশের প্রধান মাপকাঠি। সংসদ সদস্য হতে হবে। দল ক্ষমতায় গেলে মন্ত্রী হতে হবে এ আকাঙ্খা নিয়ে দলের মধ্যে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন। ভোটের হাওয়া কোন দিকে সেটাও তারা বিশেষ গুরুত্বে আনেন। দল থেকে আনুকূল্য না পেলে কিংবা দলীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে না পারলে দল ছাড়ার বিষয়টি তারা বিবেচনায় আনেন এবং আশ্বাস পেলে অন্য দলে নাম লেখান[৪২০]।

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে রীতিমতো দলবদলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রং বদলকারী রাজনীতিকরা প্রদানত বড় দুই দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রতি অতীব আগ্রহী ছিল। বিএনপির অনেক নেতা আওয়ামী লীগে এবং আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ মনোনয়ন পেয়েছেন, কেউ কেউ পাননি। এই দু'দলে যারা জায়গা পাননি তারা তৃতীয় দল হিসেবে জাপা (এরশাদ) বা অন্য কোনো দলে যোগ দিয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন। আবার জাপা (এরশাদ), জাপা (মঞ্জু) থেকেও কয়েকজন বিএনপি ও আওয়ামী লীগে আশ্রয় পেয়েছেন এবং মনোনয়নও লাভ করেছেন। যেমন অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নমিনেশন না পেয়ে মাত্র ৭ ঘণ্টার নোটিশে বিএনপিতে যোগদান করেন এবং নমিবেশন পেয়েছেন। ৫০ বছর ধরে ধীরেন বাবু যে রাজনৈতিক বিশ্বাস লালন করছিলেন, ৭ ঘণ্টার নোটিশেই কি সেটা বদলে গেল? তার "জয় বাংলা" কি "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" হয়েছে? "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" কি "বাংলাদেশী জাতীয়বতাবাদ" হয়েছে? এভাবে এক দিন আগেও যিনি "বঙ্গবন্ধুর" সৈনিক ছিলেন, এখন তিনি হয়ে গেছেন জিয়ার সৈনিক। আবার যিনি ছিলেন "পল-

[৪১৮] মুনশী আবদুল মান্নান, দলবদল ঃ আদর্শহীন রাজনীতির নিরুদ্দেশ যাত্রা, দৈনিক ইনকিলাব, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃষ্ঠা ১১।
[৪১৯] প্রাগুক্ত।
[৪২০] মুনশী আবদুল মান্নান, দলবদল ঃ আদর্শহীন রাজনীতির নিরুদ্দেশ যাত্রা, দৈনিক ইনকিলাব, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃষ্ঠা ১১।

ীবন্ধুর’ একান্ত অনুগত অনুসারী, তিনি এখন বঙ্গবন্ধুর বা জিয়ার সৈনিক। দলবদল থেকে ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তাদের দলে দলবদল নেই বললেই চলে।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা এই যে, মৌসুমি রাজনৈতিক দলবদলকারীদের গ্রহণে বিএনপি, জাপা, আওয়ামী লীগ কারোই অনীহা নেই। এসব দল প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দল থেকে নেতা ভাগিয়ে আনার কূটকৌশল ও তৎপরতা চালিয়ে থাকে। তাদের সাদরে গ্রহণ করে নানাভাবে পুরস্কৃতও করে। এতে দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরি হয়। ত্যাগী ও একনিষ্ঠ নেতারা প্রায়ই প্রাপ্য অবস্থান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। দল এসবের তোয়াক্কা করে না। এটা রানৈতিক দলগুলোর নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে[৪২১]।

রাজনৈতিক নেতাদের দলবদলের কারণ অনুসন্ধান ঃ

প্রথমতঃ অনেক নেতাই আছেন যারা কোনো সময় রাজনীতিতে পরাজিত হতে চান না। নির্বাচনে যেভাবেই হোক মনোনয়ন পেতে হবে এবং নির্বাচিত হতে হবে। এই লক্ষ্য সফল করার জন্য প্রয়োজনে তারা দলবদল করতে দ্বিধা করেন না।

দ্বিতীয়তঃ অনেক রাজনৈতিক দলের কাছে আদর্শ এবং নীতির কোনো বালাই নেই। যেভাবেই হোক জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেতে হবে এবং সরকার গঠন করতে হবে। এই লক্ষ্যে যে প্রার্থীকে দলে নিলে নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারবেন, তাকেই দলে নিতে হবে। সে ব্যক্তি যে দলেরই লোক হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

তৃতীয়তঃ প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে পছন্দ করা এবং সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অনুসরণ করা হবে না বা দলে সুবিচার পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে অনেকে দলবদল করে থাকেন।

চতুর্থতঃ মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যোগদানকারীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে, যে কারণে অনেকেই দলবদলে উৎসাহিত হয়ে থাকেন।

পঞ্চমতঃ অনেকেই সংসদ সদস্য হওয়াকে অর্থবিত্ত লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখেন বা বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তাই তারা যে দলই হোক না কেন, সে দলেই যোগদান করে নির্বাচিত হতে চান।

ষষ্ঠতঃ দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব সর্বাবস্থায় সুন্দর এবং সুষ্ঠু নিয়ামনীতির মাধ্যমে দলীয়, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাদের প্রতি অনুগত রাখা। কিন্তু অনেক সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে কারণে অতি উৎসাহী অনেকেই দলবদলের সুযোগ পেয়ে থাকে।

দলবদলের রাজনীতি, ব্যবসার রাজনীতি, ক্ষমতা ও অর্থলাভের রাজনীতি, আদর্শহীন রাজনীতি কোনো সময়ের জন্যই জাতি ও সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এতে এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের

---

[৪২১] মুনশী আবদুল মান্নান, দলবদল ঃ আদর্শহীন রাজনীতির নিরুদ্দেশ যাত্রা, দৈনিক ইনকিলাব, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃষ্ঠা ১১।

রাজনীতির প্রতি অনাস্থা অনাগ্রহ তৈরি করতে পারে, যার পরিণতি জাতির জন্য মারাত্মক ও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। আদর্শ বিমুখতা রাজনীতিক দিকদর্শনহীন নিরুদ্দেশের পথে টেনে নিয়ে যায়।

আদর্শানুগ, সৎ, উন্নয়ন ও কল্যাণকামী রাজনীতিই জনগণ প্রত্যাশা করে, এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই রাজনীতির বিপন্ন দশার অবসান ঘটতে পারে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের পথ সহজতর হতে পারে।

৮.১৪ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সেনাবাহিনী

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর ওপর রাজনীতিকদের প্রাধান্য সর্বজন স্বীকৃত নীতি। এমনকি সশস্ত্র বিপবের প্রবক্তারা এই নীতিতে বিশ্বাসী। মহাচীনের স্বীকৃত নেতা মাও সেতুং বলেন, "Our principle is that the party commands the gun and the gun must not be allowed to command the party"[422]। তবে অনেক দেশের রাজনীতিরা সামরিক বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে[৪২৩]। একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় অখন্ডত্ব বজায় রাখা সামরিক বাহিনীর পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক ঘটনা[৪২৪]। যে সব রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানী রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে গবেষণা করেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন তাদের মধ্যে এস. ই. ফাইনার, মরিস, জানোউইচ, এস.পি.হান্টিংটন, জে. জনসণ, লুসিয়ান পাই, ম্যারিয়ান লেভি, মাইরন উননার, কোহেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলেখ্য। এদের মতে, সামরিক বাহিনীর জাতীয় আনুগত্য, নিরস-শৃঙ্খলাবোধ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এদের সাংগঠনিক শক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা রাজনৈতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ[৪২৫]

---

[৪২২] Talukder Maniruzzaman, cited in Military Withdrawal from Politics: Acomparative Study (cambridge, Massachusetts, 1987), p.1-2.

[৪২৩] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ -ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৭৪।

[৪২৪] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন, প্রশত প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩৩৮।

[৪২৫] Talukder Maniruzzaman, cited in Military Withdrawal from Politics: Acomparative Study (cambridge, Massachusetts, 1987), p.1-2.; S.E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, London 1962; Morris Janowitz, The military in the political Development of new Nations, Chicago 1964; John Johnson (ed), The Role of the Military in Underdeveloped Countries,Princeton 1962; Alan R Ball, Modern Politics and Government, London 1978.

বাঙালিরা সমরবিমুখ জাতি এ অজুহাত তুলে ঔপনিবেশিক শাসন আমলে প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে বাঙালিদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিত ভাবে বাঙালিদের সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা থেকে বলতে গেলে বিরত থাকে। তাদের আশঙ্খা ছিল, পাছে বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে শুধু একটি বাহিনী তারা গড়ে তোলে। তাও এর অধিকাংশ কমাডিং অফিসার ছিল পশ্চিম পাকিস্তনী। এছাড়া, সীমান্তপাহারা দেয়ার জন্য ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) নামে একটি আধা-সামারিক বাহিনী ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তনী আর্মড ফোর্সেসভুক্ত বাঙালি সৈন্য, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশের সদস্যরা বিদ্রোহ করে এবং প্রতিরোধ রচনা করে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বস্তরের লোকজন নিয়ে গড়ে ওঠে এক বিশাল মুক্তিবাহিনী। এর সর্বধিনায়ক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী প্রবাসী সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানি ছিলেন এর প্রধান সেনাপতি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী থেকে পদত্যাগকারী বাঙালী সৈন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট সদস্যদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নিয়মিত সমারিক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তা একটি পেশাগত উৎকর্ষ ও শৃঙ্খলাসহ সুবিন্যস্ত কাঠামোয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবু এর গোড়াপত্তন মুক্তিযুদ্ধের সময়েই[৪২৬]। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী তিনটি শাখা নিয়ে গঠিত, যথা

১. স্থল বাহিনী
২. নৌ বাহিনী
৩. বিমান বাহিনী

সংবিধানের ৬২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পেশাগত শৃঙ্খলা ও আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয়[৪২৭]। সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের উত্তর এবং স্থায়ী সামরিক বাহিনীর (Standing atorny) জন্ম প্রায় একটি সূত্রে গ্রথিত। মধ্যযুগে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি, কেননা মধ্যযুগে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত স্থায়ী বাহিনীও ছিল না। ছিল না প্রাচীনকালেও রোম সম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর খানিকটা সংহত রূপ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকারও সূত্রপাত ঘটে। আজকে সামরিক অভ্যুত্থান বলতে যা বুঝি, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭ অব্দে তার সূত্রপাত ঘটে। পিটোরিয়ান গার্ড (Praetorian Guard) কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনি হস্তক্ষপের সূচনা তখন থেকেই।[৪২৮]

---

[৪২৬] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন, প্রশত প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩৩৬।
[৪২৭] প্রাগুক্ত।
[৪২৮] এমাজউদ্দীন আহমদ; সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২৭।

যতটুকু দায়ী সামরিক কর্মকর্তারা, তাদের উচ্চাভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঠিক ততটুকু দায়ী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদক্ষতার প্রায় ২০০টি অভ্যুত্থানের ঘটনা বিশেষণ করে দেখা গেছে, সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের স্পৃহা জাগ্রত হয়। সামরিক কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পেলে, বিশেষ করে তাদের আর্থিক সুবিধা ক্ষুন্ন হলে, বাংলাদেশের রক্ষীবাহিনী বা পাকিস্তানের ফেডারেল সিকিউরিটি ফোর্সের মতো কোনো সমান্তরাল বাহিনীর জন্ম হলে, অথবা সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ ঘটলে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের চিন্তা করে। কোনো কোনো সমাজে দেখা যায় কৃষক-শ্রমিকের মতো সংগ্রামী গ্রুপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে যখন সামরিক বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করে তখনও ঐ ধরনের মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা যায়। ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা এক কথা, ক্ষমতা দখল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা এটি হিসাব-নিকাশ করে করা হয়। লাভ-লোকসানের মানদণ্ডে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করা হয়। ক্ষেত্রটি উত্তমরূপে প্রস্তুত না হলে কোনো সময় কোথাও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে না।[৪২৯]

পনের আগস্ট এর সামরিক অভ্যূত্থান ঃ

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, যার একটি আওয়ামী লীগ সরকারের মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মাত্র ছয় মাস শাসনামলে এবং বাকশাল পদ্ধতি প্রয়োগের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না করতেই কর্ণেল ফারুকের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একটি অংশ এবং কিছু সংখ্যক অফিসার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অভ্যুত্থানের নেপথ্যনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী, বুর্জোয়া অর্থনীতিতে বিশ্বাস, ধনিক শ্রেণীর দোসর খন্দকার মোশতাক আহম্মদ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়ে সমগ্র বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল শফিউলাহকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দিয়ে ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন।[৪৩০]

অধ্যাপক এস.ই ফাইনারের মতে, উন্নয়নশীল দেশ সমূহে সামরিক অভ্যুত্থানের মূল কারণ হচ্ছে দু'টি **“১. সামরিক বাহিনীর মনোবৃত্তি (Desire) ও ২. সুযোগ (Opportunity)** । সামরিক বাহিনীর সদস্যদের গোষ্ঠীগত বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ বিঘ্নিত হলে কিংবা তারা ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের অনুসৃত নীতি বা

[৪২৯] প্রাগুপ্ত।
[৪৩০] প্রাগুপ্ত।

আদর্শ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি মনে করলে তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রবৃত্তি জন্মে[৪৩১]। তবে এসপি হানটিংটন জোর দিয়ে বলেন, "রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রধান কারণ সামরিক শক্তি নয়, বরং **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা**"[৪৩২]।

আগস্ট অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা মেজর লে. কর্ণেল ফারুক রহমান অভ্যূত্থানের যেসব কারণ দেখান সেগুলোর মধ্যে ছিল-

- আওয়ামী লীগের লোকজন একজন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, কিন্তু শেখ মুজিব তার বিচার না করে তার দলীয় অনুচরদের প্রশ্রয় দেন।
- মুজিবের হাতে সশস্ত্র বাহিনী অপমানিত ও ভয়ানক ভাবে অবহেলিত হয়।
- তার অথর্ব ও দুর্নীতি পরায়ন প্রশাসন দেশকে বিদেশী শক্তির হাতে তুলে দেয়।
- তিনি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, যে ধর্ম জাতিকে আদর্শিক প্রেরণা জোগাতে পারত।
- মুজিব ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও খেয়ালের কারণে গোটা জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন, যে জাতি স্বেচ্ছায় তাকে জনকের আসনে আসীন করেছিল
- দেশের মানুষ যখন অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে তখন তার আওয়ামী লীগ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা দেশের সম্পদ লুট করেছে।[৪৩৩]

তিন নভেম্বরের অভ্যূত্থান ঃ

১৫ আগস্ট এক সমারিক ঘোষণার মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে " সরকারের সকল ও পূর্ণ ক্ষমতা" গ্রহণ করেন। সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। মোশতাক সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তার সরকারের জন্য নতুন কোন সমর্থন ভিত্তি তৈরী না করে আওয়ামী লীগের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল গ্রহণ করেন। তবে মোশতাক সরকার সশস্ত্র বাহিনী সমূহেরও পূর্ণ সমর্থন পায়নি। ফলশ্রুতিতে অভ্যুত্থানের নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত এবং আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে মোশতাক সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর ইতিহাস হলো- তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ সামিরক অফিসারদের মধ্যে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৯৭৫

---

[৪৩১] S. E. Finer, The Man on Horseback (London, 1968).
[৪৩২]S. P. Huntington, Political Order in a Changing Society (London, 1968), p194-196.
[৪৩৩] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ -ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

সালের ৩ নভেম্বর এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন[৪৩৪]। এই সময় খন্দকার মোশতাকের স্থলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা হয় এবং জেনারেল জিয়াকে স্টাফ প্রধান পদ থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি রাখা হয়।

সাত নভেম্বর অভ্যুত্থান ঃ

তিন নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল স্বল্পস্থায়ী। জাসদসহ চীনপন্থী বাম দলসমূহ এবং সামরিক বাহিনীর একাংশ এই অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশে রুশ-ভারত চক্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বলে প্রচার করে। খালেদ মোশাররফ সাধারণ সৈনিকদের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হন। ৭ নভেম্বর প্রত্যুষে ঢাকায় সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার কয়েকজন সঙ্গীসহ তাকে হত্যা করে। তার জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত করেন। জিয়া প্রথমে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করলেও সামিরক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার কারণে সেই পদ থেকে সরে দাড়ান এবং একজন নিরপেক্ষ নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি রূপে মেনে নেন। তবে প্রকৃত ক্ষমতা স্টাফপ্রধান হিসেবে জিয়ার হাতেই থেকে যায়। আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানান। তবে চীন পন্থি বাম গোষ্ঠীগুলো এ ব্যপারে বেশী সোচ্চার ছিল। ন্যাপ নেতা মাওলানা ভাসানী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সামরিক সরকারকে সমর্থনের জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান[৪৩৫]। বিভিন্ন পথ পরিক্রমার মধ্যদিয়ে জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করে ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল সরাসরি রাষ্ট্রপতির দখল করেন।

জিয়ার হত্যাকান্ড ও আবুল মঞ্জুর ব্যর্থ অভ্যুত্থানঃ

এরপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে সেনাবাহিনীর প্রায় ২০ সদস্যের একটি বিদ্রোহী গ্রুপ কর্তৃক নিহত হন । চট্টগ্রাম গ্যারিসনের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর এর নের্তৃত্বে একটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয় এবং কার্যত তিনি জিয়া হত্যার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু জিয়ার মৃত্যুর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জেনারেল মঞ্জুর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। সরকারের অনুগত সেনারা পলায়মান মঞ্জুরকে ধরে ফটিকছড়ি থানায় নিয়ে আসেন। সেখানে মূলত তার আগ্রহে থানার কর্মকর্তা জেনারেল মঞ্জুরের একটি জবানবন্দি টেপরেকর্ড করেন। মঞ্জুর

---

[৪৩৪] দেখুন , মতিউর রহমান “ বালাদেশ সেনাপ্রশসন” প্রথম আলো, ঈদ সংখ্যা-২০০৪, পৃষ্ঠা-৪২৮।

[৪৩৫] Holoday, 16 November and 21 December, 1975.

তাকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু তা না করে পুলিশ দু'জন বিদ্রোহী সেনা অফিসারসহ মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রেরণ করেন এবং সেনানিবাসে প্রবেশের পরপরই রহস্যময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে হত্যা করা হয়[৪৩৬]।

'৮২-র সামরিক অভ্যুত্থান ঃ

'৮২-র সামরিক অভ্যুত্থান। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক শাসন প্রবর্তনের কারণ হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলে, 'দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যার ফলে অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেসামরিক প্রশাসন কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বস্তরে সীমাহীন দুর্নীতি প্রসার লাভ করেছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে সম্মানজক জীবনযাপন বিপন্ন হয়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে।' তিনি আরো বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে এবং সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংকট হতে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।[৪৩৭]

এক এগারোর কোমল অভ্যুত্থান ঃ

প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যখন সাররিক বাহিনীর সমর্থন-সহানুভূতি লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তখন এক-এগারোকে ঘিরে এক ধরণের নতুন মেরুকরণের সূত্রপাত হয়। সংবিধান অনুসারে ২০০৭ সালের প্রারম্ভে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান আবশ্যক ছিল। বিএনপির নের্তৃত্বাধীন তৎকালীন ক্ষমতাসীন ৪ দলীয় জোট তাদের অনূকলে নির্বাচনী মাঠ এমন ভাবে সাজায় যা বিরোধী দলসমূহ নিজেদের জন্য মরণ ফাঁদ বলে মনে করে। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রদান উপদেষ্টা ও তদানীন্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জোট সরকারের বলে মনে করে এবং তাদের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশ নিতে অস্বীকার করে। প্রধান উপদেষ্টা সম্পর্কে ঐকমত্যের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমদ নিয়ম ভঙ্গ করে নিজেই প্রধান উপদেষ্টার দয়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ এর নের্তৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও এবং দেশ এক গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। রাষ্ট্রপতি শৃঙ্খলা

---

৪৩৬ সংবাদ ও ইত্তেফাক ৩১ মে, ১,২,৩, জুন ১৯৮১।
৪৩৭ ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, '৯১, পৃষ্ঠা ১৮৫।

পুনরুদ্ধারে সেনাবহিনী তলব করেন। এমনাবস্থায় সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন ইউ আহমদ ১১ জানুয়ারী, ২০০৭ নৌ ও বিমান বাহিনীর সমভিব্যাহারে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ ও দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে আসন্ন ২২ জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন স্থগিত করার পরামর্শ দেন। জেনারেল মইন ইউ আহমেদ একাধিকবার ঘোষনা করেন যে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলে আগ্রহী নয়। তবে কার্যক্ষেত্রে ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। এক-এগারোর পর তিন মাস যেতে না যেতেই মইন বলেন- "We do not want to go back to an elective democracy where crruption in sociaty becomes all pervasive and political criminalization threatens the very survival and interity of the state".[438]তিনি সর্বস্তরে নতুন নেতৃত্ব এবং শাসনব্যবস্থা পুনরাবিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন। সরকার সমর্থক কিছু বুদ্ধিজীবী নতুন নিরাপত্তা কাঠামো এবং ভিন্ন রকম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে ওকালতি করেন[৪৩৯]। সম্প্রতি সামিরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছূ তথ্য প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন- তারা নির্বাচন না দিয়ে ১০ বছর ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন। বিনিময়ে তাকে প্রধানমন্ত্রীর স্টেটাস দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন [৪৪০]। বর্তমানে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অধীনস্থ হিসেবেই গণতান্ত্রিক সরকারের অনুগত রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রশাসন, সরকার ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর ভিন্ন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা নেই, বিশেষ কোনো অবস্থানও তারা নিতে পারে না। কিন্তু প্রয়োগের নির্দেশ আসছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে। এটিই এখন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক সংস্কৃতিক স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে এটিও উলেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী শুধু যে, অভ্যূত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইনের মাধ্যমে দেশ শাসন করেছে তাই নয়, তাদের একজন ক্ষমতা দখলের আগে এই দাবিও উত্থাপন করেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য শাসন প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর নির্দিষ্ট ভূমিকাও সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা উচিৎ (New York Times, 14 November 1981) । তার নিজের কথায়- Our Military is an efficient, well-disciplined and most honest body of truly dedicated and organized national force. Potentials of such an excellent force can be effectively utilized for productive and nation-building purpose in addition to

---

[৪৩৮] বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলনে জেনারেল এম. ইউ. আহমদ উপাস্থাপিত মূল প্রবন্ধ "The Challenging Interface of Democracy and Society" (ঢাকা, ২ এপ্রিল, ২০০৭), থেকে উদ্ধৃত।
[৪৩৯] বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলনে রাষ্ট্রিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আতাউর রহমানের স্বাগত ভাষণ।
[৪৪০] জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষ, দেখুন যুগান্তর ও আদাদের সময়, ২৯ জুন, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

its role of national defense (Bangladesh Observer, 29 November, 1981, The Holiday,6 december, 1981)[441]

সামরিক হস্তক্ষেপ সব সময় আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বিকাশের পথকে সংকুচিত করেছে যার সামগ্রিক দায়িত্ব রাজনৈতিক দল ও সরকার প্রধানদের নিতে হবে।

৮.১৫ দলবাজি ও আমলাতন্ত্র

আক্ষরিক অর্থে 'ব্যুরোক্র্যাসি' (Bureaucracy) বা আমলাতন্ত্র বলতে কর্মকর্তগণের দ্বারা শাসনকেই বুঝায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত অর্থে আমলাতন্ত্র কথাটির এক মন্দ বা নিন্দাসূচক অর্থও রয়েছে। সত্যিকার অর্থে আমলাতন্ত্র বলতে নিযুক্ত কর্মচারিগণের এক বৃহদায়তন সংগঠনকেই বুঝায়, যারা জটিল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সুব্যবস্থিত ভাবে পরস্পর থেকে কাজ করে যান[৪৪২]।

আমলা ব্যবস্থা এত বেশি সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, এটি সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের একটি ও আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির চিত্রটি এক এক সমাজে ও সংস্কৃতিতে এক এক রকম ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকার আমলাতন্ত্রের ধরনে যে চিত্রটি পাওয়া যাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের আমলাতন্ত্রের ধরনের অনেক ক্ষেত্রে তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব বাস্তব কারণে প্রশাসনের যেমন সর্বজনীন নীতি প্রদান সম্ভব হয়নি, তেমনি আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতিরও সর্বজনীন তত্ত্ব

[৪৪১] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলদেশের রাজনীতি সমস্যা ও সম্ভবনা, শিকড়, প্রথম প্রকাশএকুশে বই মেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-৬৪।
[৪৪২] নাথ, বিপুল রঞ্জন , সরকারের সমস্যাবলি , বুক সোসাইটি,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-২৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান সম্ভব নয়।[৪৪৩] তবে আমলতন্ত্র ও রাজননীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান- প্রফেসর D. Waldo-র মতে, লোক প্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে যে সম্পর্ক তা মাতৃগর্ভের শিশুর সঙ্গে শিশুমাতার সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়।[৪৪৪]

গণতান্ত্রিক ব্যস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরকারি নীতি নির্ধারণ করেন, আর প্রশাসন তথা আমলাদের দায়িত্ব হলো সেই নীতি বাস্তবায়িত করা। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন রাজনীতিক ও আমলাদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক। উভয়ই নিজ নিজ পরিসীমার মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। আমলারা যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারি নীতি কার্যকর করবেন, রাজীতিকরা তেমনি দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির অধীন মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি হওয়া প্রয়োজন। এ সবরেই মূল উদ্দেশ্য হবে জনকল্যাণ।

এই আমলাতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। **এক.** সামরিক আমলাতন্ত্র, **দুই.** বেসামরিক আমলাতন্ত্র। সামরিক আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের তথ্য ও উপাত্ত সীমিত এবং এ বিষয়ে এই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বলার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই মূল আলোচনা বেসামরিক আমলাতন্ত্র সম্পর্কেই করা সমীচীন হবে।[৪৪৫]

আমলাতন্ত্রকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেশজ লোকজ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারি। বাংলা ভাষায় আমলাতন্ত্র শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আমলা অর্থই হচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা, অহমিকতা, ক্ষমতা ইত্যাদি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, বিগত ঔপনিবেশিক আমলে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক আমলে আমলাতন্ত্রকে জনগণ দেখেছে বিদেশী প্রভুর প্রতিভু হিসেবে। সাধারণ মানুষ আমলাদের তাই মনে করে ফাইল গায়েবকারী, লাল ফিতার দৌরাত্মকারী, অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপকারী, নিপীড়ক গোষ্ঠী হিসেবে, আবার কখনও বা কার্যক্ষেত্রে তারা কোনো কোনো আমলাকে অকর্মণ্য, অলস, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম, আয়েশি ও বদমেজাজি বলে মনে করে। তবে বাংলাদেশ আমলে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঐসব ধারণা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হচ্ছে। স্বাভাবিক, সুন্দর সৎ সতর্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমলার আগমনও বর্তমানে ঘটছে।

[৪৪৩] হোসাইন কবির, আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদক মুস্তফা মজিদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, এপ্রিল, পৃষ্ঠা ৬০।
[৪৪৪] প্রাগুপ্ত।
[৪৪৫] মুস্তফা মজিদ, লোক আমলাতন্ত্র ঃ তাত্ত্বিক ও বাংলাদেশ (ক) প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯১ইং, পৃ: ১৪৭।

আমলাতন্ত্রের নীতি প্রণয়নকারী সচিবালয়, বাস্তবায়নকারী কর্পোরেশন, অধিদপ্তর ইত্যাদি এবং মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় সংগঠন সমূহের মধ্যে অনেক সময় যথার্থ সমন্বয় ঘটে না। কোনো কোনো আত্মম্ভরী বা অতি উৎসাহী আমলা কোনো কোনো সময়ে নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করে প্রকারান্তরে উন্নয়নের পরিবর্তে অব উন্নয়ন ঘটান। আমলাদের মধ্যে সহজাত ভাবেই ক্ষমতালিপ্সা বিদ্যমান। আমলারা অনেক সময় সচিব থেকে উপদেষ্টা, নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যন্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিত্বের সংঘাতে লিপ্ত হন। একজন বুদ্ধিজীবী কিছুদিন আগে মন্ত্রী এবং সচিব সম্পর্কের যে ইতিবৃত্ত লিখেছেন, তা থেকে আমরা সম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি। প্রায়শই সচিব-মন্ত্রীর দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়। জেলা পর্যায়ের কোনো রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে ওসি, ডিসি এবং ইউএনওদের বদলির ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিবাজ, সমন্বয়ে অক্ষম আমলা এবং অসৎ, অনভিজ্ঞ, শিল্পাচারবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ঘটনা ঘটে। এমনকি কর্মকর্তাকে স্যার না বলার কারণে নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে কয়েকজনকে, এ রকম খবর প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪৬] বাংলাদেশের আমলাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ দুর্নীতির। ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী কমিশনারগণ ঘুষ খান, ঘুষের বখরা নিয়ে উকিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিরোধে অবশেষে একযোগে আদালত বর্জনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত সরকারের আমলের শেষের দিকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, তাঁর সব ম্যাজিস্ট্রেট ঘুষ খান। ভিসি, এসপি এমনকি জেলা জজদের বিরুদ্ধের ঘুষের বিস্তর অভিযোগ দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে রয়েছে, আর বড় বড় সচিব, বড় বড় কমর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগও বড় বড় কোটি কোটি টাকা লোপাট করার অভিযোগ। উভয় পক্ষের প্রকাশিত শ্বেতপত্র দুটো পড়লে এসব তথ্য পাওয়া যাবে।[৪৪৭]

স্বজনপ্রীতি হচ্ছে আমলাতন্ত্রের একটা ব্যাধি। পৃথকভাবে বসবাস করলেও তারা এ দেশেরই মানুষ। সুতরাং স্বজনরা তাদের প্ররোচিত করেন। "মামার জোরে" তারা চাকরি নেন, "চাচা-ভাতিজাঃ বিজনেস করেন। এভাবে স্বজনরা লাইসেন্স পারমিট, টেন্ডার বাগিয়ে নেন বা বাড়ি গাড়ি দখল করেন। এ রকম আমলাদের পরিবার-পরিজন সংশিষ্ট অসংখ্য সংবাদ ছাপা হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয়, কেবল আমলারাই সমাজের ওইসব অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অপরাধ প্রবণতা গুলো করেন। সমাজ যে "অপরাধের সমুদ্রে" ডুবে আছে, তারই সাহসী অংশীদার আমলাদের স্বজনরা। এদের সামলানো দরকার।[৪৪৮]

---

[৪৪৬] ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, কলাম, আমলাতন্ত্রের আমলনামা, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃঃ ৫।

[৪৪৭] প্রাগুপ্ত।

[৪৪৮] প্রাগুপ্ত।

এছাড়া তোষামোদ, তোষণনীতি, চাটুকারিতা, অতিমাত্রায় বড়সাহেবপ্রীতি, তদবির, হয়রানি রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী এলিট প্রীতি, লাল ফিতার বন্ধন, প্রভুসূলভ মনোভাব, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি দোষেও আমলারা দুষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে। অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে সরকারি দল কর্তৃক আমলাদের দলীয়করণের অশুভ পাঁয়তারা যা জাতির জন্য শুভ নয়, সঙ্গতও নয়। মানুষ চাইলেই একদিনে সব পরিবর্তন করতে পারে না। এর জন্য যথেষ্ট সময় ও যথার্থ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় বেসরকারি আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের নানাবিধ সমালোচনা থাকা সত্বেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। হাবার্ট মরিসন যথার্থতই বলেছেন যে, " আমলাতন্ত্র হল সংসদীয় গণতন্ত্রের উপহার স্বরূপ"(Bureaucracy is the price of parliamentary democracy) ।[৪৪৯]

১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধান করা হয় যে, সরকারি কর্মচারীগণ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী চাকরীতে বহাল থাকবেন। এমনকি. নিয়োগকারী কর্মকর্তা কোন কারণ প্রদর্শন না করে যেকোন কর্মচারীকে অপসারণ, পদচ্যুত কিংবা পদাবনমিত করতে পারবেন (অনুচ্ছেদ : ১৩৫)। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৯ নম্বর আদেশের অধীন আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে প্রায় ৬০০০ বেসামরিক কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হন। পরিকল্পনা কমিশন, সরকারি শিল্পকারখানা, পাবলিক কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারির পরিবর্তে অনেক একাডেমিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়। উপরন্ত মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকারের অধীনে কাজ করেন এমন সামরিক বেসামরিক কর্মচারিদের ২ বছরের জ্যৈষ্ঠতা ও পদোন্নতির সুবিধা দেয়া হয়। ফলে সাধারণ আমলাদের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থার অধীন তাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু সে সুযোগ ছিল সীমিত ও ওপর থেকে আরপিত। ফলে আমলাদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। আমলাতান্ত্রিক অসোন্তষ ও দ্বন্দ্ব ছিল বঙ্গবন্ধু সরকার উৎখাতের অন্যতম কারণ।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাসনামলে আমলাদের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যে, প্রশাসনের একটি বড় অংশ সরকারের আদেশ অমান্য করছে। তিনি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়ে বলেন, আমলাতন্ত্র নয়, যে কোন অবস্থায় রাজনতিকিরাই দেশ শাসন করবে। কিন্তু এর ৫০ দিন পরেই তিনি মন্ত্রীত্ব হারান। রাষ্ট্রপতি জিয়া আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চাপ অগ্রাহ্য করতে পারলেও সামরিক আমলাদের চাপের মুখে বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ অব্যাহত রাখেন। ফলে বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে

[৪৪৯] ভুঁইয়া, মো: আবদুল ওদুদ, আধুনিক সরকারের সমস্যাবলী, গোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা , প্রথম প্রকাশ , এপ্রিল ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩১৭।

অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আমলাতন্ত্রের উচ্চ পর্যায়ে কোন্দলের কারণে প্রশাসনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দক্ষতা ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের শাসনামলে মেধা ও যোগ্যতার প্রতি তোয়াক্কা না করে পদোন্নতি লাভের জন্য বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

১৯৮৬ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর জেনারেল এরশাদের মন্ত্রীপরিষদের রাজনীতিকদের আধিক্য থাকলেও দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনে সামরিক আমলারাই নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এরশাদ সচিবালয়, পাবলিক কর্পোরেশন, ব্যাংক, দূতাবাস ও পুলিশ প্রশাসনে বহু সংখ্যক সামরিক ব্যক্তিকে নিয়োগদান করেন এবং ক্যাডার ও কর্মে শূণ্য পদে ১০ শতাংশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিকীকরণের এই নীতি বেসামরিক আমলাদের মধ্যে অসোন্তষ বৃদ্ধি করে। ১৯৮৮ সালের প্রারম্ভে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সমিতির এক প্রস্তবে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিকীকরণের এই অশুভ প্রয়াস প্রচলিত আইন-কানুন ও সংবিধানের স্বীকৃত সকল নাগরিকের জন্য সমতা নীতির পরিপন্থী। সমিতি সামরিক বাহিনীর অনুকূলে সংরক্ষণমূলক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ ও তা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। দেশের সমকালীন রাজনতিক-সামাজিক ঘটনা ও ধারার প্রেক্ষিতে ইপ্সিত বহুবাচনিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর আদর্শ সামনে রেখে, সিভিল সার্ভিস সমিতি তার সকল সদস্যকে সকল প্রকার চাপ অগ্রাহ্য ও প্রতিহত করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ও দৃঢ়তার সাথে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব সম্পাদনের অনুশাসন প্রদান করে এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে[৪৫০]।

বেগম জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির কারণে যখন নির্বাচন প্রতিষ্ঠনটি অকার্যকর হয়ে পড়ে তখন নিরপেক্ষ তত্তবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলসমূহ আন্দোলনের অংশ হিসেবে হরতাল ও রাজপথে সরকার বিরোধী জনতার মঞ্চ স্থাপন করলে সচিবসহ বহু বেসামরিক কর্মকর্তা তাতে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জনতার মঞ্চে যোগদানকারীদের অনকে পুরস্কৃত করেন। সচিব ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ও পরে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং অপর এক সচিব সফিউর রহমানকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বিএনপি ২০০১ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এলে এই দুই জনসহ ৭ জন সাবেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে এবং সচিব থেকে উপসচিব বা সমমর্যাদার ৭৬ জনপ্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ৬৫ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে চাকুরিচ্যূত করা হয়। অথচ ১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সরকারী

[৪৫০] সিভিল সার্ভিস সমিতির তৎকালিন সভাপতি কাজী ফজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নামে প্রচারিত " প্রশাসন সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ" ১৭.০১.১৯৮৮ শীর্ষক লিফলেট অবলম্বনে।

কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়নি বিএনপি সরকার। শেখ হাসিনার সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মূখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীসহ অনেককে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে। প্রয়াত অর্থমন্ত্রী যথার্থই বলেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে বিগডিভিশন হয়ে গেছে। মিউজিকাল চেয়ারের প্রশসনের কাজ করেছে। কিছূ কর্মকর্তা আওয়ামী লীগের, কিছু বিএনপির, কিছূ নিরপেক্ষ এবং এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে[৪৫১]।

সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা বাছাইয়ে প্রধান সংস্থা সরকারি কর্ম কমিশন এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগদানের সময় তাদের দলীয় পরিচয় বা আনুগত্য প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ফলে পিএসসি সততা ও নিরপেক্ষতা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বিসিএস পরীক্ষাসহ কয়েকটি নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমনকি বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে ২০০২ ও ২০০৪ সালে দু'দফায় মোট ৪৩ জন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারকে এএসপি চাকুরিচ্যূত করা হয় জীবনে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে[৪৫২]।

প্রশাসনে নিজেদের লোককে পরুষ্কৃত করার অন্যতম পদ্ধতি হলো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। চাকরির নিয়মিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কোন সরকারি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু আজকাল রাজনৈতিক বিবেচনায় এই নিয়মের অপব্যবহার হচ্ছে এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ২০০০ সালে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৭৭ জন। ২০০৩ সালের আগস্টে এ সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ২৪৫ জনে[৪৫৩]। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, জোট সরকারের প্রথম দুই বছরে ১৯৫ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব , ২৭ জন সচিব, ১১ জন অতিরিক্ত সচিব ও ১৫৭ জন অন্যান্য কর্মকর্তা[৪৫৪]। প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কারণে নিন্মস্তরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বিলম্বিত হয়। সরকারের প্রতি তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনকে দলীয় করণের আর একটি উপায় হলো বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে কর্মকর্তা নিয়োগ বা ওএসডি প্রথা। আগে ওএসডি কর্মকর্তদের এক ধরণের সম্মান ছিল। প্রশিক্ষণের জন্য কেউ বিদেশ গেলে অথবা কোন পদে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োজনে কাউকে নিজ পদে অতিরিক্ত বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করলে তাকে ওএসডি বলা হতো। কিন্তু আজকাল ওএসডি প্রথাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে

[৪৫১] প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি, ২০০২।
[৪৫২] প্রথম আলো , ৬জুন, ২০০২।
[৪৫৩] যুগান্তর, ১০ অক্টোবর, ২০০৪।
[৪৫৪] প্রথম আলো, ২৯ নভেম্বর, ২০০৩।

কর্মকর্তাকে সরকারের পক্ষের মনে হয় না তাকে শায়েস্তা করতেই এ অস্ত্র বেছে নেয়া হয়। ওএসডি কর্মকর্তাদের কোন দায়িত্ব বা কাজ থাকে না।তারা বসে বসে প্রতি মাসে বেতন-ভাতা পেলেও মানসিক অস্বস্তিতে ভোগেন। ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ওসডির সংখ্যা ছিল ১৯৪ জন। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ৩৫৫। তবে ২০০৪ সালের অক্টোবরে হ্রাস পেয়ে হয় ২৪১[৪৫৫]।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, জোট সরকারের দলীয়করণের কারণে রাষ্ট্র চালাতে কষ্ট হচ্ছে[৪৫৬]। কিন্তু তিনি নিজের পছন্দমতো প্রশাসন সাজাতে গিয়ে জোট সরকারের নীতি বা কৌশল অনুসরণ করেন। জোট সরকারের আমলে ৫২৩ ক্যাডার কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত ও পদোন্নতি বঞ্চিত হন। এদের মধ্যি ১১১ জনের বাধ্যতামূলক অবসর বাতিল করে চাকরিতে পুর্নবহাল, ৪০৪ জনকে পদোন্নতি প্রদান এবং ৮ জনকে অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়[৪৫৭]। এছাড়া বাধ্যতা মূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত ২৫ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে ভুতাপেক্ষ পদোন্নতি দেয়া হয়[৪৫৮]।

প্রশাসকে দলীয় করণের আর একটি পদ্ধতি হলো গণহারে পদোন্নতি দান। মহাজোট সরাকরের প্রথম তিন বছরে দু'দফায় প্রায় ১১৫০ জন ঊর্ধ্বতন সিভিল সার্ভেন্টকে পদোন্নতি দেয়া হয়। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম দফায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৪৯৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৬০ জন যুগ্ম সচিব, ১৬৩ জন উপসচিব ও ২৭১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব যথাক্রমে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ও উপসচিব পদে উন্নীত হন। এই পদোন্নতির ফলে ১০৮টি পদের বিপরীতে অতিরিক্ত সচিব হন ১৮৬ জন, ৪৩০টি পদের বিপরীতে যুগ্ম সচিব হন ৪৯৮ জন এবং ৮৫৫টি পদের বিপরীতে উপসচিবের সংখ্যা দাড়ায় ১৩১৭ জন। নির্ধারিত অতিরিক্ত সকল কর্মকর্তাকে পদায়নের জন্য ওএসডি হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করতে বলা হয়[৪৫৯]।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রসাশনের উচ্চতর তিন স্তরে রেকর্ড সংখ্যক মোট ৬৪৯ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। এর মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত সচিব পদে ১২৭ জন, যগ্ম সচিব পদে ২৬৪ জন এবং উপচিব পদে ২৫৮ জন। এর ফলে ৮৩০টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে উপসচিবের সংখ্যা দাড়ায় ১৫০০, ২৫০টি পদের বিপরীতে যুগ্ম সচিবের সংখ্যা হয় ৫০০ এবং ১০৮টি পদের বিপরীতে অতিরিক্ত সচিবের সংখ্যা হয় ১৪৮ জন। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তারা উচ্চতর পদ পেলেও পদ শূণ্য না থাকায় পূর্বতন

[৪৫৫] যুগান্তর, ১০ অক্টোবর, ২০০৪।
[৪৫৬] Daily Star, 5 March, 2009.
[৪৫৭] যুগান্তর, ২৫ নভেম্বর, ২০০৯।
[৪৫৮] যুগান্তর, ২৮ আগস্ট, ২০০৯।
[৪৫৯] Daily Star, 08 September , 2009.

পদের দায়িত্ব সম্পাদন করেন[৪৬০]। অভিযোগ ওঠে ৬ শতাধিক কর্মকর্তা পদোন্নতি পেলেও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ৫ শতাধিক কর্মকর্তা পদোন্নতি বঞ্চিত হন।

বিগত জোট সরকারের আমলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা ছিল দুই শতাধিক। মহজোট সরকারের আমলে ২০১০ সালে এই সংখ্যা ১১৫ তে হ্রাস পেলেও ২০১১ সালের মার্চ মাসে তা আবার দুই শতের কোঠায় বৃদ্ধি পায়[৪৬১]। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বড় দলের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে প্রশাসনে পদোন্নতি বঞ্চনা, ওএসডি, বাধ্যতামূলক অবসর ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছে যায়। তার বাইপ্রডাক্ট হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পর্যায়ে দলবাজির প্রবণতাও বেড়ে যায়। নির্দলীয় কর্মকর্তারা দেখেন, যারা কোনো দলের সমর্থক তারা নিজেদের দল ক্ষমতায় গেলে কিছু না কিছু পায়, কিন্তু কোন সরকারই নির্দলীয়দের মূল্য দেয় না।এ কারণে অনেকে দলবাজিতে জড়িয়ে পড়েন। অনেক কর্মচারী রয়েছেন যারা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক গুরুদের তোয়াজ করে নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ আদায় করতে অধিক মনোযোগী [৪৬২]। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি সবাইকে নিয়ে নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন চালাতে দৃঢ় সংকল্প হন তাহলে সরকারি কর্মকর্তরাও দলবাজির ঊর্ধ্বে থাকতে মনোযোগী হবেন বলে আশা করা যায়।

এভাবে যখন যে সরকার সে সরকার তার সার্থের জন্যে প্রশাসনকে যে ভাবে চরকির মতো নিজেদের দিকে গুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করছে তাতে করে দেশ, জনগণ সর্বপরি গণতন্ত্র উপেক্ষিত হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক যাত্রা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

৮.১৬ বাংলাদেশে ব্যক্তিপ্রাধান্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

একজন সমাজ গবেষক বিগত এক যুগের একটি সমীক্ষা বের করেছেন। তাতে দেখা যায় অরাজকতা, অস্থিরতা, কপটতা, মাস্তানবাদ ইত্যাদি অর্জিত অপগুণাবলির মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু হচ্ছে ব্যক্তিপ্রাধান্য।[৪৬৩]

ফরাসি জাতির উদ্দেশ্যে এক বার নেপোলিয়ন বলেছিলেন-æI am not only the soldier’s Emperor. I am Emperor of the workers and peasants. I am the man of the people”[৪৬৪]. এভাবে তিনি একজন জনগনের নেতা বা জননেতা হবার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তি প্রাধান্যেকে মূখ্য করেননি। তাবে

[৪৬০] Daily Star, 09 February , 2012.
[৪৬১] Daily Star, 27 March , 2011.
[৪৬২] যুগান্তর , ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২।
[৪৬৩] প্রফেসর ড. আব্দুল লতিফ মাসুম জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট, পৃষ্ঠা ১৪৮, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ২০০২ইং।
[৪৬৪] আহমদ, ড. এমাজউদ্দঈন, বাংলাদেশ: সম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতি প্রকৃতি, হাসি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ -সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রষ্ঠা: ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতিকদের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন তারা জানেন বাংলাদেশের রাজনীতিকদের আর কিছু না থাক, তাদের রয়েছে সীমাহীন রাজনৈতিক লোভ, আর রয়েছে ক্ষমতার অন্ত-হীন ক্ষুধা । এ দেশের রাজনৈতিকদের রাজনৈতিক আঙ্খাক্ষা এবং ক্ষমতা-প্রীতির কোনো সীমা নেই। রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, জনসংযোগ সবকিছুই যেন তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সরল রাজপথ রূপে। ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক বিচার, জাতীয় স্বার্থ বা জনস্বার্থেরর বিবেচনা, সততা নৈতিকতা- সব এ ক্ষেত্রে মৃত। জীবন্ত শুধু ব্যাক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ। এ জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত[৪৬৫] ।

আসলেই সমাজ গবেষকের মন্তব্যটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ন্যক্কারজনক ব্যক্তি প্রাধান্য যেন পাথরের মতো চেপে বসে আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন আওয়ামী লীগে অর্থই যেন শেখ মুজিব বা শেখ হাছিনা, বিএনপি'র অর্থও তেমনি জিয়াউর রহমান বা খালেদা জিয়া, ঠিক তেমনি জাতীয় পার্টি মানেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। এমন কি বাংলাদেশে ছোট-বড় যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে সেগুলোর প্রায় সবই কোনো না কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামকে বলা যায়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে পশ্চিমা বিশ্বের মতো তৃণমূল থেকে গড়ে ওঠা নেতা বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিত্ব নেই। আধুনিক রাজনীতির অন্যতম বিশেষক **ম্যাক্সওয়েল** মনে করেন যে, খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের মতোই অবস্থান জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের। এসব দেশের নেতারা দৈবচক্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার মালিক হন। জনগণ তাদের প্রতি সম্মোহিত। তাদের ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব, বীরত্বের প্রতি জনগণ প্রশ্নহীন, আস্থাশীল। এভাবে চরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এক একজন নেতা বিশ্বজোড়া নাম করছেন। ভারতের গান্ধীজি, পাকিস্তানের জিন্নাহ, বার্মার উনু, ইন্দোনেশিয়ার সুর্কন, ঘানার নক্রুমা, মিসরের নাসের, ভিয়েতনামের হোচিমিন এবং বাংলাদেশের এ কে ফজলুল হক, শেখ মজিবুর রহমান, এবং জিয়াউর রহমান এমন ধরনের নেতা এসব দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের এই নেতারা মৃত্যুর পরও 'অমর ভূমিকা রাখছেন'।[৪৬৬]

১৯৮৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা অল্প বয়সে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসেন। বঙ্গবন্ধুর পর আওয়ামী লীগের মূলধন হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তার কন্যা শেখ হাসিনা[৪৬৭] । তারপর শেখ ওয়াজেদ জয়। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহামনের শাহাতের পর বেগম খালেদা জিয়া দলের কান্ডারী হন এক্ষেত্রে দলীয় গণতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ হয়নি জিয়া ব্যক্তির প্রাধান্যেই

---

[৪৬৫]আহমদ, ড. এমাজউদ্দঈন, গণতন্ত্রের বিকাশ: বাংলদেশে গণতন্ত্র,মৌলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃষ্ঠা-৮৬।

[৪৬৬] প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭।

[৪৬৭] হক, ডঃ আবুল ফজল, বাংলাদেশর শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স, রংপুর, সপ্তম পনমুদ্রণ: জুন-২০০০, পৃষ্ঠা -২৪৩।

বেগম জিয়া তারপর অবশ্যই তারেক জিয়া। এভাবেই চলবে বংশানুক্রমে। কিন্তু বাংলাদেশে কেবল দলের মধ্যে ক্ষমতার ব্যক্তি করণ করা হয় না। গোটা রাজনৈতিক পদ্ধতিটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠে[৪৬৮]। বাংলাদেশের এই ব্যক্তি প্রাধান্যের রাজনীতির কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র বারবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে-যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হলো, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগীতার মনোভাব। সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক একেবারে বৈরী- ১৯৯১ সালে এক সাপ্তাহিকীতে উলেখ করেছে-সংসদ অধিবেশনে এক নেত্রী থাকলে আর এক নেত্রী থাকেন না। এক নেত্রী বক্তৃতা দিলে আর এক নেত্রী মুখ ঘুরিয়ে বসেন। সংসদে দুজন সামনাসামনি বসেন কিন্তু কোন দিন চোখাচোখি হতে দেখা যায় না। দুজন তাকিয়ে থাকেন দু'দিকে[৪৬৯]। ব্যক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধন করা পর্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে- ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ করেন, বিল চরম একনায়কত্বের বিল, এতো ভয়াবহ যে ভাবতেও রক্ত তুষার হয়ে উঠে। সংসদে এটি নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি, কেননা আলোচনা করা সম্ভব ছিলা না । মাত্র ১ ঘন্টায় বাংলাদেশের মহান সংবিধানকে হত্যা করা হয়। ওটা ছিল হত্যাকান্ড, দীর্ঘ ছুরিকার পর ছুরিকা চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হয় বাংলাদেশের সংবিধানকে। পড়ে থাকে সংবিধানের মরদেহ। এদিন মৃত্যূ হয় সংসদীয় পদ্ধতির, চালু হয় এক রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি। এ পদ্ধাতিতেও গণতন্ত্র চলতে পারে, যেমন চলছে যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু এত এমন সব বিধান তৈরি করা হয় যার প্রতিটি ধারা জনগণবিরোধী। একজনকে সর্বশক্তিমান করার জন্যে এটি করা হয়। এটি একজনকে রাষ্ট্রবিধাতা করার শোচনীয় পুন্যগ্রন্থ। অবশেষে মুজিব হন রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের বিধাতা, দেশের স্থপতি জননেতা দেখা দেন মহা একনায়ক রূপে[৪৭০]। এই মহানায়কদের কারণে মুক্তচর্চা তথা গণতন্ত্র মুখ থুবরে পরে যেমন হুমায়ূন আজাদ বলেন- আমাদের নেতারা তো মহাশক্তিমান, বিধাতা তাদের শক্তিমান করেছে। আমি যখন এ বই লিখছি, কারো কারো সঙ্গে কথা বলছি, তারা ভয়ে কেঁপে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছেন, সাবধান জিয়া, খালেদা জিয়া, তারেক, আর বিএনপি সম্পর্কে কোনো কড়া কথা লিখবেন না, সাবধান। তাদের চোখে মুখের আতঙ্ক দেখেই বুঝতে পারি কী ভয়ানক গণতন্ত্রে বাস করছি[৪৭১]।

ব্যক্তি প্রাধান্যের রাজনীতিতে দলীয় নেতা কর্মীগণ লেজুড় ভিত্তিক রাজনীতিতে অভ্যস্ত হয়- যার যার দলীয় আদর্শ ধারণ করা বা তা বাস্তবায়ন দোষের নয় তবে সঙ্কট তখনই যখন দলীয় সমর্থনে রাজনীতি চর্চার বদলে দলীয় লাঠিতে পরিণত হয় তারুণ্য। এরা গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝতে চায় না। মূল দলের নেতৃত্বের মতো

[৪৬৮] প্রাগুক্ত-২৪৭।
[৪৬৯] খবরের কাগজ, ১১ জুলাই, ১৯৯১।
[৪৭০] আজাদ, হুমায়ুন, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম,রাজনৈতিক প্রবন্ধ সমগ্র, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৬১০।
[৪৭১] প্রাগুক্ত- ৫৮৯-৫৯০।

এরাও পরমত সহিষ্ণুতাকে পরিত্যাজ্য ঘোষনা করে। মূল দল যেমন কপটতার আশ্রয় নিয়ে বলতে থাকে "ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়"। সেদিক থেকে লেজুড় রাজনীতির সাথে যুক্ত কর্মী বাহিনী কপটতা না করে প্রভুদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যক্তি বন্দনাই করে। তাই এরা স্লোগানে নিজেদের পরিচয় দেয় এভাবে-বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, জিয়ার সৈনিক, খালেদা জিয়ার সৈনিক, শেখ হাসিনার সৈনিক আর আগমীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক জিয়ার এবং শেখ ওয়জেদ জয়ের এর সৈনিক[৪৭২]।

ব্যক্তি প্রাধান্যের রোষানলে একজন ড. কামাল হোসেনের মত নেতাকে হারিয়ে যেতে হয়। একজন প্রবল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী আব্দুর রাজ্জাককে ফিরে যেতে হয় আপন ঘরে। একজন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী লাভ করেন লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা। অপরপক্ষে একজন শাহ মোয়াজ্জেমকে অনুতাপ করতে হয়, কে এম ওবায়েদুর রহমানকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় এবং একজন মেজর কামরুলকে পরাজিত হতে হয়।

তরুণদের, বিশেষত ছাত্রনেতাদের এই ব্যক্তিসর্বস্বতা সমস্ত লৌকিকতা অতিক্রম করেছে। ছাত্রনেতার 'কিংবদন্তির মহানায়ক", "রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা", "সময়ের সাহসী সন্তান", "সূর্যসারথী", "অকুতোভয়", "রণতূর্য" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত হচ্ছেন। গ্রেপ্তার বা হুলিয়া ইতিবাচক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের গ্রেপ্তার বা মুক্তি উপলক্ষে ছাপা হচ্ছে হাজার হাজার রঙিন পোস্টার। এ দেশের ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল সময়ে ছাত্ররা স্লোগান দিত আদর্শের জন্য, কর্মসূচির জন্য, আন্দোলনের জন্য। এখন স্লে-াগান উত্থাপিত হয় ব্যক্তির নামে দলীয় আদর্শ বা কর্মসূচিতে লিখিত ফেস্টুন, ব্যানার, দেয়াল লিখনে এখন ব্যক্তিনাম ব্যবহৃত হচ্ছে, তোরণ নির্মিত হচ্ছে রাস্তায়। সঙ্গে থাকছে উদ্যোক্তার নাম। দেশের সর্বত্র বিশেষত ঢাকা শহরে চলতি পথে এসব অহরহই চোখে পড়ছে। এর মর্মাথ হচ্ছে, এসব দল বা সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধন।[৪৭৩]

ব্যাক্তিপ্রাধান্যর মাধ্যমে আর যাই হোক মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। যেমন- এডলফ হিটলার প্রতিটি জার্মান বাসীকে বাধ্য করেছিলেন তার প্রতি নিরংকুশ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। কারো মধ্যে এতটুকু অশ্রদ্ধার গন্ধ পেলে "ব্রাউন শার্ট" রা গিয়ে ওই 'বেয়াদব' ব্যক্তিকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নিয়ে যেতো, কার্বাইনের ঝাঁক ঝাঁক গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতো 'বেয়াদবের' বুক। আজ কোথায় সেই হিটলার? কোথায় তার নাৎসীবাদ? কোথায় 'ফ্যুয়েরার' এর প্রতি সেই ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ?[৪৭৪]।

---

[৪৭২] এ কে এম শাহনাওয়াজ, সমাজ রাজনীতির এক দশক (২০০০- ২০০৯), নভেল পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
[৪৭৩] প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯।
[৪৭৪] রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, আফসার ব্রাদার্স, প্রকাশকাল- বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৭।

লেলিন-স্ট্যালিনের আমলে তাদের 'ব্যক্তিত্ব' ও 'মহত্ব' কে মেশিনগান দিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নবাসীর ওপর। তার পরিনাম কি হয়েছে? আজ সমগ্র রাশিয়ায় বা সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত কোনো রাষ্ট্রেই তো সহজে খুজে পাওয়া যাবে না লেনিনের বা স্ট্যালিনের মামীকৃত দেহশুদ্ধ তার গোটা সমাধিই তো এক সময় ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল[৪৭৫]। মাও সেতুঙের জীবনকালে প্রতিদিন প্রতি কাজের পূর্বে মাওয়ের লাল বই অধ্যায়ন ছিল বাধ্যতা মূলক। মাও সেতুং তো দূরের কথা, তার বই অধ্যায়নের প্রতিও কেউ যদি সামান্যতম অনীহা প্রকাশ করেছে বলে শোনা যেতো, তাহলে 'সাংস্কৃতিক বিল্পবের' এর ক্যাডাররা গিয়ে ওই ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতো। আজ কোথায় সেই মাও সেতুঙের পুস্তক? কোথায় তার আদর্শ? কোথায় তার ভাবমুর্তি?[৪৭৬] বস্তুত শ্রদ্ধার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ রূপেই মানুষের হৃদয়ের ব্যাপার। জোর করে শ্রদ্ধা বা নেতৃত্ব অর্জন করা যায় না যায় শুধু ভয়ভীতি প্রদর্শণ করে ভীত সন্ত্রস্ত করা। তবে সর্বোপরি বলা যায় ব্যক্তির প্রাধান্য কখনো গণতন্ত্রে জন্যে শুভকর নয়।

৮.১৭ বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল

বাংলাদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক হলো রাজনীতিতে বিদ্যমান দলীয় কোন্দল। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে অতি দ্রুততর গদিতে নিজেদের উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত ক্ষুদ্র আমাদের এ দেশটির রয়েছে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক দল, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিদ্যমান উপদলীয় কোন্দলের

---

[৪৭৫]প্রাগুক্ত।
[৪৭৬] প্রাগুক্ত।

অস্তিত্ব। এখানে রাজনীতিতে দলভাঙ্গার খেলা আজও চলছে এবং প্রায় প্রতিদিনের খবরের কাগজেই লাগাতর দু একটি সংবাদ চোখে পড়ে। যদিও পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতি এখনও স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছেনি তবুও বাংলাদেশের রাজনীততে দলীয় কোন্দল আর ভাঙ্গাগড়ার যে খেলাটি চলছে তা অন্য কোন দেশে অনুরূপভাবে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না[৪৭৭]।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলীয় মতানৈক্য এবং কোন্দলের প্রকৃতি এতটা ভয়াবহ যে এর ফলে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রশ্নবিদ্ধ করেছ বারবার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান স্বাধনি হবার পূর্বে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এ ধরনের দলীয় কোন্দল বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান স্বাধীনতাপূর্ব মুসলিম লীগে তিনটি উপদল **১.** নাজিমউদ্দিন উপদল যা পাকিস্তানের সামান্ত প্রভূ এবং জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করে চলতে। **২.** ফজলুল হক উপদল যা গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট ছিল এবং কৃষকরা সার্বিক মুক্তির কথা বলত। **৩.** সোহরাওয়ার্দী উপদল যা মূলত শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাকারী শিক্ষিত শ্রেণীর সংগঠন বলে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ উপদলীয় কোন্দলের অংশ হিসেবে নাজিমুদ্দীন উপদলগুলোর কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অপর দুটি উপদলকে নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করার কারণে পরবর্তীকালে মুসলিম লীগির বিপরীতে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে.এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেন এ এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়[৪৭৮]। শ্রেণীস্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান নানা অভ্যন্তরীণ ও উপদলীয় কোন্দল মুসলিম লীগির মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল[৪৭৯]। রাজনৈতিক দলীয় কোন্দলের ফলে নব গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের একাংশই ১৯৫৫ সালের আওয়ামী লীগের একটি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে গোড়াপত্তন করে[৪৮০]। রাজনৈতিক কোন্দল ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি আইয়ুবের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগের একাংশ কনভেনশন মুসলীম লীগে রূপান্তরিত হয়[৪৮১]। ক্ষমতা লাভ এবং সংরক্ষণই দলীয় কার্যক্রম এর প্রধান চলক-এ পরিণত হলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংঘাতময় হয়ে উঠে এবং রাজনৈতিক দলীয় কন্দোল দেখা দেয় যেমন-পশ্চিম পাকিস্তানের রিপালিকান পার্টি এবং পিপলস পার্টির গঠনপ্রক্রিয়া কনভেশন মুলিম

---

[৪৭৭] ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৪৩৪।

[৪৭৮] Shymamali Ghosh, The Awami league 1949-1971, Dhaka 1990, PP . 1-22.অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-১৯৭৫, ঢাকা তারিখবিহীন, পৃষ্ঠা- ৯৯-১০২, আবু আল সাঈদ , আওয়ামী লীগের ইতিহাস , ঢাকা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৩-১৫; বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার রাজভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড, ঢাকা ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২৪৬-৫০।

[৪৭৯] ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৪৩৫।

[৪৮০] হক, ড. আবুল ফজল , বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, প্রথম প্রকাশ কাল-১৯৭৪, পৃষ্ঠা-৩৮১,Shymamali Ghosh, The Awami league 1949-1971, Dhaka 1990, PP . 1-22. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-১৯৭৫, ঢাকা তারিখ বিহীন, পৃষ্ঠা-৯৯-১০২, আবু আল সাঈদ , আওয়ামী লীগের ইতিহাস , ঢাকা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৩-১৫

[৪৮১] আহমদ, ড. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংকট, শিকর, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯১। পৃষ্ঠা-২৩।

লীগের মত গঠন প্রক্রিয়ায় [৪৮২]। বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেতৃত্ব ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণেও রাজনৈতিক কোন্দলের সৃষ্টি হয়। এর জন্য নৃেতত্বের ব্যর্থতাই প্রধান দায়ী। নেতা যখন দলের মধ্যকার সার্বিক সমস্যা সমাধানে অযোগ্যতার পরিচয় দেন অথবা মতবিরোধ নিরসনে ব্যর্থ হন বা সবার সাথে সমান আচরণ করার গুণাবলীতে ব্যর্থ হন তখনই রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দলের কোন একটি অংশ মুল সংগঠন থেকে বের হয়ে এসে অপর কোন নেতার নেতৃত্বে নতুন দল গঠন করে। বাংলাদেশের প্রায় দলের মধ্যেই এটা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে[৪৮৩]। তাছাড়া বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়। পদ বা নেতৃত্বের লোভে অভ্যন্তরীণ দলীয় মতানৈক্য এবং কোন্দলের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ দলগুলোই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নিজেদের পছন্দকৃত প্যানেলকে জয়যুক্ত করার জন্য তারা উপদলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয়[৪৮৪]। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের দলীয় কোন্দলের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে এখনও স্থিতিশীল পর্যায়ে না পৌছার কারণে নতুন নতুনদল গঠিত হয়। এসব দলে মুলত একজন নেতাই থাকেন এবং তারই আহবানে অন্যেরা এসে যোগ দেয় যার ফলে দল হয় মুলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে কয়েকটি আদর্শগত দল ছাড়া বাকি দলগুলোর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। মূল নেতার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে উপদলগুলো গড়ে উঠে এবং স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত হয়[৪৮৫]। আদর্শগত সংঘাতের শিকার হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রায় সব কটিই আজ এ সমস্যায় জর্জরিত। এখানকার দক্ষিনপন্থী, মধ্যপন্থী, বামপন্থী উদারপন্থী, সব দলেই আদর্শগত কোন্দল বিদ্যমান[৪৮৬]। দলীয় কোন্দলের কারণে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটছে মারামারি, খুনোখুনি অথবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দলীয় কোন্দলের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে মনোনয়ন ও নির্বাচনের জয় পরাজয়ের হিসাব। সম্প্রতি চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থী মহিউদ্দিনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ স্থানীয় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন কোন্দল। একই মঞ্চে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে বিশেষ করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে নেতাকর্মীদের মধ্যে দ্বন্ধ সংঘাত সংঘর্ষ মারাত্নক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, সেই আনুগত্য না থাকায় নেতাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ এবং একে অপরকে টপকে যাওয়ার প্রবণতা মারাত্নকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এর পরে দিনের পর দিন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্থিরতা ও অসহযোগিতা মূলক মনোভাব উত্তোরত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে।এ পরিস্থিতি

---

[৪৮২] প্রাগুক্ত

[৪৮৩] ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৪৩৫।

[৪৮৪] প্রাগুক্ত।

[৪৮৫] প্রাগুক্ত।

[৪৮৬] প্রাগুক্ত।

দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র দিনে দিনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই দেশের রাজনৈতিক সহিংস রূপের পরিবর্তন সাধনে আন্তঃদলীয় সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। যার পূর্ব শর্ত হবে দলের কাঠামোগত গণতন্ত্রায়ন ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা[৪৮৭]।

৮.১৮ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হরতাল

হরতাল ভারত উপমহাদেশের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। আমাদের সোনার বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ ও বিরোধী দলে থাকতে বাধ্য হয়, তারাই হরতালকে অত্যন্ত ভালোবাসি। হরতাল

[৪৮৭] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

দিতে না পারলে আমাদের হৃদয়ের স্বস্তি উঠে যায়। ইংরেজি, ফরাসি, জামার্নী, জাপানী প্রভৃতি ভাষায় "হরতাল" এর কোন প্রতি শব্দ নেই। কারণ হরতাল করে সমগ্র জন জীবনকে অচল করে দেয়া এবং বিপুল জাতীয় ক্ষতি সাধন করার মোক্ষম আইডিয়াটি আজো মোটা মাথায় ঢোকানোই সম্ভবপর হয়নি। আমাদের দেশের হরতাল ব্যাপারটি বুঝা বা বুঝানোর জন্য তাদের কস্ট করে অনেক শব্দ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়। যেমন সংসদ বাংলা ইংরেজি অভিধানে হরতাল এর ইংরেজী করা হয়েছে 'Stoppage of all work throughout a wide area"[৪৮৮]. অধিকাংশ বিদেশী অভিধানে হরতাল জাতীয় কোন শব্দ নেই। The Random house Dictionary of the English langage এ বলা হয়েছে, হরতাল ভারত উপমহাদেশেই হয়, এর অর্থ Closing of shops and stoppage of work[৪৮৯].

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট বা রিপাবলিকান পার্টি কি কখনো সমগ্র দেশ জুড়ে বা কোনো স্টেট জুড়ে আমাদের মতো হরতাল ডেকেছে? না কখনো ডাকেনি। জাপানেও ক্ষমতার প্রচন্ড টানাপোড়ন। সরকার আসছে, সরকার যাচ্ছে। কিন্তু সর্বাত্মক হরতাল ডেকে তারা কি কখনো সমগ্র জাপান তো দূরের কথা, টোকিও বা ওসাকা শহরকেও অচল করে দিয়েছে।এটা তাদের চিন্তারও অসম্য। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের বক্তব্য হলোঃ আমাদের বিরোধীতা সরকার বা সরকারি দলের সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে নয়। তাহলে সরকার বিরোধীতার অজুহাতে জনগণের হয়রানি এবং জাতীয় ক্ষতির মতো পাগলামী করে দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে ব্যহত করা দেশের ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়।।

১৯৯১-পরবর্তী সময়ে দৃশ্যত দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটলেও রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধান দুটি দলের চলমান দ্বন্ধ এবং বৈরি সম্পর্ক দলীয় ব্যবস্থা এবং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করে। দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো চালু হলেও এর কার্যকারিতার অভাবে কর্তৃত্ববাদী মনোভাব এবং প্রতিবাদী ও বিরোধীতার রাজনৈতিক আচারণ অব্যাহত থাকে। ফলে হরতাল সংস্কৃতি দৃঢ় হয় এবং সাংবিধানিক অধিকারের নামে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ক্রমাগত ভাবে প্রয়োগ করা হয়।[৪৯০]

---

[৪৮৮] সংসদ বাংলা ইংরেজি অভিধান

[৪৮৯]The Random house Dictionary of the English langage

[৪৯০] হাসানউজ্জামান আল মাসুদ, বাংলাদেশর সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,প্রথম প্রকাশ:২০০৯, পৃষ্ঠা- ৮৬

১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ৬১ টি এবং ৬৭ টি জাতীয় ভাবে হরতাল আহবান ও পালন করে। সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন এবং হরতাল পালনের কারণে বাৎসরিক ভাবে শতকরা পাঁচ ভাগ জিডিপিএর ক্ষতি হয়।[৪৯১]

হরতালে সুনির্দিষ্ট কোন জনইস্যুর চেয়ে সংশিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থ উদ্ধারেই হরতাল সংঘঠিত হয় এবং এর সাথে হরতাল আর অহিংস পন্থা থাকেনি বরং সহিংস হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নৈরাজ্যময় হয়ে গেছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল সময়ে ৩৩২ টি হরতাল আহবানের খবর জানা যায়[৪৯২]

বর্তমানে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়ে দাড়িয়েছে হরতাল। যেহতু বাংলাদেশ দুটি দল পাল্টাপাল্টি করে সরকার ও বিরোধী দলের ভুমিকায় অবতীর্ন হয় তাই এ দুই দলের নেতৃত্বই রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম কঠিন এক কর্মসূচি হলো হরতাল, বলা যায় এক চরম কর্মসূচিকে সবচেয়ে সহজ কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, যে কেউ ডাকলেই হরতাল হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, আগে যেমন হরতালের পক্ষে তেমন জনমত ছিল না, এখনো নেই[৪৯৩]।

১৯৯৫ সালের ৯ মার্চে ভোরের কাগজে প্রকাশিত এক জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, ৫১ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগের ১২ ও ১৩ মার্চের হরতালের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। আর ১৯৯৭ সালের ৪ এপ্রিলে আরকেটি প্রকাশিত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, প্রায় ৮১ শতাংশ মানুষ হরতাল সমর্থন করেনি। অর্থ্যাৎ হরতালের বিপক্ষে মানুষের জনমত বাড়ছে[৪৯৪]।

লাগাতার হরতাল কর্মসূচি অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতির কারণ হয় এবং শিক্ষা, পরিবহন, কর্মসংস্থান, পোশাকশিল্প, সঞ্চয়, বিনিয়োগসহ নাগরিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও জনমনস্তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। হরতাল অস্ত্রে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এর কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। Nizam Ahmed বলেন- "They are compelled to opt for this recourse owing to the country's 'winner takes all' nature of politics and the lack of effective alternative means of voicing opposition demand through parliament and other channels."[৪৯৫]

---

[৪৯১]Nasreen khundker, The Price of Hartal: Impact on the Economy, Beyond Hartals, Dhaka: UNDP, 2005,p. 32.
[৪৯২]S. Aminul Islam, The History of Hartals t; Beyond Hartal, op. cit. ,p86.
[৪৯৩] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রূদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২,প্রথমা প্রকাশণ,প্রথম প্রকাশ . অমর একুশে বই মেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-৫৪
[৪৯৪]ভোরের কাগজ, ৯ মার্চ, ১৯৯৫।
[৪৯৫]Nizam Ahmed, Breaking the Hartal Habit; Beyond Hartal, op. cit. ,p.87.

স্বাধীন বাংলাদেশে হরতাল পালনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। অর্ধদিবস থেকে পূর্ণ দিবস, তারপর আট চলিশ ঘন্টা, এমনকি বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত হরতাল এরশাদের আমলেই দেখা গেছে। আর বিএনপির সরকারের আমলে তো আওয়ামী লীগ শুধু একদিন বা দুই দিন নয়, কিছু ছাড় বা সময় শিথিল করে ছয় দিনব্যাপী হরতাল পালন করেছিল। আর এভাবে হরতাল পালন করতে করতে এই কর্মসূচি এখন হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সহজ এক কর্মসূচি।[৪৯৬] অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় যে, আমাদের নেতা নেত্রীরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে, গদির জন্য গুঁতোগুঁতিই হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এই গুঁতাগুঁতি যতো নগ্ন ও বর্বর হয় ততোই মজা। অবশ্য সরকার ও বিরোধী দলের এই মজার মাশুল হলো গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথে প্রধান অন্তরায়[৪৯৭]।

সারণী ঃ ২৬

বাংলাদেশে হরতালের একটি সমীক্ষা (১৯৯১ হতে ২০১৩ মার্চ পর্যন্ত)[৪৯৮]

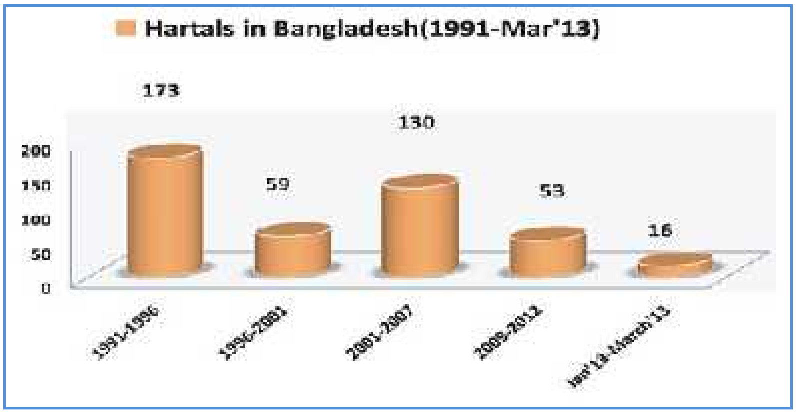

সংগৃহীত ঃprogressbangladesh.com

"আমি বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানাই আমরা আর হরতাল করব না, আপনারাও আসুন আর হরতাল নয় একযোগে কাজ করি।[৪৯৯] কথাগুলো বলেছিলেন বর্তমান এবং তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার কথাগুলো অত্যন্ত সময় উপযোগী। বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ইউসুফ আবদুলাহ হারুনের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল গত ২০০১ সালের ২৬ এপ্রিল বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। হরতালের অবসানে প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে সম্ভব সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রেসিডেন্ট হরতাল না করার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর ওপর

---

[৪৯৬] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২,প্রথমা প্রকাশণ,প্রথম প্রকাশ . অমর একুশে বই মেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-৫৭।

[৪৯৭]রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, আফসার ব্রাদার্স, প্রশথ প্রকাশ-বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৭।

[৪৯৮]progressbangladesh.com

[৪৯৯] শেখ হাসিনা, 'হরতাল করব হরতাল করব না', দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫।

চাপ সৃষ্টি করতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলকে পরামর্শ দেন।[৫০০] কিন্তু যতই সরকারি দল হরতাল না করার ঘোষণা দেকনা কেন বিরোধী দলে গেলে তারা সব বেমামুল ভূলে যায় এবং এই ইস্যূতে আবার তারাও হরতাল এর মত কর্মসূচি দেয়। চৌধুরী এবং জামান উলেখ করেন যে বিরোধী দলের দাবির প্রেক্ষাপটে ১৯৯৪-৯৬ সালের হরতাল আহবানের মাত্রা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি হয় এবং একই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬-২০০১ সময়েও হরতাল পরিলক্ষিত হয় এবং সরকার পরিবর্তনের প্রাক্কালে বারংবার লক্ষ্য করা যায়।[৫০১]

বাংলাদেশের রাজনীততে বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হরতাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বা শক্তিশী রাজনৈতিক অধিকার ও আন্দোলনের হাতিয়ার। হরতাল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যে কোনো ইস্যুতে বেকায়দায় ফেলার একটা যুৎসই হাতিয়ার। আমাদের দেশে আন্দোলন ও সংগ্রামে হরতাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৫০২]

একটি সূত্রমতে, বিগত ৪০ বছর দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব হরতাল আহ্বান করা হয় তা এক করলে তিন বছরের সমান হবে। অর্থাৎ ১০,৯৫০ দিনের মধ্যে আমাদের ১,০৯৫ দিনই ছিল হরতাল। একটি পূর্ণ দিবস হরতালে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তার পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার মতো। তাহলে তিন বছরের হরতালে যে ক্ষতি হয় তার আর্থিক পরিমাণ হচ্ছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে এ ধরনের অনাবশ্যক ব্যয়ভার বহন করা কি আদৌ সম্ভব? জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে জনগণ আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। কিন্তু এটা দিনের পর দিন চলতে পারেন না।[৫০৩]

হরতালের কারণে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি, এক কথায়, দেশের সবকিছুই প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এমনকি জরুরি রোগীদের চিকিৎসা পর্যন্ত করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। হরতালের কারণে সকল মহল ক্ষতিগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা হরতালকে যে কতটা অপছন্দ এবং ঘৃণাভরে দেখেন এর যদি বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যায় তাহলে মনে হয় ঘৃণার স্রোতে হরতাল ভেসে যাবে। উলেখ্য, হরতাল আহ্বান করা রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকার। তাদের হরতাল আহ্বানে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মনে রাখা প্রয়োজন যে, হরতাল আহ্বান করা যেমন তাদের রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক অধিকার, তেমনি আহত হরতালে সাড়া দেয়া না দেয়াটাও জনগণের মৌলিক অধিকার। কোনো ক্রমেই জনগণকে তাদের ইচ্ছার

---

[৫০০] আবু ইউসুফ, হরতালকারী রাজনৈতিক দলকে আসুন নির্বাচনে বয়কট করি; দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মে, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫।

[৫০১] Choudhury and Hasanuzzaman, Constructive Alternatives to Hartal; Beyond Hartals Towards a democratic Dialogue in Bangladesh, Dhaka; UNDP, 2005, Page -69-70.

[৫০২] শেখ হাসিনা, 'হরতাল করব হরতাল করব না', দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫।

[৫০৩] আবু ইউসুফ, হরতালকারী রাজনৈতিক দলকে আসুন নির্বাচনে বয়কট করি, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মে, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে হরতাল পালনে বাধ্য করা যাবে না। এটা শুধু যে অগণতান্ত্রিক তা নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ বটে। কারণ এতে রাজনীতির নামে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়।[৫০৪]

অন্যের সমপরিমাণ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার ভোগ করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য। কারণে অকারণে হরতালের ডাক দিয়ে পিকেটারের মাধ্যমে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর আর রাস্তা ঘাটে সন্ত্রাস বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামই হরতাল নয়। হরতাল হতে হবে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে। হরতাল বর্তমানে বিরোধী দলগুলো কথায় কথায় ইস্যুবিহীন হরতাল আহ্বান করে, তাতে জনগণের সমূহ ক্ষতি হলেও জনমতের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটে না। বিরোধী দলগুলো যদি হরতালের সময় পিকেটিং ও ব্যাপক বোমাবাজি না করে, তাহলে ক'জন লোক তাদের সমর্থন জানাত? হরতালের পর হরতাল আহ্বানকারী দলগুলো যে জনগণকে হরতাল সফল করার জন্য অভিন্দন জানায় তা সাধারণ জনগণের সঙ্গে অভিনব প্রতারণার শামিল। হরতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে। এই আলোকে কিছু পরামর্শ-

প্রথমত ঃ আমাদের শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ যে কারণ বা বিষয়ের জন্য বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী হরতাল আহ্বান করে থাকে, সেই বিষয়গুলি যদি সরকার ও বিরোধী দল মিলে একটি সমঝোতায় পৌঁছার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালায় তাহলে আর হরতালের পরিবেশই তৈরি হয় না।

তৃতীয়ত ঃ দাবি আদায়ে হরতালের নামে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে হরতালের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত ঃ হরতাল বন্ধের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

পঞ্চমত ঃ যে কারণেই হোক না কেন হরতাল আহ্বান করা যাবে না এই মর্মে সরকারি এবং বিরোধী দলকে একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে হবে।

ষষ্ঠত ঃ হরতালের সময় পিকেটিং এবং সন্ত্রাস ও বোমাবাজি করা যাবে না। জনগণ ইচ্ছা করলে হরতাল করবে আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

সপ্তমত ঃ জনগণ রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে হরতাল পছন্দ করে কিনা এ বিষয়ে একটি গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে।

অষ্টমত ঃ যেসব দলের তেমন কোনো গণভিত্তি নেই তারা অযথা হরতালের ডাক দিতে পারবে না।

[৫০৪] প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৫।

নবমত ঃ রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে হরতাল না করার সুস্পষ্ট ঘোষণা রাখতে হবে।

দশমত ঃ যে কোন ভালো জিনিসও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে হরতালের বিষয়ে এ দিকটি স্মরণে রাখতে হবে।

বর্তমানে হরতাল সহিংস রূপ নিয়েছে এবং তাতে জনসাধারণের জানমালের সামগ্রিক ক্ষতির সাথে সাথে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পথে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে।

৮.১৯ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাস

বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিভিন্ন গবেষক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আহমেদ এর মতে সংজ্ঞার দিক থেকে সন্ত্রাসবাদ একটি অধিক সজ্ঞায়িত ধারণা। তার মতে নানা গবেষক, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থা সন্ত্রাসবাদ অর্থ নির্ণয়ে প্রতিনিয়ত দ্বন্দে লিপ্ত [৫০৫]। দেখা গেছে **স্মিথ এবং জংম্যানের** সন্ত্রাসবাদের ১০৯টি সংজ্ঞা চিহ্নিত করেছেন[৫০৬]। চমিস্কি যথার্থই বলেছেন সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করা একটি জটিল ও বিরক্তিকর কাজ [৫০৭]। এই বিতর্কের মূল কারণ হলো -আক্রমণ ন্যায় নাকি অন্যায় এই ধারণার সমাধান। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন Right Based Approach মাধ্যমে নিম্নলিখিতি ভাবে সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করা যায়- " রাষ্ট্রের মধ্যে পর্যাপ্ত আইনী ও শান্তিপূর্ণ উপায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী/ নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং কতিপয় দল/ গোষ্ঠী/ব্যক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পদ্ধতিগত ভাবে সাধারণ/বেসামরিক জনগণ অথবা তাদের সম্পত্তির উপর সহিংস কার্যক্রম চালানো অথবা চালানোর ভয় দেখানো [৫০৮]। এই সংজ্ঞা সন্ত্রাসবাদ নিরূপণের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে অন্তর্ভূক্ত করে। যেমন-

১. রাষ্ট্রের কাঠামো ২. রাজনৈতিক লক্ষ্য ৩. সহিংসতা
৪. সাধারণ জনগণ ৫. মানবাধিকার [৫০৯]।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে তিন ধরণের সন্ত্রাসবাদ বিদ্যমান :

১. বামপন্থী সন্ত্রাসবাদ ২. ডানপন্থী সন্ত্রাসবাদ

[৫০৫] Ahmed Imtiaz (ed). Understanding Terrorism in South Asia : Beyond Statist Discourse, Manohar, 2006 Page – 18.
[৫০৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২।
[৫০৭] Chomsky, Nom, Who are the Global Terrorists? in Booth ken, Dunne Tim(ed) Worlds in collusion : Terror and the Future of Global Order, (New York, 2002) page-128.
[৫০৮] রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত ,বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯। জোহরা আখতার এর প্রবন্ধ, সন্ত্রাসবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃষ্ঠা-২০১।
[৫০৯] প্রাগুক্ত

৩. রাজনৈতিক ব্যবস্থা দমনমুলক সন্ত্রাস

বর্তমানে বাংলাদেশে ডানপন্থী ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বলতে ওই সকল জঙ্গীদলের কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে যারা ইসলামের জিহাদী ধারণাকে ব্যবহার করে বর্তমানে বাংলাদেশে যে শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংস কার্যক্রমে লিপ্ত। অন্য দিকে আহমেদ মনে করেন- বামপন্থী সন্ত্রাসবাদ বলতে ওই সকল দলের সন্ত্রাসবাদকে বুঝিয়েছেন যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংস কার্যক্রমে লিপ্ত [৫১০]। এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস বলতে রাজনীতি ক্ষমতার অপব্যবহার বুঝায়।

বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গী দল গুলো সাধারণ জনগণ অথবা বেসামরিক জনগণকে তাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত করছে। ১৯৯৯ সাল থেকে সহিংতার সূত্রপাত করেছে। ১৯৯৯ সাল থেকে বারবার তাদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু ছিল বেসামরিক স্থাপনা যেমন বিচার বিভাগ, আদালত, এনজিও অফিস, সরকারি এবং ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়, প্রেস ক্লাব, সিনেমা হল, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। যার মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে বিচারক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং বেশ কিছু নিরীহমানুষ। বোমা, গ্রেনেড হামলা এবং হত্যার মাধ্যমে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ২০২ জন বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং ১৮৯০ জন ব্যাক্তিকে আহত করেছে[৫১১]।

সারণী ঃ ২৭

জঙ্গীদল কর্তৃক হত্যার পরিসংখ্যান

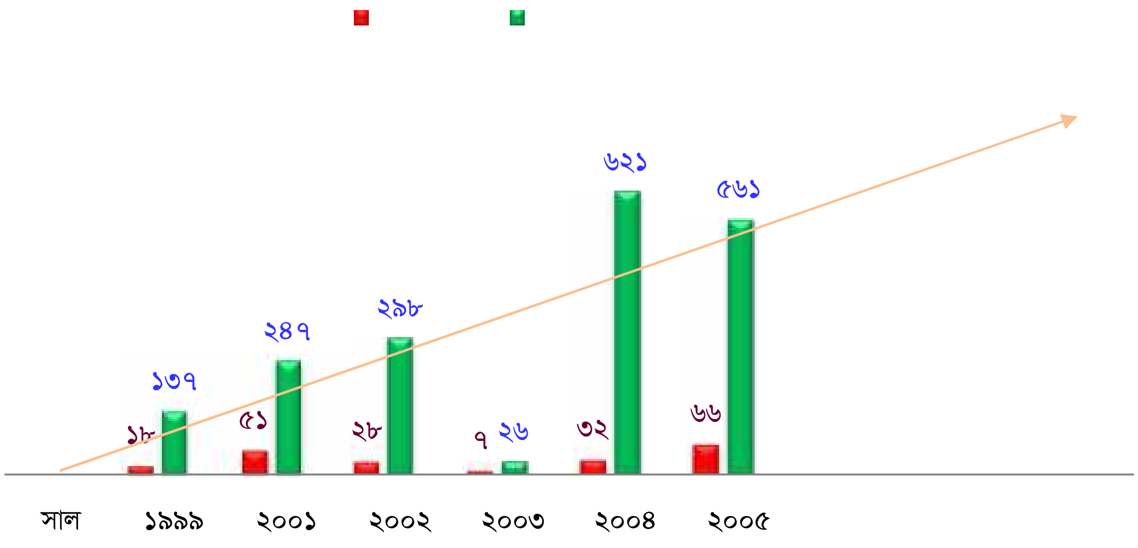

Bangladesh Foundation for development Research) Opcit 25.

[৫১১]Barakat, Abul, æEconomics of Fundamentalism and the growth of political Islam in Bangladesh" in Harun-or-Rashid(ed) Social Science Review, vol.23, Nor 2. December 2006 Page 24-25.

উৎস : Abul Barakat Growth of Fundamentalism and the Growth of Political islam in Bangladsh, 2006, Page- 24-26

বর্তমানে বাংলাদেশে অধিক কার্যরত ইসলামী জঙ্গী দলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হারকাতুল জিহাদ আল ইসলামী, বাংলাদেশ (হুজি বি), জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), আলাহর দল, হিযবুত তাওহীদ এবং হিযবুত তাহরীর ইত্যাদি[৫১২]। নিন্মে হুজিবি এবং জেএমবি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

হুজিবি:

বাংলাদেশে হুজিবির উৎপত্তি মূলত ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় ১৯৮৮ সালে মুফতি আবদুর রহমান ফারুকের নেতৃত্বে যশোরে এই সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে[৫১৩]। হুজিবি কর্তৃক পরিচালিত গ্রেনেড ও বোমা হামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উদিচি বোমা হামলা (২০০১), যশোর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা (২০০৫), সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এস েম কিবরিয়া হত্যা (২০০৫), রমনা সিপিবি র‌্যালিতে বোমা বিস্ফোরন (২০০১) ইত্যাদি [৫১৪] তাদের দ্বারা সংঘঠিত বলে অভিযোগ রয়েছে।

জেএমবি:

১৯৯৮ সালে হুজিবি থেকে পৃথক হয়ে শায়খ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জেমমবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ আগস্ট, ২০০৫ সালের দেশব্যাপী বোমা হামলার পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠনটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। সংবাদপত্রে জেমমবি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে, যখন পুলিশ দিনাজপুর থেকে অস্ত্রসহ ৮ জন জেমমবি সদস্যকে গ্রেফতার করে [৫১৫]। জেমমবি কর্তৃক বোমা হামলা গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ১৭ আগস্টের (২০০৫) দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টা (২০০৪), ময়মনসিংহের

---

[৫১২]Akhter Zohra, Trends in Militancy in Bangladesh, August 2007- May 2008, The Paper Presented in a National Seminar on Trends in Militancy in Bangladesh : Possible Responses by Bangladesh Enterprise Institute on 11 June 2003.

[৫১৩]Bomb & Grenda Explosions : And other Forms of violence by Religiou Militants in Bangladesh,(South Asians for Human Right) Nov. 2006, Page 33-34.

[৫১৪] রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত ,বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯। জোহরা আখতার এর প্রবন্ধ, সন্ত্রাসবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃষ্ঠা-২১২।

[৫১৫]Bomb & Grenda Explosions : And other Forms of violence by Religiou Militants in Bangladesh,(South Asians for Human Right) Nov. 2006, Page 33-34.

সিনেমা হলে বোমা হামলা (২০০২), ময়মনসিংহের উদীচী গোষ্ঠীর উপর বোমা হামলা (২০০৫), অধ্যাপক ইউনুস হত্যা (২০০৫), ফাইল পাগলার মাজারে বোমা হামলা (২০০৩) ইত্যাদি অপকর্মের অভিযোগ বর্তমান [৫১৬]।

কট্টর বামপন্থী সন্ত্রাসবাদঃ

বাংলাদেশে বাম চরমপন্থী দলগুলো বা গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রমকে বিশেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশে সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, গণ মুক্তি ফৌজ, বিপবী কমিউনিস্ট পার্টি, গণবাহিনী, মুক্তি বাহিনী ইত্যাদি নামে বিভিন্ন পন্থী সংগঠন বেশ কিছু দিন ধরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে তৎপর। এই জেলাগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হলো সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর , ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা এবং রাজশাহী [৫১৭]। করিম তার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন মূলত ছোট ছোট অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারই বর্তমানে চরমপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বের প্রধান ফোকাস[৫১৮]। বাম চরমপন্থী দলগুলো তাদের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে সহিংসতা অথবা সহিংসতার ভীতিকে ব্যবহার করে। তাদের সহিংস কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম হলো বোমা হামলা, হত্যা, ধর্ষণ, এবং চাঁদাবাজী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সহিংসতার শিকার হয় স্থানীয় সাধারণ জনগণ যেমন- কৃষক,ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, আইনজীবী এবং আরো অনেক শ্রেণীর মানুষ। র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) কর্তৃত পরিচালিত এক সমীক্ষায় [৫১৯] দেখা গেছে বাংলাদেশে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গুলোতে বাম চরমপন্থী দলগুলোর দ্বারা হত্যার পরিমাণ ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত ছিল ২১০২ জন। ধর্ষণের পরিমাণ ১৫৫৫ টি। ডাকাতির পরিমাণ ছিল ৫৫২টি এবং অপহরণের সংখ্যা ৫২১টি ইত্যাদি ভীতকর কর্মকান্ড পরিচালানার মাধ্যমে জনমনে ভীত সঞ্চার করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহৃত করার চেষ্টা চলানো হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা দমনমুলক সন্ত্রাস ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাস একটি কালো অধ্যায়। সন্ত্রাস বর্তমান বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা। সন্ত্রাস কোনো সদ্যজাত সামাজিক ব্যাধি নয়, এ সমস্যাটি বাংলাদেশ কম-বেশি সব সময়ই ছিল। তবে ভিন্ন ভিন্ন শাসনামলে সন্ত্রাসের ধরণ ও প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন রকমের। সামরিক এবং বেসামরিক শাসনামলে সন্ত্রাসের গতিপ্রকৃতিকেও উলেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালের সামরিক শাসনের

---

[৫১৬] রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত ,বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯। জোহরা আখতার এর প্রবন্ধ, সন্ত্রাসবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃষ্ঠা-২১২।

[৫১৭] Akhter Zohra, Trends in Militancy in Bangladesh, August 2007- May 2008, The Paper Presented in a National Seminar on Trends in Militancy in Bangladesh : Possible Responses by Bangladesh Enterprise Institute on 11 June 2003.

[৫১৮] করিম, মো: মেফতাউল," দক্ষিণ-পশ্চিমঞ্চালে চরমপন্থী তৎপরতা। র‌্যাবের কার্যক্রম" রহমান মো: শফিকুর (সম্পাদনায়) র‌্যাব প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জার্নাল, ২০০৮ (ঢাকা : ২০০৮) পৃষ্ঠা ৩৭।

[৫১৯] প্রাগুক্ত।

পতনের পর জাতি আশা করেছিল যে, বেসামরিক নির্বাচিত সরকারের শাসনামলে হয়তো সন্ত্রাস ত্রাস পাবে। কিন্তু জাতির সে আশা পূরণ হয়নি। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে সন্ত্রাসের কালো থাবা। গ্রাশ করেছে শহর, নগর, বন্দরসহ সারা বাংলাদেশকে।[৫২০]

১৯৯৮ সালের ৭ নভেম্বর বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া পল্টন ময়দানে একটি জনসভায় বক্তব্য দেবেন-এরকম কথাছিল। বিএনপির জন্য এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। অনেক দিন থেকেই এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ আওয়ামী লীগের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাই দেখা গেল তাদের লেঠাল বাহিনী পুলিশের সাহয্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে বিএনপির সভা পন্ড করে দিল। সভামঞ্চে তো কোনো বিশৃঙ্খলা ছিলা না এবং বেগম জিয়া বক্তব্য দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েও ছিলেন কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে টিয়ার শেল বারাবার বুলেট ছোড়ার উদ্দেশ্য কি? প্রত্যক্ষদর্শিরা মনে করেন যে, বেগম জিয়াকে খুন করাই ছিল আওয়ামী সন্ত্রাসবাহিনী সহ পুলিশের উদ্দেশ্য[৫২১]। বিএনপির জনসভা (১৯৯৮) অনুষ্ঠানে নানারূপে বাধা সৃষ্টি করেও সরকার ক্ষ্যন্ত না থেকে তারা বিভিন্নভাবে বিএনপির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বিএনপি যখনই কোনো মিছিল বের করেছে তখনই পুলিশ তাদের তাড়া করেছে এবং মিছিলকারীদের অমানুষিক মারধর করেছে। বিএনপির অসংখ্য নেতা-সমর্থককে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের ধরে নিয়ে পুলিশ হেফাজতে প্রচন্ড মারধর করা হয়েছে। এছাড়া যখনই তারা কোনো জনসভা করতে চেয়েছে, তখনই হয় অনুমতি দেয়া হয়নি অথবা অনুমতি দিলেও পুলিশ এবং মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা তা পন্ড করে দিয়েছে[৫২২]।

প্রবীণ সাংবাদিক এ বি এম মুসা " পুলিশী কর্মকান্ডের দায় সরকারের" শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছেন [৫২৩] **১৯৯৯** সালে বিএনপির ডাকা জনসভাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে- সেদিন প্রকাশ্য রাজপথে হাজার হাজার মানুষ ও সাংবাদিকদের চোখের সামনে আমাদের পুলিশ মহাউৎসাহে উলঙ্গ করে ফেললো রাজনৈতিক কর্মী মনি বেগমকে। শুধু তাই নয়, সেদিন ওসি হানিফের নেতৃত্বে পুলিশ সাংবাদিকদেরও বেধড়ক পিটিয়ে দিয়েছে। দল তম নির্বিশেষে এর বিরোধীতা করলে ওসি মহানিফ নাকি বলেন " এখন তো শুধু পিটিয়েছি। বেশী কথা বললে গুলি করবো। সাংবাদিকদের গুলি করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ আছে। এর পর ওসি হানিফ কনস্টেবলদের ডেকে বলেন " শালাদের পিটিয়ে বানিয়ে দে"। আবার শুরু হয় পিটুনি। পুলিশের লাঠি চার্জে আহত হন ফটোসাংবাদিক হাবিব (আজকের কাগজ), বোরহান (মানবজমিন), ফরিদ

[৫২০] ড. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার, কলাম, সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর, ২০০১ইং, পৃষ্ঠা-৫।

[৫২১] মিঞা, মোহম্মদ মনিরুজ্জামান,, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সন্ত্রাস : সরকার স্বরূপে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে। শিকড়,প্রথম প্রকাশ -২১ বইমেলা ২০০২।

[৫২২] প্রাগুক্ত।

[৫২৩] রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ , বই মেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-২১৮।

(জনকণ্ঠ), সানাউল (ইন্ডিপেন্ডেট), আনিস (ভোরের কাগজ), ফিরোজ (প্রথম আলো), এমরান (ডেইলী স্টার), খোকন (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস), সহ অনেকে।একদম শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ ৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও ১০রাউন্ড শর্টগানের গুলি বর্ষণ করে । এখানেও শেষ নয় ওসি হানিফ নিজেই নাকি বিএনপি দলীয় এমপি জয়নাল আবেদীন ফারুকের কলার চেপে ধরে তারও তলপেঠে লাথি ও কিল-ঘুষি মারতে থাকেন। ফারুক মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সহকর্মীরা তাকে তুলতে এগিয়ে আসেন। আর অমনি পুলিশ সাদেক হোসেন খোকা এমপি, সাবেক মন্ত্রী আবদুলাহ আল নোমান, সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন এমপি, অমানুলাহ আমান এমপি, মেজর হাফিজ উদ্দিন (অবঃ), হোসনে আরা, আজমিরী বেগম. আসমা আফরিন, মর্জিনা বেগমসহ নেতা-নেত্রীকে পিটিয়ে জখম করে।[৫২৪] আওয়ামী লীগের সমালোচনার করার অপরাধে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিযোদ্ধাত্ব কেড়ে নেয়া হয় এবং তাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এটিও একটি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বড় উদাহরণ।[৫২৫]

মানুষের মনে হতাশা, ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা গুজব শোনা যাচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ব্যবধান কেবলই বাড়ছে। কারো প্রতি কারো বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ নেই, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সদা তৎপর। তবে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন পক্ষ এক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তারা ঘায়েল করছে বিরোধী দলকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা, সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতেদমন করা, মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনা এ সবকিছুতে সরকারের আগ্রহ কতটুকু তা বোঝা না গেলেও সরকার যে বিরোধী দলকে দমনের জন্য অতি তৎপর সেটা বুঝতে পেরেছে সবাই।[৫২৬] সন্ত্রাসের এ অব্যাহত বৃদ্ধি আরো প্রসারিত হয়েছে হাসিনা সরকারের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১)। সরকারি দলের সাংসদ সদস্যদের পুত্র, মন্ত্রিপুত্র, হুইপ পুত্রদের সন্ত্রাস এবং দাপট ও দখলের রাজনীতি। সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা আইন পাস করলেও আওয়ামী লীগ সরকার এ আইনটিকে মূলত রাজনৈতিক বিরোধিতা দমনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসীগণকে সরকারের মাননীয় মন্ত্রীগণ পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করেন। সাতক্ষীরায় বিদায়ী সরকারের জনৈক প্রতিমন্ত্রী দলীয় ক্যাডারদের সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙে দিতে পরামর্শ দেন। সরকারের এ সকল কার্যকলাপে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে সন্ত্রাস চর্চা করার অনুকূল

[৫২৪] প্রাগুক্ত।
[৫২৫] রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ , বই মেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-২১৮।
[৫২৬] বিভূরঞ্জন সরকার, কলাম, সন্ত্রাস নয় বিরোধী দল দমনই সরকারের কাজ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ২০০২ইং, পৃঃ ৫।

পরিবেশ তৈরি হয়। অনেক রাজনৈতিক বিশেষক সন্ত্রাস দমনের ব্যর্থতাকেই গত পহেলা অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৫২৭]

এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যারাই করুক কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, এমনকি আমার দলের হলেও। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আমার দলের এমপি ও এমপিদের আত্মীয় স্বজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাদের কোনো কাজ নেই, ইস্যু নেই, এজেন্ডা নেই। এ জন্যই তারা সরকারকে অস্থিতিশীল করতে পরিকল্পিত ভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।[৫২৮]

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বিরোধী দল দায়ী বলে যেদিন বিকেলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, সেদিন দুপুরেই চট্টগ্রামে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের ২ শতাধিক সমর্থক হকিস্টিক ও লাঠি নিয়ে শ্রম আদালতে হামলা চালিয়ে দরজা-জানাল, এজলাস ভাঙচুর করেছে। নথিপত্র তছনছ ও ছিনতাই করেছে। আদালতের বিচারক পাশের টয়লেটে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। এই খবরটি এবং প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য একই দিনে সংবাদপত্রে পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে। খবর দুটি পাঠ করে পাঠকদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে-প্রধানমন্ত্রী সত্য ভাষণ দিয়েছেন বলে কি কারো মনে হয়েছে?[৫২৯] সন্ত্রাসী রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে খুনখারাবি রাজনীতি দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে যে শুধু নিরীহ জনসাধারণকে প্রাণ দিতে হচ্ছে তা নয়, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরও জীবন হারাতে হচ্ছে। অষ্টম সংসদ নির্বাচনের পূর্বে জাতি আশা করেছিল যে, এবার হয়তো বিজয়ী ও বিজিত দলগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং সরকারি ও বিরোধী দলসমূহ দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করবে। কিন্তু জাতির সে আশায় গুড়ে বালি।[৫৩০]

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে কোনো জনপদে সুসংগঠিত সরকারের সবচেয়ে উলেখযোগ্য কাজ হলো জনগণের অধিকার সংরক্ষণ। যে সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং জনগণের ভোটের সরকার নির্বাচিত হয় সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, তার প্রধানতম লক্ষ হলো যে, জনগণ তত্ত্বগত দিক থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক, তাদের অধিকার সংরক্ষণই সবচেয়ে বড় কথা (সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ)। দুর্ভাগ্যবশত গত

[৫২৭] ড. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার, কলাম, সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর, ২০০১ইং, পৃষ্ঠা ৫।

[৫২৮] বিভূরঞ্জন সরকার, কলাম, সন্ত্রাস নয় বিরোধী দল দমনই সরকারের কাজ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ২০০২ ইং, পৃ: ৫।

[৫২৯] প্রাগুপ্ত।

[৫৩০] ড. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার, কলাম, সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর, ২০০১ইং, পৃষ্ঠা ৫।

তিন বছরে (০৯-১২) মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি, রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি, সংখ্যালঘু নির্যাতন, রাজনীতিকরণের মাধ্যমে জনগণের বিচারপ্রাপ্তি সঙ্কুচিতকরণ, সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির ফলে সীমান্তে হত্যাকান্ড, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনা, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক সমাবেশ করতে না দেয়া উলেখযোগ্য [৫৩১]। অধিকারের সভাপতি প্রফেসর সি আর আবরারের সভাপতিত্বে (কালের কণ্ঠ,৮ জানুয়ারি ২০১২/০১/১০) যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, রাজনৈতিক সহিংসতায় গত তিন বছরে নিহত হয়েছে ৬০৬ জন। এর মধ্যে ২০০৯ সালে ২৫১ জন, ২০১০ সালে ২২০ জন, এবং ২০১১ সালে আওয়ামী লীগের ছাত্র যুব সংগঠনের ৯৮ জন এবং বিএনপির ১২ জন নিহত হয়েছে। ঘটনাগুলো ঘটেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ছাত্রাবাসের আসন দখল, হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। অত্যন্ত মারাত্মক দিকটি হলো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বিচার বর্হিভুত হত্যাকান্ড কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকার এখন গুম, অপহরণ, অন্যান্য পন্থা বেছে নিয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছে। গত তিন বছর (মহাজোট সরকারের) ৩৬৫ জন বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ২০০৯ সালে ১৫৪ জন, ২০১০ সালে ১২৭ জন এবং ২০১১ সালে ৮৪ জন। গুপ্তিটুনিতে নিহত হয় ২০০৯ সালে ১২৭ জন, ২০১০ সালে ১৭৪ জন এবং ২০১১ সালে ১৬১ জন[৫৩২]।

সারণী ঃ ২৮

বিচার বহির্ভূত হত্যা কান্ডের শিকার

Statistics : January – April, 2012						
Type of Human Right Violance		January	February	March	April	Total
Exra-judicial Killing	Crossfire	5	11	10	9	35
	Toture to death	0	2	1	1	4
	Shot to death	1	0	1	1	3
	Total	6	13	12	11	42
Disappearances		0	5	3	5	13
Deaths in Jail		9	6	6	2	23
Attack on journalist	Killed	0	2	0	0	2
	Injured	21	8	1	16	46
	Threatened	6	3	26	1	36
	Assaulted	7	3	36	1	47

৫৩১ আহমদ. এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশের রাজনীতি সমস্যা ও সম্ভাবনা,শিকড়, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা-২০১৪, পৃস্ঠা-১৭৩।
৫৩২ প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ১৭৪।

Political Violence	Killed	16	9	17	24	66
	Injured	1884	727	1052	2528	**6191**

Source: Odhikar's Documentation, Quoted in Zainul Abedin, æDemocracy and Human Right in Bangladesh" 2012.[533]

অক্টোবর ১৯৯১ সালে দেখা যায়, দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু হয়। ১৯শে অক্টোবর বাংলদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে।এরপর ২৭শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন ঘন্টা স্থায়ী এক বন্ধুক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র শিক্ষঙ্গনটি এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান দুটো ছাত্র সংঘঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র মোকাবেলায় ছাত্রদলের দু'জন কর্মী প্রাণ হারায়। তাছাড়া উভয় সংগঠনের বেশ কিছু কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্রমে সন্ত্রাসী তৎপরতা দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসী তৎপরাতার সাথে এক পর্যায়ে দেশের দেড় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় [৫৩৪] ।

৬ মে ১৯৯৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হলে সরকারি দল আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে আবার বন্ধুক যুদ্ধ হয়েছে। ছাত্রলীগের এই "বন্ধুকযুদ্ধে " ৫৫টি গুলিবিনিময় হয়েছে। আর এই "যুদ্ধে" গুলিবিদ্ধ হয়েছে ৩ জন [৫৩৫] । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের এই যে সিট দখল, হল দখল, পাল্টা দখল, বন্দুকযুদ্ধ চলছে, তা বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই বা কি করতে পারেন? কারণ, দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা মন্ত্রীরা তো ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরূদ্ধে কিছূ করেনও না। বরং তিনি যা বলেন, তাতে তারা সস্নেহ প্রশ্রয়ই পায়।[৫৩৬] উপনিবেশিক আমল থেকে এই উপমহাদেশের পুলিশকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সামজিকীকরণ করা হয়, পুলিশ যেন ভেবেই নেয় যে, জনগণ ও সরকার মুখোমুখি শত্রু। জনগণের ওপর অত্যাচার করাই পুলিশের প্রধান কর্তব্য এবং জনগণের ওপর অত্যাচার করলে কোনো শাস্তি তো হবেই না, বরং সরকার তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে। ক্ষমতা প্রদর্শনের মনোভাবই আমাদের পুলিশ বাহিনীর মুখ্য কাজ। আর জনগণের সেবার প্রশ্নটি গৌণ [৫৩৭] । রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরও বিভিন্ন রূপ

[৫৩৩] পক্ত।
[৫৩৪] ভূইয়া, ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ , বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রতম প্রকাশ ১৯৮৯, পষ্ঠা-৫৮৬।
[৫৩৫] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথম প্রকাশ একুশ বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-৬০।
[৫৩৬] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬১।
[৫৩৭] মনিরুজ্জামান, তালুকদার, বাংলদেশের রাজনীতি সংসকট ও বিশেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০১, পষ্ঠা-১০১।

আছে। শুধু পুলিশের অত্যাচারই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের একমাত্র নমুনা নয়। টাকা-পয়সা ও মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে বিরোধী দল থেকে এমপিদের নিজের দলে ভাগিয়ে আনার প্রবণতাও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আর এক রূপ।[৫৩৮]

সাপ্রতিক সময়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নির্বাচনী প্রতিযোগিতা সম্বন্বয়ে সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন, কালো টাকার প্রভাব, পেশীশক্তির ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহারে রুপ নেয়। ফলে দেশের রাজনীতি সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। অভিযোগ করা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে অংশ গ্রহণকারীরা দলীয় আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করেছিল। এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও রাজনীতিকগণের আদর্শের প্রতিযোগীতা অস্ত্রের সংঘাতে পরিণত হয়। এ ধরণের প্রবণতা সুস্থ দলীয় রাজনীতি চর্চায় মারাত্মক প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করে [৫৩৯]। সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং কার্যকারিতা বিশেষণ খুবই জরুরি। সন্ত্রাস রাতারাতি উৎপন্ন হয়নি, ক্রমবিকশিত হয়েছে, ছোট থেকে বড় হয়েছে, ধরণ প্রকৃতি পাল্টেছে, নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, টেন্ডারবাজি, ঘুষ, জমি দখল, বাড়ি দখল, প্রতারণা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, পরীক্ষায় নকল, সন্ত্রাসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত অপরাধটির দায়ভার সংশিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর; কোনোক্রমেই অন্য কারো নয়।[৫৪০] অবশ্য সরকার সন্ত্রাস দমনে উলেখযোগ্য সফলতা লাভের আশায় অনেক ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে-

প্রথমত ঃ দলমতের ঊর্ধে থেকে সর্বদলীয় বৈঠক আহবান করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ রাজনীতির তদবির বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক তদবিরে যেন সন্ত্রাসীরা ছাড়া না পায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাতে হবে। সত্যিকার অর্থেই সন্ত্রাস দমনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে হবে।

তৃতীয় ঃ প্রয়োজনে নতুন আইন বা আদালত সৃষ্টি করে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত ঃ সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে পুলিশ, বিডিআর, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ব্যবহার করা যেতে পারে।

পঞ্চমত ঃ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য কঠোর কর্মসূচী, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

[৫৩৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০২।
[৫৩৯] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, ইউপিএল, পৃষ্ঠা-৮৭।
[৫৪০] ড. ইব্রাহিম মুকুল, কলাম, সন্ত্রাস দমনের দায়ভার প্রথমত প্রধানত সরকারের, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ, ২০০২ইং, পৃ: ৫।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি, গণতন্ত্রের স্বার্থে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে লাগসই কৌশল বের করতে হবে।

৮.২০ বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ বিভিন্ন স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষা

স্লোগান হলো গণ-মানুষের দাবি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। স্লোগান একটি ইংরেজী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ A Party Catch Word|কোন দলের বাধা বুলি [৫৪১]। æA Motto”দলগত জিগির বা আদর্শ বাণী [৫৪২]। বাংলাতে স্লোগান অর্থ মিছিলের ধ্বনি, দাবি আদায়ের জন্য একসঙ্গে বহু মানুষের ধ্বনি বা জিগির[৫৪৩]। এক কথায় নিপীড়িত মানুষের দাবী প্রকাশের জন্য সভা-সমাবেশ দলগতভাবে মুখ নিঃসৃত ধ্বনিকে স্লোগান বলে।

আন্দোলন ও স্লোগান শব্দ দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অর্থ্যাৎ কোন আন্দোলন হবে সেখানে স্লোগানের উপস্থিতি থাকবেনা , বা কোথাও স্লোগানের উপস্থিতি থাকবে অথচ আন্দোলন থাকবে না। তা যেন অবাস্তব। এক কথায় বলা যায় স্লোগান ছাড়া কোন আন্দোলনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কোন আন্দোলন পূর্ণতা লাভের জন্য একটি গোষ্ঠি বা দলগত ব্যক্তির অবস্থানের প্রয়োজন হয় । তেমনি এই দলগত

[৫৪১] A.T. Dev Student Favourite Dictionary, Dev Sahitya Kutir, Kolkata, 1997, P- 908.
[৫৪২] Sailendra Biswas, Samsad English-Bangla Dictionnary, Sahitya Samsad, Kollata, 1959, P-1059.
[৫৪৩] ড. এনামুল হক, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১০৫৯।

ব্যক্তিরাই যখন তাদের দাবি, মুখ নিঃসৃত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে তখন স্লোগানে পরিণত হয়।এইভাবে স্লোগান হয়ে ওঠে দল বা গোষ্ঠির দাবি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। স্লোগানের অন্যতম একটি দিক হলো স্লোগান সংগঠনের জন্য দলগত ব্যাক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন হয়, এরফলে স্লোগান উচ্চারিত দাবিসমূহ সামিষ্টিক জনগোষ্ঠির দাবী হিসেবে প্রকাশিত হয়ে [৫৪৪]।

আমাদের এই অঞ্চলে কখন কোথায় প্রথম স্লোগান ব্যবহার শুরু সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। মোটামুটটি ভাবে ব্রিটিশ আমলেই এর সূত্রপাত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। । ১৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে, এই সময় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মুসলামানদের মুখে মুখে " লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্তন", "ছিনকে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান", "সিনেমে গুলি লেয়েঙ্গে পাকিস্তান বানায়েঙ্গে", "কানমে বিড়ি মুমে পান, লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান", ইত্যাদি স্লোগান শোনা যেত[৫৪৫]। ১৯৪৬ সালে গণভোটের সময় পাকিস্তানের স্লোগান ছিল " এক আলাহ, এক রাসূল (সাঃ) এক পাকিস্তান, এক মুসললম লীগ"[৫৪৬]। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও যখন জণগণের আশু মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন আম জনতা স্বাধীনতার বাস্তবতাকে অস্বীকার মুখে নতুন স্লোগান তোলে-"লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়", "নতুন বোতলে, পুরনো মদ", ইত্যাদি ধ্বনিত হতে থাকে [৫৪৭]। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ঘোষণা দেন "উর্দুই এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্টভাষা, । অন্য কোনো ভাষা নয়"এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। সমাবর্তন পন্ড করে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেত চাই" ইত্যাদি [৫৪৮]। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আরো হৃদয় স্পর্শি স্লে-াগান গুলো ছিল নিম্নরূপ-

"১৪৪ ধারা মানব না মানব না"[৫৪৯]; "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই "; "নাজিম নূরুল নিপাত যাক"[৫৫০]
"পুলিশের জুলুম চলবে না"; "নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়"[৫৫১]

১৯৬৬ সালের বঙ্গবন্ধু বাঙালির বাচাঁর দাবি ৬ দফা দাবি পেশ করেন যা কিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ। এই সময় স্লোগান উঠে- "বাঙালির দাবি ৬ দফা", "বাঁচার দাবি ৬ দফা",[৫৫২]।

---

[৫৪৪] স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্যাকার্ড ও পোস্টার, বাংলাদেশ চর্চা; প্রথম প্রকাশ :মে ২০০৮; পৃষ্ঠা:১৮-১৯।
[৫৪৫] কামরুদ্দিন আহমেদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা: ৫২।
[৫৪৬] আহমেদ আলী , আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ঢাকা ২০০০,পৃষ্ঠা ৬৫।
[৫৪৭] স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্যাকার্ড ও পোস্টার, বাংলাদেশ চর্চা; প্রথম প্রকাশ :মে ২০০৮; পৃষ্ঠা:৩১।
[৫৪৮] আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১২ মার্চ ১৯৪৮।
[৫৪৯]মাযহারুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪,পৃষ্ঠা-১২৩।
[৫৫০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৫।
[৫৫১] সৈনিক , ৯মার্চ ১৯৫২।

১৯৬৮ সালের আগারতলা ষড়যন্ত্র মালমলার প্রতিবাদে আন্দোলনের স্লোগান উঠে-" জাগো জাগো বাঙালি জাগো", "জেলের তালা ভাঙ্গব, শেখ মুজিব কে আনব" [৫৫৩]। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় যেসব স্লোগান জনমনে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তা এই রকম ছিল-" আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ", "জাগো বাঙালি জাগো" জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো", [৫৫৪]। "আইউব মোনায়েম ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই"[৫৫৫]।

১৯৭০ সালে গণ আন্দোলনের সময় বেশ কিছু স্লোগান বাঙালি মনের মুক্তির জন্য মুক্তির আন্দোলনে তথা নিবার্চনী প্রচারনায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করে যেমন- "নৌকা মার্কায় দিলে ভোট , শান্তিপাবে দেশের লোক", পদ্মা মেঘনা-মধূমতি নৌকা ছাড়া নাইকো গতি", "আওয়ামী লীগে দিয়া ভোট বীর বাঙালী বাধো জোট","গাছের আগায় পক্ষী, শেখ মুজিব লক্ষি", "স্বাধীনতার শপথ নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন"[৫৫৬]। এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান ছিল" জয় বাংলা" বঙ্গবন্ধু নিজে ডন পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন- æJoy-Bangla was not a political slogan, Sheikh sahib said that the slogan was a slogan for autonomy, economic, and freedom of Bangladesh. It was also a slogan for the right of living and freedom of culture he added"[557]|

১৯৭১ সালে চলমান গণআন্দোলনে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করেছিল সেসব স্লোগান হলো- "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলদেশ স্বাধীন করো", "গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়, মুক্তি বাহিনী গঠন কর"[৫৫৮]। "পরিষদ না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ"[৫৫৯]

তবে আমরা যে প্রতিবাদী জাতি তাতে মোটেও সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকে তাকালেও তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালি জাতি একটি স্বাধীনচেতনা ও প্রতিবাদমুখর জাতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান, দেয়াল লিখন, পোষ্টার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষার বাস্তব রূপ বিভিন্ন রকম।

---

[৫৫২] আবু আল সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা নং ৭৯।
[৫৫৩] প্রাগুক্ত, পৃষাঠা-১৬৮।
[৫৫৪] এ এফ এম আব্দুল জলিল, পাঁচ হাজার বছরের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, কাকলি পাবলিসার্শ,খুলনা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৩৪৮।
[৫৫৫] ডঃ মোহাম্মদ হাননান, হাজার বছরের বাংলাদেশ, আগামী প্রকামনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০০।
[৫৫৬] আবু সাঈদ খান, স্লোগানে স্লোগানে রাজনীতি, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা-২২।
[৫৫৭] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশর স্বাধীনতার যুদ্ধ দলির পত্র, ২য় খন্ড, গুপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের তথ্য মনত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৬৫৮।
[৫৫৮] ডঃ মোহাম্মদ হাননান, হাজার বছরের বাংলাদেশ, আগামী প্রকামনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬১৪।
[৫৫৯] কৃত্তি রাজ ওং, আমি শেখ মুজিব বলছি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৩৬।

অস্থিরতা ঃ বাংলাদেশের জনগণের জন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্থিরতা-ভাবপত্র। মিছিল মিটিংয়ে যখন উচ্চারিত হয় জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো, অথবা 'অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, এখন এর মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতাই প্রতিফলিত হয়।

অহিষ্ণুতা ঃ অসহিষ্ণুতা রাজনৈতিক অঙ্গনের আর একটি অনুষঙ্গ সহিষ্ণুতা যেখানে সিভিক কালচারেও অনিবার্য শর্ত, সেখানে বাংলাদেশেও পজিটিক্যাল কালচারের ঠিক এ সময়ে বিরাজ করছে চরম অসহিষ্ণুতা। স্লোগান, দেয়াল লিখন ও বিবৃতি যেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়। দেখা যাবে এক দল অপর দলকে কোনোক্রমে সহ্য করতে পারছে না। আর নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই এতটাই প্রকট যে স্লোগান ওঠে... "চামড়া, তুলে নেই আমরা"[৫৬০]।

অরজাকতা ঃ অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে অরাজক অবস্থার। ভাঙচুর, লাঠালাঠি, মারামারি, বোমাবাজি, গুলি, জ্বালাও-পোড়াও, লুটতরাজ বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে। এর প্রভাব বক্তৃতায়, মিছিলে, বিবৃতিতে, এমনকি দেয়ালে স্লোগান ওঠে "বুবুজান ও ভাবীজান, 'বাংলা ছেড়ে চলে যান", "রক্ত রক্ত রক্ত চাই" বা "ধইরা ধইরা জবাই কর"।

দ্বন্দ ও বিদ্বেষ ঃ একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে যে ওয়ার্কিং রিলেশন থাকা দরকার, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তা অনুপস্থিত। রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন লাঠালাঠি সংঘর্ষ একটা নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার, তেমনি দেয়ালেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। প্রতিস্থাপন ব্যাপারটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গেছে গোলাম আযম ইস্যুকে কেন্দ্র করে। যেমন কেউ লিখেছে-"গোলাম আযমের ফাঁসি চাই" প্রতিপক্ষ ফাঁসি মুছে দিয়ে 'মুক্তি' লিখে দিয়েছে। আবার কেউ অধ্যাপক শব্দের আগে রাজাকার লিখে দিয়েছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বাহিরে আরো দেখা গেছে তা হলো বিকৃত করা, অদুরেই বিরূপ মন্তব্য লিখে দেয়া। এছাড়া দেয়ালগুলোতে সারাক্ষন সঠিক বা পরিপূর্ন রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে অপবাদ আকীর্ণ রয়েছে[৫৬১]।

ভাবদর্শের সংঘাত ঃ ভাবদর্শের তীব্র সংঘাত চলছে বাংলাদেশে ভাবদর্শের পালাবদলের একটি গুরত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে ১৯৭৫ সাল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে চারটি মূল নীতি গ্রহণ করা হয়। এসব হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপিত হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিতর্কিত বিষয়ে রূপ নেয় এবং বর্তমানেও দেখা যায়। দেয়াল লিখন ও স্লোগানে এসব বিতর্কই নানাভাবে নতুন করে উপস্থাপিত হচ্ছে, যেমন ইসলাম

[৫৬০] প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা-৩১।
[৫৬১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।

বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাঙালি বনাম বাংলাদেশী, সমাজতন্ত্র বনাম অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্থ সমাজতন্ত্র, মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার, স্বাধীনতার স্বপক্ষ বনাম স্বাধীনতার বিপক্ষ ইত্যাদি।

জাতীয় সংকট ঃ বিগত ১৯৯০ এর গনঅভ্যুত্থান এবং তৎপরবর্তী এক দশকের সমীক্ষা করলে দেখা যায় একটির পর একটি সংকট আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনকে বারবার করছে আলোড়িত। ১৯৯০ সালের স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, দেয়াল লিখন ছিল এরশাদ স্বৈরচার বিরোধী গণতান্ত্র প্রত্যাশী। '৯২-এর ইস্যু ছিল গোলাম আযম, ১৯৯৪-এ তাসলিমা নাসরিন, '৯৫ এ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন ও '৯৭-এ উপ আঞ্চলিক জোট। জোট কথা ভারত বিদ্বেষ, '৯৮ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, '৯৩-এ ট্রানজিট, ২০০০ সালে জননিরাপত্তা আইন তথা আওয়ামী সরকার হটাও এর এক দফা আন্দোলন।

ধর্মীয় ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা বক্তব্যে ধর্ম আর একটি অনিবার্য বিষয় রাজনৈতিক স্োগানে, দেয়াল লিখনে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের পোস্টার ও লিফলেটে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ডান ধারার দলগুলো 'নারায়ে তকবীর আলাহ আকবার' ব্যবহার করেছে উদ্বোধীন স্লোগান ও লিখনের প্রথমে। আওয়ামী লীগসহ বামধারার দলসমূহ উদ্ধোধনী স্লোগান হিসেবে কখনো 'নারায়ে তকবির' ব্যবহার করেনি। তবে তাদের পোস্টার ও লিফলেট অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাহ আকবার-এর বাংলা প্রতিশব্দ আলাহ সর্বশক্তিমান ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া সেখানে 'লা ইলাহা ইলালাহু' নৌকার মালিক তুই আলাহ' ঐ রকম উচ্চারণ ছিল বহুল। নির্বাচনী সভাগুলোতে ইসলামী সম্বোধন এবং 'আসসালামু আলাইকুম' 'খোদা হাফেজ' এবং ইসলামী পরিভাষা (ইনশালাহ, মাশালাহ ইত্যাদি) এর ব্যবহার ছিল ব্যাপক। তাছাড়া '৯৬-এর ১২ জুনের নির্বাচনে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার ইসলামী পোশাক (মাথায় কালো রংয়ের হেজাব) ব্যবহার। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সর্বত্র 'আলাহর আইন আল কোরআনের পার্লামেন্ট ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেছে। মধ্যপন্থী বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি 'আলাহর প্রতি আস্থা ও ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলেছে"[৫৬২]।

উত্তরাধিকারের রাজনীতি ঃ বাংলাদেশে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সম্বোধনী নেতৃত্বের উত্তরাধিকার রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক একটি উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বড় দুটি রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ শেখ মুজিবুর রহমান অন্যটির আদর্শ জিয়াউর রহমান। দুটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার, দেয়াল লিখন স্লোগানও বক্তব্যে ওই প্রয়াত দুই নেতার উপস্থিতি অনিবার্য। জাতির পিতা ও স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক ও

[৫৬২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলার রূপকার হিসেবে জিয়াউর রহমান প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি পোস্টারে এবং প্রতিটি আলোচনায় ব্যবহার করা হচ্ছে দুজন নেতার নাম ও প্রতিকৃতি। যেমন "যত দিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান, তত দিন জলে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান" অথবা "জিয়া তুমি আছ মিশে, সারা বাংলার ধানের শীর্ষে। এ রকম হাজার স্লোগান প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে দেশজুড়ে।

ব্যক্তিপ্রাধান্য ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আরো লক্ষ্য করা যায়, উপযুক্ত সম্মোহনী নেতৃত্বের বাইরে যেসব রাজনৈতিক নেতা ও রাজনৈতিক দল আছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যাক্কার জনকভাবে ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্ত। তাদের স্লোগান পোষ্টার ও লিফলেট, দেয়াল লিখনে দেখা যায় নানা রকমের খেতাব যেমন "কিংবদন্তির মহানায়ক" "সময়ের সারনী সন্তান"। "সুর্য সারণী", "রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা", "অকুতোভয় রণতুর্কী" ইত্যাদি অভিধায় অভিষিক্ত হচ্ছে। গ্রেপ্তার, হুলিয়া, জেল খাটা ইতিবাচক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মৌল সমস্যার অনুপস্থিত ঃ বাংলাদেশে হাজারও মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও একটি বিস্ময়ের ব্যপার এই যে, স্লোগান, পোস্টার, দেয়াল লিখনে জাতীয় মৌল সমস্যা তেমনটি দেখা যায় না, যেমন ক্ষুধা, দারিদ্র, দুর্নীতি, বেকারত্ব ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সুষ্ঠু কোনো বক্তব্য নেই। তাদের বক্তব্য হচ্ছে হালকা ধরনের। যেমন "অ-সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ গড়তে হবে" অথবা "ভাত কাপড় বাসস্থান, ইসলাম দেবে সমাধান"-এ ধরনের বক্তব্য সমস্যার গভীরে প্রবেশ করছে না।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ বাংলাদেশের প্রায় এক দশকের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক স্লোগান পোষ্টার, লিফলেট বেশি প্রতীয়মান হয়। যেমন লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই' "চামড়া, তুলে নেব আমরা'।

স্বাবিরোধিতা ঃ স্ববিরোধিতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিনিয়ত যে সমস্ত বক্তব্য বা নীতি আদর্শ প্রচার করে, বাস্তবে কাজ করে তার পুরো উল্টো। যেমন বাংলাদেশের এমন কোনো ছাত্র সংগঠন নেই, ছাত্র সমাজের বিরূদ্ধে, অস্ত্রধারীদের বিরূদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে না। 'কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে মাস্তন মোটেই কমছে না। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে ছাত্র সংগঠনগুলোর কিন্তু সাধারণ স্লোগানের উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে। যেমন,

- সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে, লড়তে হবে একসাথে-**ছাত্রদল**।
- সন্ত্রাসীদের কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও-**ছাত্রদল**।

Dhaka University Institutional Repository

- অস্ত্র ছাড়ো কলম ধরো, শিক্ষাজীবন রক্ষা করো'-**ছাত্রফ্রন্ট**।
- সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কট করন -**ছাত্র লীগ**।
- চাই সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানের সম্মেলন-**ইসলামী ছাত্রশিবির**।
- সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক সংগঠনসমূহ বর্জন করো-**সমাজবাদী ছাত্রজোট**।
- সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়স্থল বন্ধ করো-**জাতীয় ছাত্রদল**।
- হল থেকে দল থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করন-**সংগ্রামী ছাত্রফন্ট**।

দৃশ্যত ছাত্ররা যা বলছে, করছে তার উল্টোটা[৫৬৩]।

বিরোধিতা ঃ বিরোধি স্লোগান ও অন্যের কাজের বিরোধিতা করা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। নিন্মে এ ধরনের কিছু স্লোগান ও দেয়াল লিখনের নমুনা প্রদান করা হলো।

- বুশ ভারতের দালালের হুঁশিয়ার সাবধান।
- মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাধ ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও।
- সিকিম নয় ভুটান, নয়, এ দেশ আমার বাংলাদেশ।
- গঙ্গার পানির ন্যায্য হিসাব চাই
- রশ, ভারত, মার্কিন, ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।
- হটাও ভারত বাঁচাও দেশ।
- ভারতের দালালেরা হুশিয়ার সাবধান।
- সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে, প্রভু নাই।

আকাশকুসুম বিপবের বাণী ঃ বাংলাদেশের নানারকম, স্লোগান ও দেয়াল লিখন বাণী দেখে যে কেউ আশা করতে পারেন, সমাজ পরিবর্তনের বিপব নিশ্চয়ই খুব সন্নিকটবর্তী নিন্মে এ রকম কিছু দেয়াল লিখন প্রদান করা হলো।

- এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়।
- বিপব ধ্বংসের তান্ডবলীলা নয়, সৃষ্টির প্রসববেদনা মাত্র।
- আমাদের এমন একটি ছেলে দাও, যে বলবে আমি ঘরের নই, পরের; আমি আমার নই; দেশের
- শিল্প আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপব, বিপব আনে মুক্তি ইত্যাদি।

উদ্দীপনা মূলক স্লোগানঃ এই স্লোগানে বিভিন্ন ন্যায্য দাবি আদয়ের জন্য আন্দোলনকারীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যেই মূলত স্লোগান উচ্চারিত হয়। যেমন- "এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও , মুক্তিসেনা মুক্তিসেনা"। [৫৬৪]

দাবী মূলক স্লোগানঃ এই রূপ স্লোগান গুলি সাধারণত নানারূপ দাবি আদায়ের জন্যও আন্দোলনকারীদের মুখে উচ্চারিত হতো যেমন রাষ্ট্রভাষার দাবি বা শেখ মুজিবকে জেল মুক্তির স্লোগান গুলি । "বাংলাদেশকে সমর্থন দাও, সমর্থন দাও" এই স্লোগন গুলিতে আন্দোলনকারীদের নানারূপ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।[৫৬৫]

---

[৫৬৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫।
[৫৬৪] স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্যাকার্ড ও পোস্টার, বাংলাদেশ চর্চা; প্রথম প্রকাশ :মে ২০০৮; পৃষ্ঠা:২৬।

শুভকামনা মূলক স্লোগানঃ বীরযোদ্ধা, প্রিয় নেতা ও প্রিয় মাতৃমূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সমর্থন প্রকাশের জন্য এই স্লোগান গুলি আন্দোলনকারীদের মুখে উচ্চারিত হতো। যেমন বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হোক বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ইত্যাদি[৫৬৬]।

লব্ধ গবেষণা উপকরণ এবং ইতোপূর্বের ব্যাখ্যা-বিশেষণ থেকে এ উপসংহার উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনও পরিপক্কতা অর্জন করেনি। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর স্লোগান, দেয়াল লিখন, পোস্টার, লিফলেট, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা বিশেষণ ও পর্যালোচনা করেছি। এতে যে সমস্ত গতি প্রকৃতি রয়েছে তা একটি খন্ডিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাত্ত বহন করে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্লোগান, দেয়াল লিখন, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির ভাষাগুলো ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক, রুক্ষ্ম, যুদ্ধংদেহী ও সাংঘর্ষিক প্রকৃতির, যার সঙ্গে জাতীয় কল্যাণকর প্রবণতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং বাস্তবতা বিবর্জিত ও সব সময়ই উসকানিমূলক একটি গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে যা আমূল পরিবর্তনের দাবি রাখে।

৮.২১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব

ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে খুবই স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যাপার। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অস্থিরতা অবশ্যই বিদ্যমান। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, তাদের অস্থিরতার কারণগুলো রাজনৈতিক, আদর্শ-ভিত্তিক, বিষয়ক ভিত্তিক এবং জাতীয় ও অন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রূপ ধারণ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবাদগুলো স্থানীয়, ব্যক্তিগত এবং ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক। বর্তমান যুব সমাজকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী অসনশীল এবং আক্রমণাত্মক কার্যে লিপ্ত হতে দেখা যায়। বর্তমান আন্দোলন এবং অস্থিরতার মূখ্য কারণগুলো পর্যালোচনা করলে শুধুমাত্র দুই জেনারেশনের মধ্যে ব্যবধানও ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা

[৫৬৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭।
[৫৬৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭।

যায় [৫৬৭]। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্য ভিন্নরূপ। পঞ্চাশ ষাট দশকে উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত। কিন্তু সত্তর দশক থেকে আশি দশক পর্যন্ত দেখা যায় নিম্নবিত্ত অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্ররা ব্যাপকভাবে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। নব্বই দশকে নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, কিয়দাংশ এবং উচ্চবিত্ত ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং তাদের সক্রিয়তা এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলেছে[৫৬৮]।

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস উজ্জ্বল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইউব বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ। তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিল ভিন্ন। সময়ের দাবিতেই ছাত্রশক্তি যুক্ত হয়েছে প্রতিবাদী আন্দোলন। তারুণ্যের নিঃস্বার্থ তেজোদীপ্ত ভূমিকা তাদের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাণিত মেধার ছাত্রছাত্রীরা যুক্ত হয়েছে রাজনীতিতে। জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের অনেকেরই আদর্শিক যোগাযোগ ছিল। অঙ্গ সংগঠনও তৈরি হয়েছে। তবে সেই সময় জাতীয় নেতাদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণতি হয়নি রাজনীতি সংশিষ্ট ছাত্রসমাজ। ফলে ছাত্র রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে আশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল [৫৬৯]।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির বিপবী ভুমিকা নেয়ার প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে যায়। যূথবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার কোনো বাস্তবতা না থাকায় জাতীয় দলের অঙ্গ সংগঠনের চিহ্নিত হওয়া ছাত্র রাজনীতির যার যার বলয়ে আটকে যায়। গত তিন দশকে ক্ষমতার রাজনীতিতে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রথমে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ। পরে বিএনপি ও আওয়্মী লীগ। এদের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনগুলোও যার যার বলয়ে আবর্তিত হতে থাকে। ক্ষমতা দখলের সূদরপ্রসারী ভাবনা মাথায় রেখে ছাত্র সংগঠনকে শক্তিশালী করতে থাকে জামায়াতে ইসলামী। ক্ষমতার মিছিলে না থাকলেও বাম রাজনীতিকরা আটপৌরে ও বিভ্রান্ত আদর্শে তাদের পরোক্ষ দলীয় বা সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মীদের যুক্তিবাদী হওয়ার বদলে বাস্তবতা বর্জিত অন্তঃসারশূণ্য তর্কবাদী তারুণ্যে পরিণত করেছে[৫৭০]।

তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সংসদ অধিবেশনে বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি আইন করে বন্ধ করে দেবেন। শিক্ষাঙ্গন সমূহে ছাত্র রাজনীতির নামে বীভৎস সন্ত্রাসী, হানাহানি,

[৫৬৭] প্রফেসর ড. শওকত আরা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ রাজনীতির বিকাশ ও জনপ্রিয়তা, কমল কুঁড়ি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-একুশ বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩২।
[৫৬৮] প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা-৩৩।
[৫৬৯] এ কে এম শাহনাওয়াজ, সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯), নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ২০০১,পৃ৪২৩।
[৫৭০]প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা-

চাঁদাবাজি, জবরদখল চলছে তা অবশ্যই ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ এবং আমাদের সব 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই স্থবির, বিশৃঙ্খলপূর্ণ এবং প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন করে তুলেছে। এহেন মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর উচ্চারণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলেও কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ ও যথার্থ সে প্রশ্ন বিবেচনা করা যায়।[৫৭১] বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে রাজনীতিবিদদের প্রতি পরামর্শ রেখেছিলেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সে সময়ে নাগরিক সমাজের কোনো কোনো অংশের সমর্থন তিনি পেলেও রাজনীতি সংশিষ্ট সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সে সময়ের প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী অর্থাৎ খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বন্ধে সম্মত হলে তিনিও তা-ই করবেন।[৫৭২] রাজনীতিবীদদের কেউ কেউ এই বিজ্ঞ প্রাক্তন বিচারপতিকে তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন , কত বড় ভুল তিনি করেছেন! ছাত্ররা রাজনীতি না করেলে রাজনীতির চর্চা হবে কি করে? সমাজ সচেতন সৃষ্টি করবে কারা? ভবিষ্যৎ জাতীয় রাজনীতির হাল ধরবে কে? এসব বড় তত্ত্বকথা দিয়ে 'ডান' 'বামের' প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ রাষ্ট্রপতির চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে দেখাতে চেয়েছেন। তারা বুঝতে চাননি (বুঝে গেলে সুবিধার বল নিয়ে খেলা যাবে না ভেবে) যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির দুশ্চিতা চিরায়ত ছাত্ররাজনীতি নিয়ে নয়, ছাত্ররাজনীতির নামে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ক্যাডার যন্ত্রের যে আধিপত্য তা নিয়ে। আমাদের তথাকথিত রাজনীতির তাত্বিক এবং রাজনীতি সচেতন বুদ্ধিজীবিগণ মহামাণ্য রাষ্ট্রপতির আহবানের সারবত্তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু একবারও বলেননি ক্যাডারতন্ত্রের আধিপত্যের ভিতর থেকে সুস্থ রাজনীতি বেড়ে উঠতে পারে না। তাই স্বপ্নের ছাত্ররাজনীতি তথা তাত্ত্বিকগণের ছাত্র রাজনীতিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে হলে ক্যাডারতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে[৫৭৩]।

বাংলা তথা এই ভারতীয় উপমহাদেশে কখন থেকে ছাত্র রাজনীতি শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তবে ফরাসি বিপবের সাফল্য যখন ইংরেজ-শাসিত ভারতেও আসতে আরম্ভ করে, ১৮৩০ সালের ছোট্ট একটি ঘটনা-ইংরেজরা কলকাতার মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভ তৈরি করে যার নাম অক্টোরলনি মনুমেন্ট তার ওপর ইংরেজ শাসনের নিদর্শন ইত্যাদি। জ্যাক উড়িয়ে দেয় ইংরেজ বেনিয়া। তার ছদ্মবেশ তখনও খসে পড়েনি। তার মানদন্ড তখনও মানদন্ড হয়ে দেখা দেয়নি। কলকাতায় কয়েকজন ছাত্র গভীর রাতে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে সেখানে ওড়ায় ফরাসি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার তিন রঙের পতাকা।[৫৭৪]

---

[৫৭১] ড. শামসুল আলম মোহন; শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-রাজনীতির নামে লেজুড়বৃত্তি চলতে দেয়া যায় না, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃঃ ৫।
[৫৭২] প্রাগুপ্ত।
[৫৭৩] এ কে এম শাহনাওয়াজ, সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯), নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ২০০১,পৃষ্ঠা-৪০৯।
[৫৭৪] কে এম সোবহান, নষ্ট রাজনীতির শিকার, দৈনিক ইত্তেফাক, পৃঃ ৫, ৭ জানুয়ারি, ২০০২।

এরপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেল হলে ছাত্ররা কালো ব্যাজ ধারণ করে তার প্রতিবাদ করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদেও ছাত্ররা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী পণ্য বর্জন করার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করে এবং ১৯০৫ সালে হিন্দু কলেজে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯২১ সালের শুরুতেই ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের ডাক দেয় ও মিছিল মিটিং করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এ ঘটনায় আবেগাপুত কণ্ঠে বলেন, বাংলার ছাত্রসমাজ, আমি তোমাদের নমস্কার করি'। গান্ধিজি বলেন, 'বাংলার ছাত্রসমাজই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই'। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে হরতাল এবং ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ এবং তার প্রতিবাদে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং প্রথম ছাত্রীদের আন্দোলনে যোগদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বরে ছাত্র ফেডারেশন নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি করে নতুন কর্মসূচি দেয়।

১৯৪০ সালে মুসলীম ছাত্রলীগ গঠিত হয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনকে ছাত্ররা রাজনীতিকরণ করে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছাত্র আন্দোলনকে গৌরবের শীর্ষে উপনীত করে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নানা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিজেদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে চিরস্থায়ী করে রাখে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাস দুর্ভাগ্য বশত ছিল অতি শোচনীয়। স্বাধীনতা লাভের পর যে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার আশা ছিল, জনগণ তা পায়নি। কারণ বহুবিধ এবং নানাজন এ বিষয়ে নানা কারণ দর্শায়। সকলেই আশা করেছিল যে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ছাত্রসমাজ মন, প্রাণ ও সময় তাদের প্রয়োজনীয় পড়াশোনার ওপর ব্যয় করবে।[৫৭৫]

স্বাধীনতার পর থেকেই লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রসমাজকে নিজদলীয় রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে রাজনীতির দুষ্টচক্রে ছাত্র রাজনীতি জড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয় রাজনীতিতে তারা যে ভূমিকা স্বাধীনতার পূর্বে রেখেছিল, সেখান থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটে। ছাত্রসমাজ নানা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার কারণে তারা ক্ষমতাসীন দলে এবং ক্ষমতার বলয়ে প্রবেশ করে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের দূর্বলতার কারণে ছাত্র রাজনীতিতে নিজদলীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।[৫৭৬]

[৫৭৫] এম এম রেজাউল করিম; বিগত দিনের ও বর্তমানের ছাত্র-সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারি, পৃঃ ৫।
[৫৭৬] কে এম সোবহান, নষ্ট রাজনীতির শিকার, দৈনিক ইত্তেফাক, পৃঃ ৫, ৭ জানুয়ারি, ২০০২।

জেনারেল জিয়াউর রহমানই প্রথম রাজনীতিক দলের অঙ্গ দল হিসেবে ছাত্রদল গঠনের আইনসিদ্ধ অধিকার ঘোষণা করে ছাত্রদের রাজনীতিক বিভিন্ন দলের হয়ে ন্যায় অন্যায় নির্বিশেষে সব কাজে অংশগ্রহণের দায়িত্ব ও প্রকাশ্য অধিকার দান করেন [৫৭৭]।

ছাত্রাবাসে এবং ক্যাম্পাসে মিছিল, মিটিং, শোভাযাত্রায় চলে অস্ত্রের প্রকাশ্য মহড়া। বিরোধীদলীয়দের সঙ্গে এবং নিজেদের দলীয় অন্তকোন্দলে দিবালোকে প্রকাশ্য অস্ত্রের ব্যবহারে ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র নিহত হতে থাকে। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে ছাত্র সংঘর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হয়েছিল ১৫ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ ডজনের ওপর। ফলে মাসের পর মাস এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থেকেছে। [৫৭৮] উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনি হতাশা জনক পরিস্থিতির কারণে সে সময় প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য শুধু ভারতেই গমন করে।

বর্তমানে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে সন্ত্রাসের প্রকোপ ঘটছে তার কেন্দ্রবিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। মুখ্যত ছাত্র রাজনীতি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের মূল উৎস। রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে এ কারণে লালনকরতে বাধ্য হচ্ছে যে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও নেতা নেত্রীরা তাদের ছেলে মেয়েদের বিদেশেরেখে পড়াশুনা করান, পরের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে তাদের ক্ষমতার পথ নিষ্কন্টক করতে একটুও কসুর করেন না। শুধুমাত্র ক্ষমতা আরোহণ যখন রাজনৈতিক দলের মুখ্য লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন সব ধরণের মানবিক মূল্যবোধহীন রাজনীতি, জাতি এবং সমাজের জন্য কী ভয়াবহ ফল বয়ে আনতে পারে বাংলাদেশ হল তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের দরকারে ছাত্ররা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং পড়া উচিৎ। এরকম ঘটনা ১৯৭১ সালে ঘটেছিল। কিন্তু ছাত্রদের প্রধান কাজ পড়াশুনা করা। পড়াশোনার অংশ গৌণ হলে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। আজকের বাংলদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে অন্য ইস্যুকে শিক্ষার চাইতে বড় করে তোলা হয়েছে[৫৭৯]।

ছাত্র রাজনীতিতে জাতীয় রাজনীতি বা দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এমনই মাত্রায় উঠেছে যে, তাদেরই বক্তৃতা-বিবৃতির ভাষ্য অনুযায়ী ছাত্রদলের কাছে যেমন বেগম খালেদা জিয়া হচ্ছেন অস্তিত্বের প্রথম ও শেষ ঠিকানা, ছাত্রলীগের কাছে তেমনি শেখ হাসিনা হচ্ছেন অস্তিত্বের প্রথম ও শেষ ঠিকানা। নেতা-নেত্রী হিসেবে তারা তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথা সমাজের স্বার্থ না দেখে শুধু নিজেদের অর্জন বা

---

[৫৭৭] শরীফ, আহমদ, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা রাজনীতির সঙ্কট, মহাকাল, প্রথম প্রকাশ -ফেব্রুয়ারী ২০১৪।
[৫৭৮] ড. শাসুল আলম মোহন; শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র-রাজনীতির নামে লেজুড়বৃত্তি চলতে দেয়া যায় না, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০১।
[৫৭৯] ছফা, আহমদ, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা,প্রকাশ কাল-ফেব্রুয়ারী ২০১১,পৃষ্ঠা- ৬১-১৬২।

স্বার্থটাই বড় করে দেখছেন। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর খানিকটা বেশি দায়িত্ব আছে, সেটি হলো জ্ঞানের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি নয়, বরং এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথা দরিদ্র ও ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ এই লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর জন্য বছরে কয়েকশত কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং এই টাকা এ দেশের জনগণের টাকা। অথচ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছে না। এমনকি জ্ঞান আহরণ এবং বিতরণের যে কাজ, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে কাজ তা বিঘ্নিত হচ্ছে, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও কখনও কখনও এই স্বাভাবিক শিক্ষা কর্মকান্ড সম্পূর্ণ ভাবে বিষণ্ন হয়েছে।[৫৮০] বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অস্ত্রবাজিতে লিপ্ত তারা কি ছাত্র? এর উত্তর সাধারণ ভাবে দিতে গেলে হবে 'না'। উত্তর হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মাফিক প্রথম বর্ষে্ণাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে এবং নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করছে এমন ছাত্র অস্ত্রবহন করছে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল। যখন ক্যাম্পাসে বন্দুক যুদ্ধ হয় তখন আসলে বাইরে থেকে অস্ত্র ও অস্ত্রবাজদের আমদানি করা হয়। এদের নেতৃত্বদেয় অনিয়মিত ভাবে বা বাঁকা পথে ভর্তি বা পুনঃভর্তি হওয়া ছাত্র, যাদের মধ্যে কেউ কেউ অস্ত্রবাজও। উলেখ্য ছাত্র রাজনীতির বা ছাত্র সংগঠনগুলোর মূল নের্তৃত্বে যারা রয়েছেন তারা কেউ ছাত্র নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, অস্ত্রবাজী ক্যাম্পাসে কেন হয়? এর সরাসরি কারণ চাঁদাবাজি। বলা বাহুল্য সব ছাত্র সংগঠনেরই মুরব্বি দল আছে[৫৮১]।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য **কিছু সুপারিশ কার্যকর হতে পারে-**

১. ছাত্র সংগঠন গুলোকে রাজনৈতিক দল থেকে বিযুক্ত করা যেতে পারে।

২. প্রচলিত নিয়মের বাইরে কোনো অবস্থাতেই ছাত্র হিসেবে কাউকে ভর্তি বা পুনঃভর্তি করা হবে না। একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার পরে হলে সীটও বাতিল করা যেতে পারে।

৩. হলের আসন-বন্টনও একটি প্রনীত ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পূবাহ্নে প্রচারিত বিধিবিধানের মধ্যে হতে হবে।

৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ছাড়া কেউ ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্র বহন করতে পারবে না।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের টেন্ডার আহবান থেকে শুরু করে সকল নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পি-ডাবিউ-ডি কে দেয়া যেতে পারে।

---

[৫৮০] অধ্যাপক আনোয়ার উলাহ চৌধুরী, সংকটের আবর্তে আজকের শিক্ষাঙ্গনঃ সমাধানের সন্ধানে; দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ আগষ্ট, পৃঃ ৫।

[৫৮১] মিঞা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, শিকড়, প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০২, পৃষ্ঠা-১৭১।

৬ . নির্মাণ কাজের জায়গায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উপরে যে সব শুপারিশ করা হয়েছে তার বাস্তবায়নে শর্ত হবে নিম্নরূপ-

ক. সকল বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রয়োজন হবে

খ. আইনকানুন বা বিধি-বিধান প্রয়োগে যে কোনো পর্যায়ে সংশিষ্ট প্রসাশন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ থাকবেন।

গ. বিধিবিধান প্রয়োগে সব মহল প্রশাসনকে সহায়তাদান করবে।

ঘ. সমস্যা সমাধানে সরকারের সদিচ্ছা অপরিহার্য। কিন্তু প্রশাসনসহ বিশ্বাবিদ্যালয়- পরিবারের সকলের একাগ্র ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া তা ফলপ্রসূ হবে না, এ-ও খেয়াল রাখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন, সীমাহীন দলীয়করণ ও দুর্নীতি; অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তরের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ছাত্রছায়ায় সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের ঘটনা। বিগত সরকারগুলোর আমলে দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারদলীয় প্রশাসন কায়েম করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর উচ্চ পদে নিয়োগ দান করা হয়েছে; যোগ্যতার মাপকাঠিতে নয় অতএব এই দলীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণ করেছে।[৫৮২] ৬ মে ১৯৯৯ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে সরকারী দল আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের দুইগ্রুপের মধ্যে আবার বন্ধুক যুদ্ধ হয়েছে। ছাত্রলীগের এই বন্দুকযুদ্ধে ৫৫টি গুলিবিনিময় হয়েছে। আর এই যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়েছে তিন জন[৫৮৩]। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ধীরে ধীরে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের কবল থেকে ছাত্রলীগের দখলে চলে যায়। এই পক্রিয়ায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আর পুলিশের সহায়তায় ছাত্রলীগ বিজয়ী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়[৫৮৪]। তবে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের এই যে সিট দখল, হল দখল, পাল্টা দখল, বন্দুকযুদ্ধ চলছে, তা বন্ধ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই বা কী করতে পারেন ? কারণ, দেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বা মন্ত্রীরা তো ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের কিছু বলেন না , কিছু করেনও না। বরং তিনি যা বলেন তাতে তারা সস্নেহে প্রশ্রয়ই পায়।[৫৮৫]

ছাত্ররা একেবারে রাজনীতি করবে না, এমন কলা বলা উদ্দেশ্য নয়। দেশের দরকারে ছাত্ররা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং পড়া উচিৎ। কিন্তু ছাত্রদের প্রধান কাজ হলো পড়াশোনা করা। পড়াশোনার অংশ

---

[৫৮২] প্রাগুপ্ত; পৃঃ ৫।
[৫৮৩] রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৪,পৃষ্ঠা-৬০।
[৫৮৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০।
[৫৮৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১

Dhaka University Institutional Repository

গৌণ হলে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। আজকের বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ যে এভাবে সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্র হয়ে দাড়িয়েছে, তার মুখ্য কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে অন্য ইস্যুকে (হাতিয়ার হিসেবে ছাত্র রাজনীতিকে) শিক্ষার চাইতে বড় করে তোলা হয়েছে। নেতা নেত্রীরা মুখ রক্ষার জন্য যাই বলুক না কেন তারা চান বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস টিকে আছে। এই রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিকে ক্ষমতার ক্রীড়াক্ষেত্রে হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে গণতন্ত্র তথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে [৫৮৬]। এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে।

৮.২২ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব

রাজনীতি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে নিজের সমাজকে বিন্যস্ত করে।[৫৮৭] আর রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্ম জনমতেরও উৎস বটে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

[৫৮৬]ছফা, আহমদ, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস : একটি রাজনৈতিক পাপ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১১।পৃষ্ঠা-১৬২।

[৫৮৭]. Markl, Peter, 1972, Political Community and change, Harper and row Publisher.

রয়েছে। আর মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রন করে।[৫৮৮] বাংলাদেশের রাজনীততে ধর্ম বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে।[৫৮৯] বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সহজ সরল। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই জনপদের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান যাদের বৈশিষ্ট্য ও কামনা । বাংলাদেশের সামাগ্রিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ভূখন্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজনীতিতে ধর্ম বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর স্বার্থগত আসনকে মজবুত করার প্রক্রিয়া হিসেবে।

মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ধর্মের অবদান অসামান্য হলেও মানব কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত এই ধর্মই মানুষকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শোষক শ্রেণী এর চেয়ে কার্যকর কোনো হাতিয়ার আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা হচ্ছে সবার ওপরে। এই স্বাধীনতা খর্ব করা হলে সে ধর্ম-কর্ম নিস্প্রাণ প্রথা সর্বস্ব ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। মানুষের জন্য ধর্ম নয়, ধর্মের জন্য হয়ে পড়ে মানুষ। মানুষে মানুষে মিলন, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।[৫৯০]

পাকিস্তান আমলেও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল।[৫৯১] ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতির্ন হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা উলেখযোগ্য কয়েকটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগাকিরগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হবে।[৫৯২] এ থেকে দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্ব তাদের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিবুর রহমানও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করেছেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের ব্যানারে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশ লাখ লোকের সমাবেশে শপথ পাঠ করেছিলেন। তারা শপথ নিয়েছিলেন ছয়দফার ব্যাপারে তারা ওয়াদা খেলাপ করবেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের শপথনামা পাঠ করিয়েছিলেন। এই

[৫৮৮]. মোহাম্মদ, ড. হাসান, ২০০৩, বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থ মেলা, ঢাকা।

[৫৮৯] . হোসেন, ড. সৈয়দ আনোয়ার, ১৯৯৯, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (মাওলানা আব্দুল আওয়াল সম্পাদিত), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

[৫৯০] মাওলানা আব্দুল আউয়াল, কলাম রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মার্চ, ২০০২ইং, পৃঃ ৭।

[৫৯১] আহমদ, আবুল মনসুর, শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০৩ / জুন ১৯৯৬, আহমদ বলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ১৪।

[৫৯২] আসাদ, আবুল, ২০০৫, একশ, বছরের রাজনীতি, বিসিবিএস , ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শপথনামার পুরোটাই ছিল ধর্মীয় মুল্যবোধ ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। আলাহর নামে এই হলফনামার শুরু হইয়াছিল। আরবী বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম এর হুবহু বাংলা তরজমা করে লেখা হয়েছিল পরম করুনাময় আলাহতালার নামে হলফ করে আমি অঙ্গীকার করছি যে আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করব......।[৫৯৩] এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের গোড়ার দিকে ধর্মের প্রতি, আলাহর প্রতি অনুগত্য ও বিশ্বাসের বিষয়টিই স্বাধীনতার মুল্যবোধ ও চেতনা বলে স্বীকৃতি হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তনী বাহিনী আক্রমণে জাপিয়ে পড়লে শেখ মুজিবর রহমান যে ঘোষনা পত্র সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল সেই বক্তব্যের শেষাংশ ছিল ”আলাহ আপনাদের মঙ্গল করুন........”।[৫৯৪] ধর্মীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করেই যে দেশের সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল তার উৎকৃষ্ট জনির মেলে ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি যে নির্দেশনাবলী প্রদান করা হয় তার মধ্যে। নির্দেশাবলীর শীর্ষেই লেখা ছিল “ আলাহ আকবর”। তার পর স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। সর্বশক্তিমান আলাহর উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকুন। স্মরণ করুন: আলাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অতীতের চাইতে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সুখকর। বিশ্বাস রাখুন আলাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।[৫৯৫]

উপরোক্ত নির্দেশাবলী ছিল সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে। এটি ছিল প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশ নামা। এটি শুরু হয়েছে আলাহ আকবর দিয়ে। শেষ হয়েছে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত দিয়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসরিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন।[৫৯৬] একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবর লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ইসলামী ফাউন্ডেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়[৫৯৭]। আওয়ামী লীগের অনুসারী ধর্মীয় নেতাদের সংগঠন আওয়ামী উলামা পরিষদ কে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার সময়েও কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের একজন মন্ত্রী এক ভাষনে বলেন যে, বাংলাদেশের ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল এবং তার দল ইসলামী আদর্শ, শান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।[৫৯৮]

---

[৫৯৩] উৎস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ১৯৮২, গণজপাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণলায়, তৃতীয় থন্ড।

[৫৯৪] অর রশিদ, ড. হারুন, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০, প্রথম প্রকাশ ,১ ফেব্রুয়ারি ২০০১, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৯৩।

[৫৯৫] উৎস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ১৯৮২, গণপ্রজপাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণলায়, তৃতীয় থন্ড।

[৫৯৬] হোসেন, ডা. কাহাদাত , জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৃতীয় সংস্করণ ; সেপ্টম্বর ২০০৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-৭১।

[৫৯৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

[৫৯৮] মোহাম্মদ, ড. হাসান, ২০০৩, বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থ মেলা, ঢাকা।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এ দেশে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ দানের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিকে নতুন ধারা ও বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন।[৫৯৯] ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনী সংবিধানের প্রারম্ভে বিসমিলাহ হির রাহমান আর রহিম শব্দ গুলো সন্নিবেশিত করে সংবিধানকে ইসলামী রং দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ইসলামী দেশ সমূহের সাথে ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন ধর্ম হিসেবে ইসলাম থাকবে সকলের শীর্ষে বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ। এবারের সংগ্রাম দেশকে ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রাম। ১৯৮৩ সালের ২৮ জানুয়ারী ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ইসলামের আদর্শ ও রীতিনীতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করতে হবে। ইসলামের যারা শত্রু, আমাদের সংগ্রাম চলবে তাদের বিরুদ্ধে, আমরা বাংলাদেশকে করবো একটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম করা হয়।[৬০০]

রাজনীতিতেও ধর্মের ব্যবহারের দিক থেকে খালেদা জিয়া তার পূর্বসূরীদের পথই অনুসরণ করেন। তিনি তার বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিজের অনুকুলে আনার চেষ্টা করেন। পয়লা অক্টোবর ১৯৯৪ ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপির উদ্যোগে এক মহাসমাবেশে বক্তৃতা কালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলকে আক্রমন করে বলেন যে বিরোধী দল বিসমিলাহ খেয়ে ফেলতে চায়। তিনি জামায়েতে ইসলামীর সমালোচনা করে বলেন, ইসলামের কথা বলে আরেকটি দল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন যারা বলে আমরা ক্ষমতায় গেলে সংবিধান থেকে বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম উঠিয়ে দেবো, চার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করবো, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করবো, তাদের সঙ্গে ঐক্য করে বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, তাদের সঙ্গে ঐক্য করে বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম রক্ষা করতে পারবেন? ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিতে পারবেন? আজ তারা এক হয়ে ইসলাম ও বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে চায়। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিএনপি নির্বাচনী প্রচারনার অন্যতম উপাসনা ছিল ধর্ম। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটারদের ধর্মীয় অনুভুতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রচার করে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিপন্ন হবে, সংবিধান হতে ইসলাম উঠিয়ে দেবে, মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি দেবে ইত্যাদি।

---

[৫৯৯] হক, ড. আবুল ফজল, বাঙলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি , সপ্তম সংস্করণ, জুন ২০০০, টাউন স্টোর্স, রংপুর, পৃষ্ঠা-১৮২।
[৬০০] প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-২০০।

১৯৯৬ সারের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা দেখতে পাই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল কিন্তু এ বিজয়ের পেছনে ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্মকেই পুঁজি বা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের মাস খানেক পূর্বে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ওমরাহ পালনে সৌদি আরব যান এবং সেখান থেকে ফিরে মাথায় কালো স্কার্ফ, শাড়ির বদলে ইসলামী পোষাক হিসেবে বোরকার আদলে সালোয়ার কামিজ, হাতে তসবিহ পড়ে প্রতিটি নির্বাচনী জনসভা এবং প্রচারচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের প্রতিটি নির্বাচনী পোস্টারে তসবিহ হাতে শেখ হাসিনার দু হাত তুলে মোনাজাতের ছবিটি ব্যবহার করা হয় এখানেই শেষ নয়, যে দলটি সারাজীবন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করলো, জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানে বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজকে তীব্র সমালোচনা করল, এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়ার সমালোচনায় মুখর ছিলো, চরম বিরোধীতা করেছিল, সেই আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী পোস্টার, ব্যানার প্রচারপত্র তথা অন্যান্য ডুকমেন্টে আলাহ সর্বশক্তিমান লেখার ব্যবহার শুরু করে। আর রাজনীতিতে ইসলামী মুল্যবোধকে এভাবে ব্যবহার করেই মুলত আওয়ামী লীগ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নাড়া দিতে সক্ষম হয় এবং নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ি দিয়ে সরকার গঠন করে। 'ভোটের জন্য ধর্মের এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবহার আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সব সময়ই করে থাকে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টতে লেখা ছিল যে তারা কোরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করবেন না। প্রত্যেকবারই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টতে এই অঙ্গীকার থাকে। বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনেও তাই ছিল। এ দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী বা বিএনপি সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো পার্থক্য নেই।”[৬০১]

শুধু এভাবেই নয়, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিভিন্ন রূপ আছে যেমন, যেসব এলাকায় নির্যাতন হয়েছে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সাধারণ লোকেরা ধর্মীয় মুসলমানরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়ে কোনো নির্যাতন করেছ বাস্তব ঘটনা মোটেই যে রকম ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে প্রচারকাজ এমন ভাবে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীর দল করে যাতে মনে হবে যে, সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব এলাকায় নির্যাতন হয়েছে। সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, যেমন- দাঙ্গা হতো ব্রিটিশ আমলে বা পাকিস্তান

---

[৬০১] বদরুদ্দীন উমর, কলাম, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিচিত্র রূপ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ফেব্রুয়ারি, ২০০২ইং, পৃ: ৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমলের কোনো কোনো পর্যায়ে।[৬০২] সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের অতিমাত্রায় মায়া কান্নার কারণ এই যে,

প্রথমত ঃ তারা এই ইস্যু তুলে ধরে ভারতীয় দাদাদের খুশি করতে চান।

দ্বিতীয়ত ঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্লোগান তুলে তারা সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের জন্য সব সরকারি দলকে দায়ী করে সংখ্যালঘুদের বন্ধু সাজতে চান।

তৃতীয়ত ঃ তারা আইনশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের জন্য সরকার ব্যর্থ হচ্ছে, কাজেই এ সরকারকে একটি ব্যার্থ সরকার বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করা।

চতুর্থত ঃ সরকার বিরোধী আন্দোলনের একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা এবং ক্ষমতাসীন দলকে আন্দোলনের মাধ্যমে হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা।

বাংলাদেশে কিছু ইসলামি রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা ইসলামকে রাজনীতি লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরা মনে প্রাণে ইসলামকে রাষ্ট্রভাষার আদর্শ হিসেবে দেখতে চায়। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি শাসনতন্ত্রত আন্দোলন, ইসলামি ঐক্য আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ধর্মীয় আদর্শকে সামনে রেখে তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে রাজনীতিতে যতটা না সমস্যা হয় তার চেয়ে বেশী সমস্যা দেখা যায় তখন যখন সকল রাজনৈতিক দলগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে। জামায়াতের রাজনীতি সম্পর্কে ফকরুদ্দীন ওমর বলেন জামায়াতকে ইসলামী সাম্প্রাদায়িক দল না বলে মৌলবাদী দল বলা যায়। জামায়াতে ইসলামীকে মৌলবাদী দল বলার কারণ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে এরা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের আদর্শকে ভিত্তি করেই নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মতৎপরতা নির্ধারণ করে থাকে। যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদ দলের ক্ষেত্রেই তা হয়। ইহুদী খ্রিষ্টান শিখ ইত্যাদি মৌলবাদ এবং মৌলবাদ সংগঠন তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব, বাইবেল গ্রন্থ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়। এ অর্থে হিন্দু মৌলবাদ বলে কিছু নেই। কারন হিন্দুদের এর রকম কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই ।[৬০৩] যাই হোক স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষ করে ৯০ এর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মকে নিছক রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ থেকে এখনি বের হয়ে আসতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আরো কটিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। ধর্মের মত এত সংবেদশীল ব্যাপারকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ না হলে তা সঠিক গণতান্ত্রিক চর্চার পথকে কর্দমাক্ত করবে।

---

[৬০২] বদরুদ্দীন উমর, কলাম, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিচিত্র রূপ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ইং, পৃ: ৫।

[৬০৩] উমর, বদরুদ্দীন, ২০০২, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিচিত্র রূপ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি, পৃষ্ঠা ঃ ৫।

৮.২৩ বাংলাদেশের জোট রাজনীতি

বাংলাদেশে রাজনৈতিক জোট গঠনের ইতিহাস নতুন ঘটনা নয় বরং এ ইতিহাস অতি প্রাচীন। ব্রিটিশ শাসনামলেই এতদাঞ্চলে রাজনৈতিক জোট গঠনের সর্ব প্রথম সূত্রপাত ঘটে। পাকিস্তান আমলেও জোট গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতেও জোটবদ্ধতার প্রবণতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। রাজনীতি মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অংশ। প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না সময়ে, কোনো না ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জড়িত হয়[৬০৪]।

মানুষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। আর মৌলিক জাতীয় স্বার্থবাহী সুনির্দিষ্ট কতগুলো দাবি আদায় বা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অথবা স্বৈরশাসনের অবসান কল্পে এবং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অথবা ইস্যুভিত্তিক অতি জরুরি কতগুলো উপস্থিত জনস্বার্থ বিষয়ক লক্ষ্যার্জনের জন্য কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার কৌশল হিসেবে যখন ছোট-বড় একাধিক রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করে, তখন এটিকে রাজনৈতিক জোট বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে[৬০৫]। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া বলেন- জাতীয় স্বার্থে ও কল্যাণার্থে কোনো যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের বৃহত্তম জনগোষ্ঠিকে একত্র করার জন্য একাধিক দলের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে রাজনৈতিক জোট বলে অভিহিত করা হয়[৬০৬]। কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য হাসিলের একাধিক রাজনেতিক দলের ঐক্যই হলো জোট। নির্বাচন বা আন্দোলনের প্রশ্নে একাধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে জোট গড়ে উঠতে পারে[৬০৭]। রাজনৈতিক জোটের বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন বিভিন্ন জোটের রূপরেখা দিয়েছেন-

সারণী ঃ ২৯

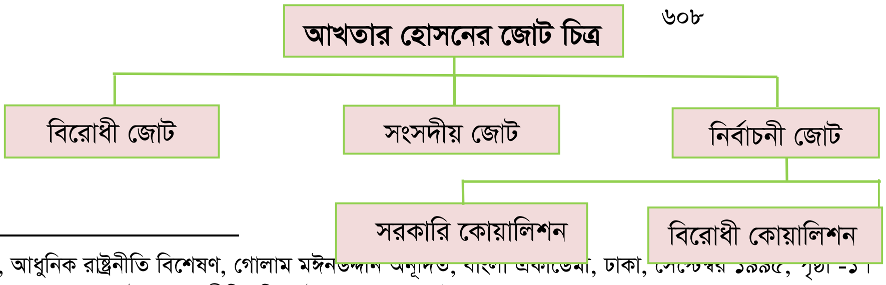

---

[৬০৪] রবার্ট এ. ডাল, আধুনিক রাষ্ট্রনীতি বিশেষণ, গোলাম মঈনউদ্দীন অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা -১।

[৬০৫] এডভোকেট আনসার খান, জোটবদ্ধ রাজনীতি, সিলেটের ডাক, ১৭ অক্টোবর ২০০৬।

[৬০৬] অধ্যাপক ড. আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃষ্ঠা. ২১৯।

[৬০৭] হারুনুর রশীদ, রাজনীতি কোষ, মাওলা ব্রাদ্রার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা -১৮১।

[৬০৮]উৎস ঃ সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪ ।Akhter Hussain, Politics of Alliances in Pakistan 1954-1999, Ph.D. Thesis, National Institute of Pakistan Studies, Quaid-E-Azam university, Islamabad. 2008, pp 8-9.

গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

সারণী ঃ ৩০

[৬০৯]

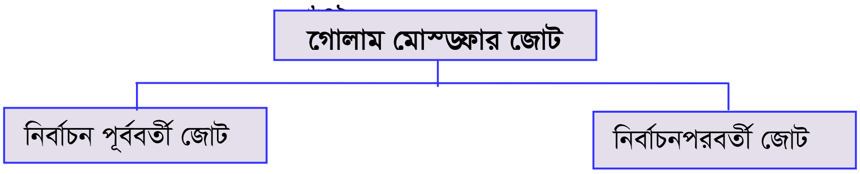

গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

সারণী ঃ ৩১

[৬১০]

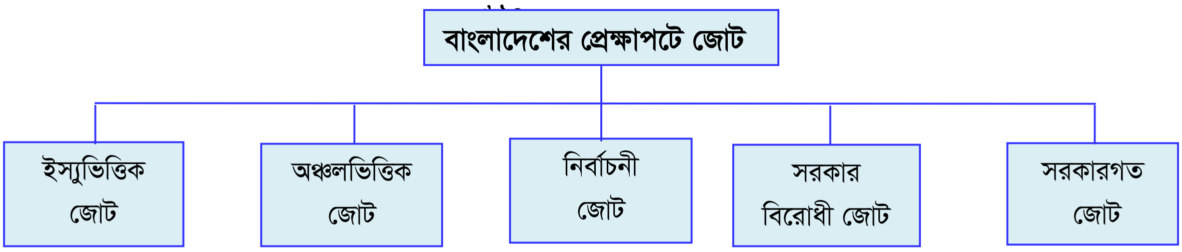

গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

ইস্যুভিত্তিক জোটঃ উদাহরণ হিসেবে বলা অভিন্ন ন্যূনতম ২৩ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ১৪ দলীয় জোট এর কথা উলেখকরা যেতে পারে। এছাড়া বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ইস্যুভিত্তিক জোটের সর্বোত্তম উদাহরণ।

অঞ্চলভিত্তিক জোটঃ যে রাজনৈতিক জোট সাধারণত বা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে তার কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা রাখে, তাকে আঞ্চলিক জোট বা অঞ্চলভিত্তিক জোট বলা হয়। এ ধরণের জোটের উদাহরণে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন এবং রাজশাহীর আদিবাসী মুক্তি মোর্চার কথা বিশেষ ভাবে বলা যায়।

নির্বাচনী জোট ঃ নির্বাচনী রাজনৈতিক জোট গঠন করার নজির এশিয়ার অনেক দেশেই লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে গঠিত রাজনৈতিক জোট নির্বাচনোত্তর অবস্থায় সাধারণত বেশিদিন টিকে না। নির্বাচনী জয়ের পর স্বার্থের টানাপোড়েন শুরু হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোট ভেঙ্গে যায়[৬১১]।

---

৬০৯ সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪

৬১০ প্রাগুক্ত।

৬১১ মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, রাজনৈতিক সংঘাত, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১২০।

সরকার বিরোধী জোট ঃ ক্ষমতাসীন সরকারের অন্যায়-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কিংবা তাকে ক্ষমতাচ্যূত করার লক্ষ্যে কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এ ধরনের জোট গড়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং ৫ দলীয় বাম জোটের কথা উলেখ করা যেতে পারে।

সরকার গঠনগত জোট ঃ সরকার পরিচালনার সময় জোট গঠন জোট রাজনীতিতে এক উলেখযোগ্য ঘটনা। নির্বাচনের পর একাধিক দল মিলিত হয়ে কোয়ালিশন গঠন করতে দেখা যায়। উদাহরণ হলো অবিভিক্ত বাংলার ১৯৩৭ সালের কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কথা উলেখ করা যায়। তবে এ ধরণের জোটের ইতিহাস খুব সুখকর হয় না। দলগুলো সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে সরকারের পতন ঘটাতে পারে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অভ্যূদয় ঘটে; যার পূর্বাংশে ছিল পূর্ব-বাংলা। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ব-বাংলা বাঁধা পড়ে নতুন এক ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশে[৬১২]। এই সময় বাঙ্গালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের ফলে পূর্ব-বাংলায় ভাষা প্রশ্নে একটি স্বতন্ত্র ধারার রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয় [৬১৩]। মূলত এ আন্দোলনেই ভাষা কেন্দ্র করে গঠিত হয় দুটি জোট -

১. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ [৬১৪] এবং

২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ [৬১৫]

১৯৬৩ সালের গোড়ার দিক থেকে সব বিরোধী দল নিয়ে একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের অভিপ্রায়ের কথা আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে[৬১৬]। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল একত্রি হয়ে নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার বিরোধী নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট গঠন করে[৬১৭]। বাংলার তিনজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ

---

[৬১২] ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল; ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা : ১৬০।

[৬১৩] Mussarat Jabeen, Amir Ali Chandio and Zarina Qasim, Language Controversy : Impacts on National Politics and Secession of East Pakistan, South Asian Studies Vol. 25, No. 1 (2010), pp; 99-124 . উৎস সংগৃহীত হয়েছে; সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম , বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, , অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪ , পৃষ্ঠা; ৩৪।

[৬১৪] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ৬০।

[৬১৫] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৫৬।

[৬১৬] বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪ , পৃষ্ঠা; ৩৫।

[৬১৭] Abu Salah Md. Political parties of Bangladesh: ideology, Structure and Role in Pariamentary Democracy, International Journal of South Asian Studies, Vol. 3, No, 2 (July- December, 2010), pp; 414 & 432. উৎস সংগৃহীত হয়েছে; সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম , বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, , অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪ , পৃষ্ঠা; ৩৬।

সোহরাওয়ার্দী ও এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন যুক্তফ্রন্টের রূপকার[৬১৮]। মুসলীম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য এ দু'য়ের বিরোধীতা ছিল জোটের সাধারণ ভিত্তি। জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে পূর্ব-বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২১ দফা কর্মসূচী[৬১৯]।

সারণী ঃ ৩২

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের জোট ও দলওয়ারী ফলাফল

মুসলিম আসন		**অমুসলিম আসন**	
জোট ও দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	জোট ও দলের নাম	প্রাপ্ত আসন
যুক্তফ্রন্ট	২২৩	পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪
মুসলিম লীগ	৯	সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১০
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	১	তফসিল ফেডারেশন	২৭
স্বতন্ত্র	৪	অন্যান্য	১১
			১
সর্বমোট	২৩৭	সর্বমোট	৭৩

উৎস ঃ Ghulam Mustafa, Alliance Politics in Pakistan : A Study of the united Fornt; Pakistan Journal of History and Culture, Vol. 31, No. 1 (2010), P, 118 এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী স্মারণী।

নিবার্চনে নিরুঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট নিজেদের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়[৬২০]। উপরন্ত মুসলিম লীগের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বেশিদিন ক্ষমতাসীন থাকতে পারেনি।

১৯৬২ সালের ২৪ জুন আইয়ুব এর সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের দাবি সংক্রান্ত নয় নেতার একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন নূরুল আমিন (মুসলিম লীগ), আবু হোসেন সরকার (কেএসপি), আতাউর রহমান খান (আওয়ামী লীগ), হামিদুল হক চৌধুরী (কেএসপি), সৈয়দ আজিজুল হক

[৬১৮]সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত।
[৬১৯] আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ; ২৫২।
[৬২০]Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and The Emergence of Bangladesh, Mowla Brothers, Dhaka, February 2003, Page: 74.

(কেএসপি), পীর মোহসেন উদ্দিন আহমেদ (নেজামে ইসলাম), শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ) ও মাহমুদ আলী (ন্যাপ)[৬২১]। ব্যাপক মতপার্থক্য সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও তারা এই যুক্ত বিবৃতিতে এক বাক্যে গণভিত্তিক শাসনতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সংসদীয় ব্যবস্থা পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের বৈষম্যের প্রতিবিধানসহ প্রভৃতি দাবি জানান[৬২২]। সোহরাওয়ার্দী এর নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমস্ত বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত বিরোধী জোট গঠনের ঘোষণা দেন। বিরোধী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে উলেখযোগ্য সাড়া পেয়ে তিনি ৪ অক্টোবর **১৯৬২** জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সংক্ষেপে এনডিএফ গঠন করেন[৬২৩]। আওয়ামী লীগ , কেএসপি, জামায়েত ইসলামী, নেজামে ইসলাম, ন্যাপ ও মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) সমন্বয়ে এই জোট গঠিত হয়। জোটভুক্ত বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এনডিএফ কমিটি গঠন করা হয়[৬২৪]। **১৯৬৪** সালের **২১** জুলাই বিরোধী দলের নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সম্মিলিত বিরোধী দল Combined Opposition party সংক্ষেপে কপ নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়[৬২৫]। কপের অন্তর্ভূক্ত দলগুলো ছিল মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসালম।এই জোট পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনীত করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পাকিস্তান ছাত্র শক্তি নামক তিনটি ছাত্র সংগঠন মিলে **পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্রসমাজ** নামক ছাত্র ঐক্যজোট গঠন করে। এই জোট **১৯৬৪** সালের ডিসেম্বর মাসে একটি প্রচারপত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের গুরুত্ব, মৌলিক গণতন্ত্র এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন, ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদ ব্যাখ্যা করে শেষে ৭ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে[৬২৬]। কপের কর্মসূচী জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ফাতেমা জিন্নাহর জন সমাবেশ গুলো স্বতস্ফুর্ত জনসমুদ্রে পরিণত হতে থাকে[৬২৭]। অবশেষে মৌলিক গন্ত্রতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীগণ জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আইয়ূব খানকেই রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্বার নির্বাচিত করে।

সারণী ঃ ৩৩

---

[৬২১] শ্যামলী ঘোষ, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১, দি ইউনিভর্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৭।

[৬২২] প্রাগুক্ত

[৬২৩]S.A. Aakanda, The Working of the Ayub Constitution and the People of Bangladesh; The Journal of the institution of Bangladesh, Vol. 4(1979-80), Page; 91.

[৬২৪] স্বাধীনতা যুদ্ধ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৮১।

[৬২৫] মুসা আনসারী, বামপন্থী রাজনীতি, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়টিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম খন্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫২৩।

[৬২৬]সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫০।

[৬২৭] অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা : ১৮৯-১৯০।

১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল

প্রদেশ	আইয়ুব খান		ফাতেমা জিন্নাহ	
	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
পূর্ব পাকিস্তান	২১,০১২	৫৩	১৮,৪৩৪	৪৭
পশ্চিম পাকিস্তান	২৮,৯৩৯	৭৪	১০,২৫৭	২৬
মোট	৪৯,৯৫১	৩৬.৩	২৮৬৯১	৩৬.৩

উৎস : ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল; ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা : ২৪৯ এবং বিভিন্ন উৎস হতে তৈরীকৃত।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কপ প্রার্থীর পরাজয়ে এবং তাতে মৌলিক গণতন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন চক্রের সম্পর্কের সমীকরণটি উন্মোচিত হওয়ার পরও আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ণ উদ্যমে প্রচারভিযান চালায়।

সারণী ঃ ৩৪

১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল

দল ও জোট	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
কপ	১০	-
কনভেশন মুসলিম লীগ	১২০	৫৪.৮
এনডিএফ	৫	-
স্বতন্ত্র প্রার্থী	১৪	-

উৎস সংগৃহীত হয়েছে; সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা; ৩৪।

সারণী ঃ ৩৫

১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দল ও জোট	**পূর্ব পাকিস্তান(প্রাপ্ত আসন)**	**পশ্চিম পাকিস্তান (প্রাপ্ত আসন)**
কনভেনশন মুসলিম লীগ	৬৬	৯৬
এনডিএফ	০৩	-
আওয়ামী লীগ	১১	-
ন্যাপ	০৪	-
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	০৩	-
জামায়াতে ইসলামী	০১	-

নেজামে ইসলাম	০১	-
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৫৮	৪৯

উৎস সংগৃহীত হয়েছে; সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম , বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪ , পৃষ্ঠা; ৩৪ ।

তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের অসন্তোষের আলোকে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলণে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিনামা উপস্থাপন করেন [৬২৮] । ৬ দফার পক্ষে জনমত গঠনে আওয়ামী লীগ যখন নিজের উদ্যম ও শক্তিকে সংহত করছিল তখন সরকারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে [৬২৯] । দমন-পীড়নের সীমাহীন খড়কে ১৯৬৬ সালের সেপ্টম্বর মাস পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রথম সারির সকল নেতাসহ প্রায় ৯ হাজার কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়[৬৩০] । রাজনেতিক অঙ্গনের এ শূণ্যতা পূরণের জন্য ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল বুর্জোয়া ও ইসলামী ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে একটি সরকার বিরোধী জোট গঠন করে।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ছয় দফাপন্থী হিসেবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও পূর্ব পাকিস্তানের আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পিডিএম পন্থী হিসবে পরিচিতি পায়। পিডিএম ৬ দফার বিরুদ্ধাচারণ করে এর পরিপূরক হিসেবে ৮ দফা দাবি প্রণয়ন করে। অনেক বিশেষজ্ঞ পিডিএম এর ৮দফাকে আওয়ামী লীগের ৬ দফার বর্ধিত সংস্করণ হিসেবে অভিহিত করেছেন[৬৩১] । অবশ্য আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে তা ছিল ৬ দফা নস্যাতের ষড়যন্ত্র[৬৩২] । নতুন রাজনৈতিক একটি জোট গড়ে তুলতে পিডিএম অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১৯৬৯ এর ৫ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি ছাত্রজোট গঠন করা হয়[৬৩৩] । জোটভুক্ত প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (ভাসানীপন্থী, মেনন গ্রুপ নামে পরিচিত), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (রুশপন্থী, মতিয়া গ্রুপ নামে পরিচিত) এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (দোলন)

[৬২৮] হারুন-অর-রশীদ, বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।
[৬২৯]Mizanur Rahman Shelley, Emergence of New Nation in a Multi-Polar World Bangladesh, Academic Press and Publishers Library, Dhaka 2000, page ; 38.
[৬৩০] মোহম্মদ ফায়েক উজ্জামান, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃষ্ঠা; ৪২।
[৬৩১] মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ; ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশ, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা; ১৩৪।
[৬৩২] মোনায়েম সরকার, সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৩৩৭-৩৩৮।
[৬৩৩] চৌধুরী, মিজানুর রহমান, রাজনীতির তিনকাল, হাফেজা মাহমুদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০১, পৃষ্ঠা-৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

একাংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এই জোটের সভাপতির দায়িত্ব নেন। ছাত্রদের এই জোট গঠনের পর দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে[৬৩৪]।

১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারী ৮টি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ড্যাক) নামে একটি সর্বদলীয় জোট গঠন করে[৬৩৫]। জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ (শেখ মুজিব গ্রুপ), আওয়ামী লীগ (নাসরুলাহ গ্রুপ), জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, (কাউন্সিল), ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ), নেজামে ইসলাম পার্টি, এনডিএফ এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম[৬৩৬]।

এই জোট দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি অহিং স ও সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করে এবং সে লক্ষ্যে ৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। ইতোপূর্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। জনসাধারণের মধ্যকার প্রত্যেকটি শ্রেণীকে সমভাবে উদ্বদ্ধ করার লক্ষ্যে ১১ দফা কর্মসূচীতে ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষকদের দাবি দাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে সকল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ১১ দফা কর্মসূচী অচিরেই ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী অভ্যূত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মওদুদ আহমদ লিখেছেন;

The 11 point programme was neither a well-drafted document nor did it contain any detailed constitutional proposal, It raised certain demands which were already in the minds of the people for a long time. It only helped organising the people to express thier long accumulated frustrations and grievances. It was more of a symbolic document repression in, and economic exploitation of , East pakistan during the last two decades[637].

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকার একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ জন্য স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে সমবেত করে ৯ সেপ্টেম্বর মাওলানা ভাসানী (চীনাপন্থী ন্যাপ) সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে (প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট্য একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা কমিটির নেতৃবৃন্দ ঐক্যমত্যে পৌছান যে, তাদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোনো রাজনৈতিক সমাধান বিবেচ্য নয়।

---

[৬৩৪] Talukder Maniruzzaman. The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, UPL, Dhaka- 2003, Page 60.

[৬৩৫] সালাহউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা : ১৬৯।

[৬৩৬] সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম , বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, , অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪ , পৃষ্ঠা; ৫৫।

[৬৩৭] Moudud Ahmed, Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy, UPL, Dhaka, 1999, pp 128 & 147.

স্বাধীনতার পরে আওয়মী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করে [৬৩৮]। অবশ্য মাওলানা ভাসানী এবং মোজফ্ফর আহমেদ একটি অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শের ভিত্তি ছিল দলমত নির্বিশেষে সবাই মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কাজেই জাতীয় ঐক্যমত্যের কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অন্তত কিছুকাল জাতীয় সরকার থাকা উচিৎ। কিন্তু আওয়ামী লীগ জাতীয় সরকার গঠনে রাজি না হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিরোধী দলগুলো ক্ষুব্ধ হয় [৬৩৯]। এ অবস্থায় মুজিব সরকারের পদত্যাগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বদলীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে **১৯৭২** সালের **২৯** ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী কে সভাপতি করে **১৫** দফা ভিত্তিক একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য দলগুলো ছিল- ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সোসালিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল এবং বাংলা জাতীয় লীগ। বিরোধী দল সমূহের তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার ও তার প্রণীত সংবিধানের উদ্দেশ্যে ৭ মার্চ ১৯৭৩ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তিনটি ধারা ছিল **১.**মূল স্রোত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ **২.** চীনাপন্থী সাত দলীয় জোট **৩.** মস্কোপন্থী ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) দ্বি-দলীয় জোট। বাংলাদেশে দ্বিলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের নজির নেই। নিজেদের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে এ পর্যন্ত দলীয় সরকার পরাজয় বরণ করে নি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে একক ভাবে মোকাবেলা করার সামর্থ কোন রাজনৈতিক দলের ছিল না[৬৪০]।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, দেশে কোনো বিরোধী দল নেই[৬৪১]। জাতীয় সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৯ জন বিরোধী দলীয় স্বতন্ত্র সদস্য মিলে সংযুক্ত বিরোধী দল নামে একটি **সম্মিলিত বিরোধী জোট** সৃস্টি করে; যদিও সরকার একে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দান করেনি। জাতীয় লীগ থেকে আতাউর রহমান খান এ জোটের নেতা নির্বাচিত হন[৬৪২]।

১৯৭৩ সালের **১৪** মে মাওলানা ভাসনী ৩ দফা দাবি উত্থাপন সহ আমরণ অনশন শরু করলে এমতাবস্থায় ভাসানীর জবীন রক্ষার্থে ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে ২২ মে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। জোট

---

[৬৩৮] হাসান মোহাম্মদ, বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থমেলা, ঢাকা, জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬।
[৬৩৯] আমির খসরু, সামরিক শাসন এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, এফ. রহমান প্রকাশিত, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ২৬।
[৬৪০] হাননান, মোহাম্মদ, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : বঙ্গবন্ধুর সময়কাল, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০০, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫।
[৬৪১]The Bangladesh Observer, 9 March, 1973.
[৬৪২]সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

ভুক্ত দলগুলো ছিল - জাসদ, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), (ভাসানী ন্যাপ)। এই জোটের নেতৃবৃন্দ এর অনুরোধে ভাসানী অনশন ত্যাগ করে। কিন্তু জাসদের পিছুটানের ফলে জোট আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারেনি এবং এক পর্যায়ে তা ব্যর্থ হয়।

১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল ন্যাপ (ভাসানী), বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। মাওলানা ভাসানী এই জোটের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল জোটের পক্ষে ৪ দফা দাবি পেশ করা হয় এবং দাবিগুলো ৭ দিনের মধ্যে মানা না হলে দেশব্যাপী বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারী উচ্চারণ করে[৬৪৩]। এতে সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে মশিউর রহমান, নুরুর রহমান ও অলি আহাদ বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে এবং ভাসনীকে গ্রেফতার করে তার নিজ গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ রাখেন[৬৪৪]। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন গুলোর মধ্যে রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়। ১৯৭৩ সালের ২০ এপ্রিল ১১টি সংগঠন নিয়ে সিরাজ শিকদারে নেতৃত্বে পুর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠিত হয়। এর শরিক সংগঠন গুলো ছিল পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ও কর্মচারী মুক্তি সমিতি, পূর্ব বাংলা ছাত্র যুব মুক্তি পরিষদ, পূর্ব বাংলা কৃষক মুক্তি সমিতি, পূর্ব বাংলা জাতিগত সংখ্যালঘু মুক্তি পরিষদ, পূর্ব বাংলা ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিষদ, পূর্ব বাংলা নারী, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র ও সাহিত্য মুক্তি পরিষদ, পূর্ব বাংলা দেশপ্রেমিক ওলামা সমিতি, পূর্ববাংলা দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দেশপ্রেমিক গ্রুপ ও বামপন্থীদের প্রতিনিধি। এই জোটের পক্ষ থেকে ১৪ দফা প্রচার করা হয়।

উগ্র-বামপন্থী দলগুলোর সমর্থিত পাঁচটি শ্রমিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় শ্রমিক পরিষদ নামে একটি জোট গঠন করে এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮-১৯ জানুয়ারী ১৯৭৫ শ্রমিক প্রতিবাদ দিবস পালনের মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলনের আহবান জানান[৬৪৫]। এছাড়া আতাউর রহমান খান সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত করে জোট গঠনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় সম্মেলন আহবান করে। কিন্তু তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। একটি

[৬৪৩] সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮।

[৬৪৪] অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা : ৪৭১।

[৬৪৫] সাহা, অসীম কুমার, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৯৪।

একদলীয় প্রথা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সাংবিধানিক চতুর্থ সংশোধনী আনা হয়। ফলে জোট গঠনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জাতীয় সম্মেলন আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি[৬৪৬]।

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নবগঠিত এই দলটি আওয়ামী লীগের সঙ্গে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। ক্ষমতাসীনদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস এবং বৈজ্ঞানিক সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৎপর রাজনৈতিক দলসমূহের সশস্ত্র তৎপরতায় দেশে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে সিপিবি এবং ন্যাপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষপটে একটি বৃহত্তর জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শেখ মুজিবকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগ প্রথমে একাই রাজনৈতিক সংকট সমাধনে সচেষ্ট হলেও এক পর্যায়ে মিত্রদের সাথে জোবদ্ধতার প্রয়োজন অনুভব করে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিদলীয় গণঐক্যজোট গঠনের আহবান জানান। ৩ সেপ্টম্বর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও সিপিবির আনুষ্ঠানিক এক বৈঠক তিন দল একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি তিন দলের মৈত্রির সাংগঠনিক নাম ত্রিদলীয় গণঐক্যজোট অনুমোদন করে। এই পটভূমিতেই ৯ অক্টোবর জোটের সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত হয় এবং ১৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের ঘোষণা দেওয়া হয়[৬৪৭]। গণঐক্যজোট কে সক্রিয় করে গণজীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে সে সময় আওয়ামী লীগের উৎসাহ ছিল না বরং তারা একা চলার নীতিতে ফিরে যাচ্ছিল[৬৪৮]। এরকম পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সিপিবি শেখ মুজিবের কাছে এক নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করে। মুজিবর এই প্রস্তাব গ্রহণে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে দেশে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠিত হয়[৬৪৯]। জাতীয় দল বাকশাল গঠন করায় বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তত ১৩টি প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দলগুলো ছিল- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্ফর), কমিউনিস্ট পার্টি (মণি

[৬৪৬] Ahmed, Moudud, Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL, Dhaka , January, 1991, p-261.
[৬৪৭] আহমদ, এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশ: সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতি প্রকৃতি, হাসি প্রকাশনী , ঢাকা, সেপ্টম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা-১৫৬।
[৬৪৮] নিতাই দাস, মোহাম্মদ ফরহাদ : জীবন ও সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১৯০।
[৬৪৯] সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সিং), জাসদ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, লেবার পার্টি, জাতীয় গণতন্ত্রী দল, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, লেনিনবাদি কমিউনিস্ট পার্টি , শ্রমিক কৃষক সমাজবাদি দল[৬৫০] ।

গণঐক্যজোটের বদলে একই প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে বাকশাল-মোর্চা এবং বাকশাল সরকার তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে নি। বাকশাল গঠনের মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ায় সমাজের ভেতর এক ধরণের চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষোভকে পুঁজি করেই শুরু হয় দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের ফলাফল হলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এর অভ্যূত্থান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। সামরিক অভ্যূত্থান, পাল্টা অভ্যূত্থান প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হয়। ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল জিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার করেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে দেশে পরিস্কার দুটি ধারা সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্টের একটি ধারা এবং অপরটি গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের ধারা। প্রথমোক্ত ধারা টি ছিল জিয়ার স্বপক্ষের ধারা , আর তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে শেষোক্ত ধারাটি। জিয়া ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং নিজে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিার কথা জানান। ইতিপূর্বে তার ইঙ্গিতে উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে আহবায়ক করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল গঠন করে। ফলশ্রুতিতে জিয়ার পৃষ্ঠাপোষকতায় জাগদল, মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ), ন্যাপ (ভাসানী), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও বাংলাদেশ তফসীল জাতি ফেডারেশন এই ৬টি দলের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট প্রার্থী জেনারেল এমএজি ওসমানি। আওয়ামী লীগ সহ ৫টি সেক্যুলার ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এই জোট গঠিত হয়। জোট ভুক্ত দলগুলো ছিল - আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) , গণ আজাদি লীগ, ও পিপলস লীগ। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে কতিপয় ডানপন্থি দল ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে অপর একটি জোট গঠন করে জিয়ার বিরোধীতা করে নির্বাচনে একটি তৃতীয় ধারা সৃস্টির প্রয়াস চালায়। ঐ জোটের দলগুলোর মধ্যে ছিল জাতীয় লীগ , ডেমোক্রেটিক লীগ, আইডিএল (সিদ্দিক), জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগ (কনভেনশন)।

---

[৬৫০]সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯।

জাতীয় সংসদ নিবার্চন অনুষ্ঠান ছিল জিয়াউর রহমানের বেসামরিককরণের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া। সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোয়ন নিষ্কন্টক করার জন্য জিয়া জাতীয়তাবাদী জোট বিলুপ্ত করেন এবং অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন ১ সেপ্টম্বর ১৯৭৮ [৬৫১]।

সামরিক আইনের আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক দলগুলো প্রহসন হিসেবে গণ্য করে দশটি রাজনৈতকি দল মিলে একটি জোট গঠন করে যার পরিচিতি হয় দশ দলীয় জোট। জোট ভুক্ত দলগুলো ছিল- বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাসদ, ন্যাশনাল পার্টি ফর ডেমোক্রেসি, ন্যাপ (নাসের) , জাতীয় জনতা পার্টি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ডেমোক্রেটিক লীগ, ইউপিপি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও গণআজাদী লীগ। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দশ দলীয় জোট এর ভিতর থেকে পাঁচ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হলে দশ দলীয় জোটে ভেঙ্গে যায় ।

রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় উপণিত হয়ে দক্ষিণপন্থীগণ গণতান্ত্রিক ইসলামিক ফ্রন্ট জোট গঠন করে। জোটভুক্ত দল ছিল দুটি সবুরের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ এবং মাওলানা আবদুর রহীম এর নেতৃত্বাধীন ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)। সংসদ নির্বাচনের পূর্বে চারটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, জাতীয় ছাত্রফ্রন্ট মিলে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যজোট নামে একটি জোট গঠন করে।

আওয়ামী লীগ (মালেক), জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর), সিপিবি (মণি সিং), গণআজাদী লীগ প্রভৃতি দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় গঠিত গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটকে পুনরায় দার করানোর উদ্যেগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মণি সিং (জনতা পার্টি) প্রধান ওসমানীকে জোট বাধার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের শোচনীয় পরাজয়ের পর গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। সংসদ নির্বাচনে এই জোট জাগিয়ে তোলার উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর প্রধান বিরোধী দলগুলো সামরিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং জিয়া সরকার কে উৎখাত করার জন্য গণআন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৮৯ সালের ৮ সেপ্টম্বর বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তোহার নেতৃত্বে ৫ টি বামদলীয় রাজনৈতিক দল জোট গঠন করে। এ

---

[৬৫১] জিবলু রহমান, ভাসানী -মুজিব-জিয়া (১৯৭২-১৯৮১), শুভ প্রকাশন, ঢাকা, মে ২০০৪, পৃষ্ঠা : ৩০২।

জোটের দলগুলো হলো- সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), নূরুর রহমান-আনোয়ার জাহিদের ন্যাপ (ভাসানী), ইউপিপি, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন এবং আবদুল মতিনের নেতৃত্বে কয়েকটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত গণফ্রন্ট।

১৯৮০ সালের প্রারম্ভে ১০টি ধর্মনিরেপেক্ষ মধ্য ও বামপন্থী দল এক জিয়া বিরোধী আরেকটি জোট গঠন করে।এ জোটের দলগুলো ছিল- আওয়ামী লীগ (মালেক), জাসদ, সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর), ন্যাপ (হারুন), জাতীয় একতা পার্টি (রুশপন্থী ন্যাপের একটি উপদল), বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন (ইউপিপি থেকে বেরিয়ে আসা অংশ) শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও গণআজাদী লীগ। কিন্তু সাংগঠনিক ভাবে এই জোট দুর্বল প্রকৃতির ছিল।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ২১ সেপ্টম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু বিরোধী দল সমূহের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২১ সেপ্টম্বরের পরিবর্তে ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। ১৪টি দল সম্মিলিত ভাবে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে। কিন্তু নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না মনে করে এই ফ্রন্ট নির্বাচন বর্জনরে সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ফ্রন্ট তার ঐক্য ধরে রাখতে পারেনি । শাসক দল বিএনপি এবং এর বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে গড়ে ওঠা দশ দলীয় ঐক্যজোট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে নানামুখি প্রক্রিয়া শুরু করে। দশদলীয় এই জোটে আওয়ামী লীগ (হাসিনা), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ওয়াকার্স পাটি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদি দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (হারুন) এবং জাতীয় একতা পার্টি , গণ আজাদী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) অর্ন্তভূক্ত ছিল।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমএজি ওসমানিকে প্রার্থী মনোনীত করে নাগরিক কমিটি নামে একটি চারদলীয় জোট গঠিত হয়। জোটভূক্ত দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ (মিজান), মজদুর পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এবং জাতীয় জনতা পার্টি। ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টির সমন্বয়ে গঠিত উলামা ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন মোহাম্মদ উলাহ (হাফেজ্জী হুজুর)। অপরদিকে ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর), ন্যাপ (হারুণ) ও সিপিবির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শিবির। এই জোট মোজাফ্‌ফর আহমেদকে প্রার্থী মনোনিত করে। জাসদ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, এবং ওয়াকার্স পার্টির সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। এই জোটের পক্ষে মেজর এম. এ. জলিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮২ সালের **২৪** মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যূত করে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন[৬৫২]। গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সমমনা দলগুলোকে নিয়ে **১৯৮৩** সালের জানুয়ারি মাসে **১৫** দলীয় জোট গঠিত হয়। এ জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ (হাসিনা), আওয়ামী লীগ (মিজান), জাসদ, গণ আজাদী লীগ, আওয়ামী লীগ (ফরিদ গাজী), বাসদ, ওয়াকার্স পার্টি, ন্যাপ (হারুন), ন্যাপ (মোজাফ্ফর), সিপিবি, সাম্যবাদী (তোয়াহা), সাম্যবাদী (নগেন), জাতীয় একতা পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল এবং জাতীয় মজদুর পার্টি[৬৫৩]। অন্যদিকে বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭দলীয় জোট এ জোটের অন্তর্ভূক্ত ছিল বিএনপি, ইউপিপি, গণতান্ত্রিক পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ন্যাপ (নুরু), কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং বাংলাদেশ বিপবি কসিউনিস্ট লীগ। **১৫** দল বা ৭দল কোনোটিই সবসময় তাদের দলের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারেনি।

এরশাদ সরকার একটি রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য গোড়া থেকেই সক্রিয় ছিলেন। এই লক্ষ্যে **১৮** দফা বাস্তবায়ন কমিটি এবং তারপর জনদল গঠন করা হয়। কিন্তু এই দুটি সংগঠন সরকারের পক্ষে ব্যাপক গণজমায়েত করতে ব্যর্থ হয়।

খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন **১২** দলীয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন **১১** দলীয় জাতীয় জোট এর রাজনৈতিক তৎপরতাও দৃশ্যমান ছিল। জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট দলের শরিক দলগুলো ছিল ; ডেমোক্রেটিক লীগ (অলি আহাদ), কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জাস্টিস পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি, নিখিল বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি, পিপলস লীগ এবং জাতীয় বিপবি দল [৬৫৪]। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তিনটি মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল: **আগ্রাসণ প্রতিরোধ, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা**[৬৫৫]।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম অংশীদার অলি আহাদ অচিরেই এই জোট ত্যাগ করে **১৯৮৬** সালে একটি পৃথক ৬ দলীয় জোট গঠন করে। এই জোটের শরীক দলগুলো ছিল; ডেমোক্রেটিক লীগ অলি আহাদ, ভাসানী ন্যাপ (গাজী শহিদুলাহ), বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীব নেওয়াজ), কৃষক-শ্রমিক পার্টি (এসএম আজিজুল হক

---

[৬৫২] সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৪।
[৬৫৩] প্রাগুক্ত।
[৬৫৪] আবদুর রহিম আজাদ, শাহ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশ রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবণতা (২১ দফা থেকে ৫ দফা) সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, জুন ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২।
[৬৫৫] প্রাগুক্ত।

শাহজাহান), মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল (সিরাজুল হক গোড়া) এবং বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল ইয়াকুব আলী। এই দল সেনা শাসনের প্রত্যাহার এবং সংসদীয় শাসন প্রবর্তনের দাবি তুলেছিলেন।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারিতে চীনপন্থী কমিউনিস্টরা গণতান্ত্রিক বিল্পবি জোট গঠন করে। মস্কোপন্থীরা এতে সহানুভূতি জানালেও জোটে যোগদান থেকে বিরত থাকে[৬৫৬]। গণতান্ত্রিক বিপবি জোট সমূহের অঙ্গসংগঠন সমূহ ছিল; বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ লেখক শিবির, বাংলাদেশ মজদুর পার্টি, জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলন, গণসংস্কৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ চাষী সমিতি, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন [৬৫৭]। এই জোট স্বৈরতন্ত্রের অধীনে সকল ধরণের নির্বাচন বর্জন এবং ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ২০ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে।

এরশাদ শাসনামলে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও জোট গঠনে তৎপর ছিল। ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে হাফেজ্জী হুজুর নামে খ্যাত আলিম ও পীর মাওলানা মোহাম্মদ উলাহর নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি জোট গঠিত হয়। এই জোটের জন্য গণঅভ্যূত্থানের মাধ্যম্যে ক্ষমতাসীন সরকারের অপসারণ; একটি অন্তবর্তীকালীন বিপবী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ এবং গণভোটের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত ইসলামী সংবিধান অনুমোদন -এ ৩ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সর্বমোট ১১টি দল ও সংগঠনের সমবায়ে এই জোট গঠিত হয়। এ জোটের শরিক দলগুলো ছিল ; ইসলামী যুব শিবির (কাদের), মজলিসে দাওয়াতুল হক (আবদুল হাই), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (হাফেজ্জী হুজুর), ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (মেজর জলিল), খেলাফত রাব্বানী পার্টি (আবুল কাসেম), নেজামে ইসলাম পার্টি , জমিয়ত ওলামায়ে ইসলাম (মালিক হালিম), ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি (হাবিবুলাহ), মজলিসে তাহফুজ খাতমে নাবুয়াত (জাব্বার), খাদেমুল ইসলাম জামায়াত (হোসেন আহমেদ) এবং ইসলামী যুব আন্দোলন (হেমায়েত উদ্দিন)[৬৫৮]। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি ও জনপ্রিয় কর্মসূচির অভাবে এ জোট রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু জোটের মূল নেতা হাফেজ্জী হুজুরের দল ১৯৮৬ সালের ক্ষমতাসীন সরকার অব্যাহত রাখার সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে জোটটি আর টিকে থাকতে পারেনি।

---

[৬৫৬] এম সলিমুলাহ খান, চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশের বাম রাজনীতি, সরকার ও রাজনীতি, গোলাম হোসেন সম্পাদিত, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ১৭৬।

[৬৫৭] আবদুর রহিম আজাদ, শাহ আহমেদ রেজা, বাংলাদেশ রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবণতা (২১ দফা থেকে ৫ দফা) সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, জুন ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

[৬৫৮] আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, পড়ুয়া, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৬, পৃষ্ঠা : ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করিমকে মুখপাত্র ঘোষণা করে কয়েকটি ইসলামী দল ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে আরেকটি জোট গঠন করে। জোটটি দীর্ঘ সময় সক্রিয় থাকতে পারেনি। এক পর্যায়ে জোটটি কার্যত চরমোনাইয়ের পীরের নেতৃত্বাধীন একক দলে পরিণত হয়[৬৫৯]।

সরকার এক অভিনব কৌশলের আশ্রয় নেয়। নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ দেখানোর জন্য সরকার জাসদ নেতা আ. স. ম. আব্দুর রবকে একটি রাজনৈতিক জোট গঠনে উৎসাহিত করে। জাসদের নেতৃত্বে ৭৬টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)। এই জোটে আ স ম আব্দুর রব ছাড়া বাকি প্রায় সবাই ছিলেন স্বঘোসিত নেতা। এতে যেসব দল ও গোষ্ঠির সমাহার ঘটেছিল তাদের মধ্যে আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে কোন সাদৃশ্য ছিল না। এই জোটের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সর্বস্তরের মানুষ একে সরকারি চক্রান্ত এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল বলে আখ্যায়িত করেন। সমালোচকারা এ জোটকে গৃহপালিত বিরোধী দল আখ্যা দেন।

এরশাদ শাসনামলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যেও জোট গঠনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯ টি সংগঠন হল; বাংলাদেশ ছাত্র লীগ(মান্নান-নানক), ছাত্র লীগ (ফজলু-মুকুল), ছাত্রলীগ (মুনীর-হাসিব), ছাত্রলীগ(রশীদ-জহির), ছাত্রলীগ (আখতার), ছাত্রলীগ (আজিজ), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (ইসরারুল-স্বপন), বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (মানু), বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, জাতীয় ছাত্র সংসদ, সমাজবাদী ছাত্র জোট এবং ছাত্র একতা কেন্দ্র। মূলত পরস্পর বিরোধী সংগঠনগুলোর এই ঐক্য পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে।

১৯৮৫ সালের ২২ নভেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (লু-আ), জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) সমর্থিত ছাত্রলীগ, ও অন্য ৫টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সংগ্রামী ছাত্রজোট গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা আহুত এক সমাবেশে নবগঠিত ছাত্রজোট সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং প্রকাশ্যে রাজনীতির দাবি জানায়[৬৬০]।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর প্রায় সবকটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা এক থাকারও শপথ নেয়। এর মধ্যে উলেখযোগ্য ছিল; সম্মিলিত শিক্ষক আন্দোলন (১০টি শিক্ষক সংগঠন এ জোটে অংশ নেয়); যুব সংগ্রাম পরিষদ (৮টি যুব সংগঠন এ জোটে

[৬৫৯] তারেক মুহাম্মদ তরফীকুর রহমান, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২- ২০০১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪।
[৬৬০] রহুল আমিন, খালেদা জিয়া: স্বৈরাচার বিরোধী আন্দালন ও মূলধারার নেতৃত্ব, হীরা বুকমার্ট, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১৪৫।

অন্তর্ভূক্ত ছিল); শ্রমিক কর্মচারি ঐক্য পরিষদ (১৯টি শ্রমিক সংগঠন এর সদস্য ছিল); কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতি (৯টি কৃষক সমিতি ও ক্ষেত মজুরদের দল এ আন্দোলনে শরিক হয়); ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ (১৮টি নারী সংগঠন এ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়); এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট (শতাধিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এ সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করে)[৬৬১]।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর তিন বিরোধী জোট কর্তৃক সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তপ্ত করে তোলে এবং ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক গণঅভ্যূত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অবসান ঘটে দেশব্যাপি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির। শুরু হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রযাত্রা।

সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের প্রক্কালে প্রধান চারটি প্রতিদ্বন্দ্বি পক্ষ ছিল নিম্নরূপ: আওয়ামী লীগ অথবা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট; বিএনপি (বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের দুই শরিক দল ইউপিপি এবং ভাসানী ন্যাপের দুই খন্ডাংশে বিএনপিতে বিলীন হওয়ায় ৭ দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়) ; ৫ দলীয় বাম জোট; এবং জামায়াতে ইসলামী। ৮ দলীয় জোটগত ভাবে নির্বাচন করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু জোটভুক্ত দলগুলো আসন ভাগাভাগি প্রশ্নে একমত হতে পারেনি। ফলে আওয়ামী লীগ ছাড়া ৮ দলীয় জোটের অন্যান্য শরিক দল এবং ৫ দলীয় বাম জোটের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট[৬৬২]। প্রথমে দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও নিজ ঐক্য-বলয়ের চাপে শেষ মুহূর্তে ৮ দলীয় জোটের পাঁচটি শরিক দলকে ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয়[৬৬৩]। এতে আওয়ামী লীগ ও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফ্রন্ট সমঝোতা বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ৮ দলীয় জোটভূক্ত শরিক দলগুলো দেড় শতাধিক আসনে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কেউ কেউ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে, কেউ কেউ গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে[৬৬৪]। সরকার গঠনের জন্য বিএনপিকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি অথবা জামায়াতে ইসলামী এর সাথে কোয়লিশন করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কারণ, সরকার গঠনের জন্য বিএনপি আরও ১১টি আসন প্রয়োজন ছিল। অবশেষে

[৬৬১] মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: ১৯৯০-১৯৯৯, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১৮

[৬৬২] গোলাম হোসেন ও তৌফিক আহমদ, নির্বাচন ও গণতন্ত্র, সরকার ও রাজনীতি, গোলাম হোসেন সম্পাদিত, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ২৫৯।

[৬৬৩] আবুল ফজল হক, বালাদেশের রাজনীতি: সংস্কৃতির স্বরূপ, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা১০৫।

[৬৬৪] গোলাম হোসেন ও তৌফিক আহমদ, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ২৫৯।

জামায়াতের নিঃশর্ত সমর্থনে ২০ মার্চ ১৯৯১ সালে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। বিএনপি ও জামায়াত এর মধ্যে রাজনৈতিক মৈত্রী বিএনপিকে ক্ষমতাসীন হতে সাহায্য করে।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক ইস্যুভিত্তিক জোট গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সমাজবাদী ও সমাজ প্রগতির ধারা সংহত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পার্টি, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণআজাদী লীগ ও সমমনাদের নিয়ে প্রগতিশীল গণঐক্যজোট আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও জামায়াত-শিবির প্রতিরোধ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও দল নিষিদ্ধ করা এই দু'টি ইস্যুতে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা করার লক্ষ্যে - বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, সমন্বয়ে ২৯ সেপ্টেম্বরে ১৯৯৩ ছাত্র সমাজের একটি ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয়। তবে জোট দু'টির কার্যক্ষেত্র খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

আওয়ামী লীগ সকল বামপন্থী দল বাদ দিয়ে জামায়াত ও জাতীয় পার্টিকে নিয়ে ত্রিদলীয় জোট গঠন করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৯৯৪, ৯৫ ও ৯৬ সালে ত্রিদলীয় জোট অভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৯৬ দিন হরতাল, অবরোধ এবং অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচিতে সকাল সন্ধ্যা হরতালের পাশাপাশি একটি লাগাতার ৯৬ ঘন্টা, দু'টি ৭২ ঘন্টা, এবং পাঁচটি ৪৮ ঘন্টার হরতাল ডাকা হয়[৬৬৫]। সরকার বিরোধী আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্যায়ে ২৩ মার্চ ১৯৯৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ স্থাপন করে সরকার পতনের আন্দোলনের আহবান জানানো হয়[৬৬৬]। এরূপ পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাশ করে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্ঠা করে সরকার থেকে চলে যাওয়া ছাড়া বিএনপির আর কোনো পথ খোলা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে অনমনীয় প্রদর্শন করতে গিয়েই ক্ষমতা হারায়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পায়।

শেখ হাসিনার শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টির সমন্বয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। খালেদা

---

[৬৬৫] মোঃ সুলতান মাহমুদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকী করণের সমস্যা একটি পর্যবেক্ষণ মুলক সমিক্ষা, Development Compilation, Vol. 07. No. 01 (June 2012) পৃষ্ঠাঃ ১৪৯।

[৬৬৬] তারেক এম টি রহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৫৪।

জিয়া তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জোটবদ্ধ নির্বাচন করলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬'র ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সপ্তম নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে জাতীয় পার্টি এবং জাসদের সমর্থনে ২৩ জুন ১৯৯৬ ঐক্যমতের সরকার গঠন করে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং জাসদ সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রবকে মন্ত্রিভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিএনপিকেও এই ঐক্যমতের সরকারে যোগদানের আহবান জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি তা প্রত্যাখান করে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ঐক্যমতের সরকারকে বাকশালের নব্য সংস্করণ হিসেবে অবিহিত করেন।

শেখ হাসিনার শসনামলের শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এক ধরণের টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে সংবিধান অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্য জোট মিলে চারদলীয় জোট গঠন করে। চারদলীয় জোটের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও দলের সমাবেশ ঘটেছিল। এই জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে নীতি ও আদর্শগত মিলের পাশাপাশি লক্ষ্যগত একটা মিল ছিল এবং তা হল ক্ষমতায় যাওয়া এবং যে কোনোভাবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকিয়ে রাখা[৬৬৭]।

চারদলীয় জোট গঠিত হবার পর আওয়ামী লীগ নানা কৌশলে এই জোট ভাঙ্গার চেষ্টা করে। এরশাদ তার জেল মুক্তির বিনিময়ে চারদলীয় জোট থেকে তার দল নিয়ে বেরিয়ে আসেন[৬৬৮]। অবশ্য নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির একটি অংশকে বিএনপি জোটে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। অবশ্য জাতীয় পার্টি এরশাদ চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসায় জোটের ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই এরশাদের নেতৃত্বে নয়া জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জাতীয় পার্টি চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিমের নেতৃত্বাধীন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি দলকে সাথে নিয়ে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী

---

[৬৬৭] মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, ফখরুদ্দীন সরকারের ২ বছরের খন্ডচিত্র, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৭।

[৬৬৮] রেজাউল করিম, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কিছু কলাকৌশল, প্রথম আলো, ২০ মে ২০০১।

জোট গঠন করে এবং ক্ষমতায় গেলে শরিয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা প্রদান করে। এই জোটভূক্ত দলগুলোর কিছু অনুসারী ছিল তাতে সন্দেহ নহে। কিন্তু দল হিসেবে এদের নেতারা যতনা পরিচিত ছিলেন তার চাইতে বেশী পরিচিত পীর ও ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে [৬৬৯]। ১ অক্টোবর ২০০১ অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে চারদলীয় জোট ২১৬টি আসন পেলেও আওয়ামী লীগ পায় ৬২টি আসন। এই সময় বাংলাদেশের রাজনীতি স্পষ্টতই দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে **মহাজোট**, অন্যদিকে বিএনপির **চারদলীয় জোট** নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অবশ্য চারদলীয় জোট সরকারে শাসনামলের শেষ দিকে আ. স. ম. আব্দুর রব ও কাদের সিদ্দিকী যুক্তফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠন করেছিলেন। সঙ্গে আরো কয়েকটি ছোট ছোট দলও ছিল। তবে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির বাতিল হওয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করাকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য দেখা দেয়ায় দুই মাসের মাথায় ভেঙ্গে যায় যুক্তফ্রন্ট। চারদলীয় জোটের শাসনামলে শেষের দিকে জল্পনা-কল্পনায় অনেক জোট গঠিত হয়েছিল। ওই সময় উলেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি ছিল ছোট ছোট বাম ঘরনার দলগুলোর ১১ দলীয় জোট।[৬৭০] শুরু থেকেই ১১ দলীয় জোটের বক্তব্য ছিল, এটি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনৈতিক ধারার বাইরে বিকল্প রাজনৈতিক ধারা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করবে।

আওয়ামী লীগ এরশাদকে জোটে ভেড়াতে উলেখযোগ্য ছাড় দিয়ে ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতীয় পার্টির সঙ্গে ১৫ দফা চুক্তি করে এবং এরশাদ ঐদিন ঢাকার পল্টন ময়দানে ১৪ দলের সমাবেশে উপস্থিত হন এবং সেদিন ১৪ দলের মহাসমাবেশ মঞ্চে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ ও বিকল্প ধারার প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ ইসলামী ঐক্যজোট ও জাকের পার্টি ইত্যাদি দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট। খেলাফত মজলিস চারদলীয় জোট ত্যাগ করার পর আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যের চেষ্টা চালায়। এর ধারাবাহিকতায় ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ হঠাৎ করেই খেলাফত মজলিসের সঙ্গে নানা ধর্মীয় দাবি পালনের অঙ্গিকার নিয়ে পাঁচদফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে[৬৭১]। তারপর ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে (যা পরে বাতিল হয়ে যায়) সামনে রেখে নির্বাচনী জোটে রূপান্তরিত হয়ে মহাজোট [৬৭২]।

নবম জাতীয় সংসদ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে আবারও তারা নতুন করে জোট গঠনে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠন করা হয়। পরিবর্তনের রাজনীতি এই শোগানকে সামনে রেখে

[৬৬৯] তারেক শামসুর রেহমান, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা, ইত্তেফাক , ঢাকা, ১ অক্টোবর ২০০১।
[৬৭০] ইমতিয়ার শামীম, ভোটের পথে জোটবদ্ধ, সাপ্তাহিক ২০০০, ২৮ জুন ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৯।
[৬৭১] The Daily Star, December 2006.
[৬৭২] খবরপত্র, ৫ জানুয়ারি, ২০১০।

১৮ নভেম্বর ২০০৮ এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্ট মোট পাঁচটি দল নিয়ে গঠিত যাদের বেশির ভাগই নতুন মিলে এই জোট গঠন করে কমবেশী এক-তৃতীয়াংশ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। প্রধান দু'টি শরিক দল ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম এবং বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্পধারা। বাকি তিনটি শরিক দল-কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টি (ডিপিপি), জেনারেল (অবঃ) ইবরাহিমের কল্যাণ পার্টি এবং বাংলাদেশ ফরোয়ার্ড পার্টি আসলে সাইনবোর্ড সর্বস্ব দল। জোট গঠনের ঘোষণার আগে অভিন্ন সুরে বলা হয়, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে পরিবর্তনের জন্য দেশের প্রধান দুটি জোটের বাইরে এ জোট গঠনের উদ্যোগে নেয়া হয়। বিএনপি আওয়ামী লীগের দ্বি-দলীয় রাজনীতি এখন বিএনপি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পক্রিয়ায় ক্ষমতার লড়াই মুখ্য হয়ে দাড়িয়েছে।

বর্তমানে জোট রাজনীতির প্রকৃতি হলো নৈতিক আর মূল্যবোধ বিবর্জিত এই জোটের রাজনীতিতে বড় দলগুলো জোট গঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে ভোটের অঙ্কের হিসাব তথা নির্বাচনী লাভ-লোকসানকে প্রাধান্য দেয়। সে কারণেই স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শ লালনের প্রধানতম দাবিদার আওয়ামী লীগকে যেমন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল খেলাফত মজলিস কিংবা স্বৈরাচারী এরশাদের সঙ্গে জোট করতে কোনো অসুবিধা হয় না, তেমনি বামপন্থি দলগুলোকেও নীতি ও আদর্শের বিপরীতে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সঙ্গে জোট গঠন করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চেয়ে দল বা ব্যক্তি স্বার্থই বেশী প্রাধান্য পায়। এই সংস্কৃতি গণতন্ত্র চর্চা ও বিনির্মাণের জন্য সহায়ক নয়।

৮.২৪ নামকরণ ও নাম কর্তনের রাজনীতি

জাতীয় রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রখ্যাত ব্যক্তির নামে ঐতিহাসিক স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের রীতি উন্নত-অনুন্নত প্রায় সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু স্রেফ সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা দলবাজির কারণে নাম বদলের খেলা বোধ হয় বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও প্রদর্শিত হয় না। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নাম পরিবর্তন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অবশ্য নাম বদলের এই ঐতিহ্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যাক্তিনির্ভর রাজনীতি চর্চা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি সমস্যা। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য মারাত্বক হুমকি স্বরূপ। এখানে এক দলের সদস্যরা অন্যদলের সদস্য ও নেতৃত্বের প্রতি অসম্মান ও অনীহা প্রদর্শন করতে অনেক বেশী গৌরব বোধ করে [৬৭৩]। আজকের বিশ্বের বহু উন্নত দেশেই ভিন্ন মতের ভিন্ন আদর্শের নেতৃত্বর মধ্যে পারস্পারিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বহু নজীর রযেছে। পৃথিবীর অনেক দেশের অফিস আদালতের তাদের জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রপতি এবং জাতির জনকের ছবি টানানোর প্রচলন রয়েছে। জার্মানিতে ইউরো চালু হওয়ার আগে তাদের জাতীয় কারেন্সিতে জাতীয় নেতাদের ছবি ছিল। এ জন্য সেখানে কোনো আইন প্রণয়ন করতে হয়নি। এসব দেশে অফিস আদালতে ছবি টানানোর বা কারেন্সিতে ছবি থাকার বা না থাকার বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনো দিন আপত্তি করেনি। কিন্তু তাদের মধ্যে এর ধরনের হীন ও অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নেই। ভারতে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে আদর্শ ও নীতির মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তারা ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর বা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মুছে ফেলেননি। কংগ্রেস রাজনীতির আরেক সমালোচক সিপিএমের প্রধান নেতা জ্যোতি বসু কলকাতার যে বাড়িতে থাকেন তার নাম ইন্দিরা ভবন[৬৭৪]।১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর মদন মোহন বসাক রোডের নাম দেয়া হয় টিপু সুলতান রোড আর দিপালি বালিকা বিদ্যালয় হয়ে যায় কামরুন নেসা বালিকা বিদ্যালয়। এটা ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ফসল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো মূলত প্রতিহিংসার চরিতার্থের উদ্দেশ্যে নামকরণ ও নাম হরণের প্রতিযোগীতা শুরু করে। এক মাত্র বঙ্গবন্ধু মুজিব সংকীর্ণ দলীয় চিন্তার উর্ধ্বে থেকে জাতীয় নেতাদের সম্মানার্থে নামকরণে ব্রতী হন। তিনি রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে সুন্দর এলাকাটির নাম রাখেন শেরেবাংলা নগর, ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানের নাম দেন সোহরাওয়ার্দি উদ্যান, আর জাতীয় সংসদ ভবনের সামনের প্রসস্থ এভিনিউ এর নাম রাখেন মানিক মিয়া এভিনিউ (তোফাজ্জল হোসেন, যিনি ছিলেন বাংলদেশ মুক্তি

---

[৬৭৩] রহমান, মোঃ এখলাছুর ও খুশী, ইসমাত আরা, ২০১০, বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক প্রবণতাঃ একটি বিশেষণ, বাংলা ভিশন, ভল্যুয়ুম ঃ ১, ১ মে, ২০১০, পৃষ্ঠা-১৫৯।

[৬৭৪] মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ মার্চ, ২০০১ , পৃষ্ঠা ঃ ৭

সংগ্রামের অকুতোভয় সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব)। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তিরোধানের পর নামকরণ ও নাম বদলের খেলাটি কদর্য রূপ ধারণ করে। নিন্মে এর একটি তালিকা দেয়া হল।

প্রথমত ঃ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র বিমান বন্দরের নাম ছিল তেজগাঁও বিমান বন্দর। ১৯৭৯ সালে ঢাকার অদূরে আন্তর্জাতিক মানের নতুন বিমান বন্দর চালু হলে তার নাম রাখা হয় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ১৯৮১ সালে প্রায়ত রাষ্ট্রপতি জিয়ার নামানুসারে তদানীন্তন বিএনপি সরকার এর নাম দেয় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। কিন্তু ২০১০ সালে শেখ হাসিনার দ্বিতীয় শাসনামলে বিমান বন্দরটির নাম বদল করে রাখা হয় 'হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এই নাম বদলের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, এ দেশের মানুষ যেহেতু সুফি আওলিয়াদের শ্রদ্ধা করে সেহেতু একজন ধর্মীয় ব্যক্তিতের স্মৃতি রক্ষার্থে এই নামকরণ হয়েছে। এছাড়া ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে গৃহীত মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্ত বলে বলা হয় যেহেতু হাইকোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংবিধান সংশোধনী বাতিল এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতা জবর দখলকারী অবৈধ শাসক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেহেতু তার নামে কোন স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান রাখা যাবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে উন্নীত করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম পাঠক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের নামানুসারে রাখা হয় 'এম এ হান্নান বিমান বন্দর'। পরবর্তী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার সে নাম পাল্টিয়ে রাখে 'শাহ আমানত বিমান বন্দর'। এ নাম এখনও বহাল রয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে নির্মিত ভৈরব সেতুর নাম বদল করে আওয়ামী লীগ সরকার মক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নামানুসারে " সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু " রাখা হয়। জোট সরকার ঐনাম পরিবর্তন করে রাখে 'বাংলাদেশ- যুক্তরাজ্য মৈত্রি সেতু"। এই সেতু উদ্বোধন কালে সাইফুর রহমান মন্তব্য করেন, কোথার কে নজরুল ইসলাম, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার"।

চতুর্থত ঃ শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে সমাপ্ত যমুনা নদীর ওপর নির্মিত দেশের বৃহত্তম সেতুর নাম দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু সেতু। পরবর্তী জোট সরকার এই নাম বদল করে রাখে ' যমুনা বহুমুখী সেতু"। একজন আওয়ামী লীগ সাংসদ জাতীয় বঙ্গবন্ধু সেতু উচ্চারণ করায় ঐ সেতু সংশিষ্ট এক প্রশ্নের উত্তর দেননি তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। আবার শেখ হাসিনা শাসন কালে বঙ্গবন্ধু সেতু নামটি ফিরে পেয়েছে।

পঞ্চমত ঃ শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটর নাম দিয়ে দেশের প্রথম নভোথিয়েটর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক উদ্বোধনের সময় এর নাম দেয়া হয় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নভোথিয়েটর । বিএনপি হয়ত ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর নাম দিলে তা চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর নামটি পুনঃস্থাপন করেন।

ষষ্ঠত ঃ শেখ হাসিনার প্রথম সরকার ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে খালেদা সরকার সে নাম বদল করে রাখে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে আবার ক্ষমতায় এসে এর নাম রাখেন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিকক সম্মেলন কেন্দ্র।

সপ্তমত ঃ স্বৈরশাসক বলে বহুল সমালোচিত জেনারেল এরশাদ ঢাকায় একটি স্টেডিয়াম নিমার্ণ করে সেটির নাম রাখেন এরশাদ স্টেডিয়াম এবং জাতীয় সংসদ ভবনের সন্নিকটে একটি পার্কের নাম রাখেন চন্দ্রিমা উদ্যান। পরবর্তী বিএনপি সরকার স্টেটিয়ামটির নাম বদল করে রাখেন শুধু আর্মি এস্টেডিয়াম আর চন্দ্রিমা উদ্যানের নাম রাখেন জিয়া উদ্যান। পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার পুনঃরায় পার্কটির নাম দেয় চন্দ্রিমা উদ্যান।

সারণী ঃ ৩৬

বিভিন্ন সময় নাম বদলের ধরণ

প্রথম নামকরণ	সরকার	পরিবর্তিত নাম	সরকার
ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	মুজিব	জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	এরশাদ
		হযরত শাহ জালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমান কন্দর	হাসিনা
চট্টগ্রাম বিমান বন্দর		এম এ হান্নান বিমান বন্দর	হাসিনা
		শাহ আমানত বিমান বন্দর	বিএনপি
বঙ্গবন্ধু সেতু	হাসিনার	যমুনা বহুমখী সেতু	বিএনপি
		বঙ্গবন্ধু সেতু	হাসিনা
বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটর	হাসিনার	মাওলানা আবদুল হামিদ খান নভোথিয়েটার	হাসিনার
		বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটর	হানিসা
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	হাসিনার	বাংলাদেশ- চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র	বিএনপি
এরশাদ আর্মি স্টেডিয়াম	এরশাদ	আর্মি স্টেডিয়াম	বিএনপি
চন্দ্রিমা উদ্যান	এরশাদ	জিয়া উদ্যান	বিএনপি
		চন্দ্রিমা উদ্যান	বিএনপি

সূত্র: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

সরকারী দলের বা বিরোধী দলের জীবিত কিংবা মৃত যা হোক না কেন সকল জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। জাতীয় নেতারা সম্মানের পাত্র। তারা সাধারনত দল মত ও রাজনীতির উর্ধ্বে থাকেন তারা সম্মানিত হবেন জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও জাতি তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।এটাই সুস্থ রাজনীতি।এ দেশে মাওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ শোহ্‌রাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান আজীবন সাধারণ জনগণ ও দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার বা নেতা হওয়ার রাজনীতি তারা কোনো দিন করেননি। জনগণই ভালবেসে তাদের ক্ষমতা দিয়েছে, নেতা বানিয়েছে। আমরা এখন যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধারণ করছি তার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনন্য অবদান রয়েছে। বাংলাদেশর স্বাধীনতা সংগ্রামের মজবুত ভীত গঠনে মাওলানা ভাসনীর অবদানকে জাতি কখনও ভুলতে পারবে না। এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা আন্দলোনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে নেতৃত্ব ও অবদান বাঙ্গালি জাতি তা কিভাবে অস্বীকার করবে। অস্বীকার করা যাবে কি জিয়াউর রহমানের অবদান? মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। দেশের উন্নতির জন্য নিরলস কাজ করেছেন।

এই নাম বদলের হীন রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে দেশ সাময়িক সময়ের জন্য রাজনৈতিক বিরোধ সৃষ্টি করে যা বহু ক্ষেত্রে দেশে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক চলমান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি বাধার কারণ হয়ে থাকে যা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার জন্য মটেও শুভকর নয়।

৮.২৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান কোনো বিপ্লবের ফল নয়। বাংলাদেশের সংবিধান প্রত্যক্ষ গৃযুদ্ধের ফল। এ উপমহাদেশের সাংবিধানিক দলিলগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক আরোপিত হয়েছে। একটি পর্যায়ে স্বীকৃত হয়েছে জনগণের অধিকার। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সম্রাট কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারত ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সে বছরই তারা ভারত শাসনের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করেন। ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক প্রণীত এ বিধানের নাম করণ হয় ভারত শাসন আইন ১৮৫৮। এ আইনে জনগণের কোন অধিকার স্বীকৃত হয়নি বরং জনগণের অধিকার হরণ করে নেন ভারত সচিব। তাকে সাহায্য করতেন পনের সদস্যের একটি পরিষদ। এ পরিষদ ভারতীয় জনগণের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তারা ছিলেন ব্রিটিশ সম্রাট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্য। তারা ব্রিটিশ সংসদের কাছে দায়ী ছিলেন। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর কোনো প্রক্রিয়া ছিল না। দলীয় ব্যবস্থা ছিল অকার্যকর[৬৭৫]। বাংলাদেশর সংবিধানেও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তেমন কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। শুধু সংবিধানের ৭০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী রূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূণ্য হবে। এ থেকেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাংবধানিক রাজনীতিতে ব্যক্তির উর্ধ্বে রয়েছে দল। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর তার আদর্শ দলীয় আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়[৬৭৬]। গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক দল গড়ে তোল হয়। এ উপমহদেশে রাজনৈতিদক দল গড়ে উঠেছে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ফলে নেতাদের মধ্যে রয়েছে মহান আত্মত্যাগের মহিমা। তা সত্বেও আমাদের দেশে বারবার নির্চিন প্রক্রিয়ার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে [৬৭৭]।

[৬৭৫] শফিক, মাহমুদ, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, অনন্যা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪৬।
[৬৭৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭।
[৬৭৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭।

গণতন্ত্রের অন্যতম এক স্তম্ভ হলো নির্বাচন। বস্তুত গণতন্ত্রে উত্তরণে নির্বাচন নামক প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। এর কারণ হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি তথা নেতৃত্ব বাছাইয়ের স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে এবং সে সাথে এ প্রতিষ্ঠান সরকারের বৈধতা আনয়ন করে ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবদান রাখে। নির্বাচনকে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হিসেবেও উলেখ করা হয়ে থাকে যার মাধ্যম জনগণ তথা ভোটারগণ প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রার্থী বাছাই করে। এ ব্যবস্থায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ, কেন্দ্রিয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা হয়[৬৭৮]।

নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ওপর জনগণ এবং রাজনৈতিক দলসমূহের বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক অভিনব রাজনৈতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে যেখানে নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ট পক্ষ পরাজয় মেনে নেয়। এমন ঐতিহ্য গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক এবং সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত হয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে[৬৭৯]।

তত্ত্বাবধায়ক ধারণাটি কিভাবে গণতন্ত্র চর্চার সাথে সম্পর্কিত এবং এটি আদৌ সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতি পূর্ণ কিনা। ব্রিটেনের মতো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র চর্চা অনেকাংশে নির্ভর করে সংসদীয় আচার, মূল্যবোধ, প্রথা এবং সর্বোপরি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদগণের মধ্যকার পারস্পারিক সহনশীলতা এবং বিশ্বাস বা আস্থার ওপর। সেজন্য একটি সরকার বা কেবিনেটের পতনের পর বিদায়ী সরকার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের অনুরোধক্রমে পরবর্তী নতুন সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত সাময়িক ভাবে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব চালিয়ে যায়। উক্ত প্রথা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিবর্তন এর এক অভিনব ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। ব্রিটেনে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় ব্যবস্থায় এমন একটি প্রথা থাকে যে বিদায়ী মন্ত্রিসভা প্রশ্নাতীত ভাবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য তত্ত্বধায়ক সরকার হিসেবে রূপান্তরিত হয়। এ ধরণের সরকার নির্দিষ্ট প্রথা অনুসারে নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না যা তার নির্বাচনী বিজয়কে প্রভাবিত করেতে পারে। এভাবে এ সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনা করা[৬৮০]। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ছাড়াও জাতীয় সরকার , অন্তর্বর্তী সরকার, সর্বদলীয় সরকার, ইত্যাদি। যেমন-১৯৪০ চার্চিল কে একটি জাতীয় সরকার গঠনের আহবান জানানো হয়।

---

[৬৭৮] হাসানাউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৭।
[৬৭৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮।
[৬৮০] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০।

আবার ১৯৪৫ সালে জাতীয় নর্বাচিনের প্রাক্কালে চার্চিল এক সর্বদলীয় সরকারের নেতৃত্ব দেন যাকে স্যার আ্ইভর জেনিংস এর মতো বিশেষজ্ঞগণ তত্ত্ববধায়ক সরকার বলে অভিহিত করেছেন। চার্চিল উক্ত সরকার রক্ষণশীল দল, লিবারেল পার্টি এবং কিছু দলীয়ভুক্ত নন এমন জাতীয় মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে সরকার গঠন করেন[৬৮১]। পাকিস্তানের ১৯৯৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে একিট নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকার পরিচালনা করে। ১৯৯৪ সালে নির্বাচনের সময় দক্ষিণ আফ্রিকাতে তত্ত্ববধায়ক সরকার গঠন করা হয়। জাতি সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৩ সালে নামিবিয়ায় এবং ১৯৯৫ সালে হাইতি ও মোজ্জাম্বিকে নির্বাচন পরিচালনায় সংশিষ্ট তত্ত্ববধায়ক সরাকর ভূমিকা পালন করে[৬৮২]। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক তত্ত্বসমূহে তত্ত্ববধায়ক সরকাব বা অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সাময়িকভাবে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কিত কোন বৈধ বিধিবিধান বা কনস্পেট অন্তর্ভূক্ত হয়নি। অপরদিকে বাংলাদেশের মতো অপাশচাত্যের বিভিন্ন সংসদীয় ব্যবস্থায় আস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রেই দারুণভাবে অনুপস্থিত থাকে, ফলে গণতান্ত্রিক উপায়ে ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তাতান্তর অনকে সময় দূরূহ হয়ে পরে।

বাংলাদেশে নির্বাচন বিভিন্ন ক্রান্তিকালীন সময় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সংযুক্ত পাকিস্তানের ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে প্রায়শ উন্মুক্ত এবং সুষ্ঠু হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এ সব নির্বাচন জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব রাখে যার ফলে এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যূদয় ঘটে। তবে যেমনটি লক্ষ্য করা যায় স্বাধীনতা অর্জনের পরে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর ক্রমান্বয়ে জনগণের আস্থা হ্রাস পেতে থাকে। এর মূল কারণ হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালীদের নির্বাচনে অসুদপায়সহ অনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন। এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন রাজনৈতিক ভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধকরণ এবং গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে রাষ্ট্র শাসনকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয় [৬৮৩]। এসব কারণে দেশে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, এবং ১৯৮৮ এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৮, ১৯৮১, এবং ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৭ এবং ১৯৮৫ সালের দু'টি গণভোট রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপরে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচত প্রভাব বা অবদান রাখেনি। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য

[৬৮১] মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্ববধায়ক সরকার বিতর্ক, ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৮।
[৬৮২] বিচিত্রা, ১২ এপ্রিল , ১৯৯৬।
[৬৮৩] হাসানাউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৯।

জনগণের ব্যাকুল বাসনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল নিরপেক্ষ **তত্ত্বাবধায়ক সরকার** প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করা[৬৮৪]।

১৯৮৩ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রথমবারের মতো এ দাবি পেশ করে। তবে শুরুতে এ দাবি প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সমর্থন পায়নি। অবশ্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি জামায়াতে ইসলামী তথা তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আযম প্রথম উপস্থাপন করলেও এর বাস্তাবায়ন হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তুমুল গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি ১৯৯০ সালে সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের প্রধান দাবিতে পরিণত হয় [৬৮৫]। এভাবে ত্রিদলীয় রাজনৈতিক জোটের যৌথ ঘোষনায় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়; ১৫ দল, ৭ দল এবং ৫ দল একটি সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনে তখনই অংশগ্রহণ করবে যখন সে নির্বাচন একটি অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্ববাধানে পরিচালিত হবে.........................একটি অন্তর্বর্তী তত্ত্ববধায়ক সরকার গঠন করা হবে...........এ সরকারের প্রধান দায়িত্ব থাকবে তিন মাসের মধ্যে সার্বভৌম সংসদের জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করা.......... তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান থাকবেন অরাজনৈতিক এবং নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অথবা সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। একইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী উলেখিত নির্বাচনে অংশ নেবেন না........ তত্ত্বাবধায়ক শুধু দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করবে.......অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তাতান্তর করবে....[৬৮৬]।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অসমঝোতা ও অবিশ্বাসের ফলে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিরাপক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংবিধানিক বিধান করা হয়েছে।[৬৮৭] নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল-১৯৯৬ আনয়ন করা হলে বিপুল ভোটে তা পাস হয়। ওই সংশোধনী আইনে সংবিধানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সঙ্গে ২ক পরিচ্ছদে সংযোজন পূর্বক ৫৮-খ, ৫৮-গ, ৫৮-ঘ এবং ৫৮-ঙ অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

---

[৬৮৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯।

[৬৮৫] আজিজুল হক; দোহাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে বিতর্কিত করবেন না, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃঃ ৫।

[৬৮৬] Moudud Ahmed, Democracy and challenge of development, Dhaka: The University Press limited ,1995, Page -349.

[৬৮৭] ড. মুহম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকলাপ প্রসঙ্গ, ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃঃ ৫।

প্রসঙ্গক্রমে উলেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র তিন মাসের জন্য ক্ষমতাসীন হয়ে থাকেন। তার প্রধান দায়িত্ব হলো যেকোনো মূল্যেই হোক দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে জাতিকে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচন উপহার দেয়া। যেহেতু কোনো দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচন বিতর্কমুক্ত হয় না, তাই জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এটা আমাদের রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতাই বটে। কারণ তারা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতিকে উপহার দিতে পারেননি। তাই রাজনীতিবিদদের কাজ করে দিতে হচ্ছে একটি অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কনসেপ্টটি অপরিহার্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

(১) দেশে কোনো সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই।

(২) ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই এই জন্য যে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত সকল সুবিধা নির্বাচনে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহার করবে। রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে।

(৩) সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সহায়তায়, বিশেষ করে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে জনগণের ওপর চাপ প্রয়োগ করে গণরায়কে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করবে।

(৪) নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে সামান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে।

(৫) জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং থানা পর্যায়ে টিএনও এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যাতে জনপ্রিয়তাহীন ব্যক্তিরাও নির্বাচিত হতে না পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) নির্বাচনের পূর্বক্ষণে অবৈধ এবং বৈধ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার ঘটিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ঠিকাদার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিতরণ করে দেশময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে, যার ফলে বিরোধী দলের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব।[৬৮৮]

সারণী ঃ ৩৭

তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থান ও কর্মসম্পাদন[৬৮৯]

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অহমেদ ১৯৯০	বিচারপতি হাবিবুর রহমান ১৯৯৬	বিচারপতি লতিফুর রহমান ২০০১
রাজনৈতিক দলসমূহের দাবির প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব গ্রহণ	রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলনের পেক্ষাপটে সংবিধান সংশোধন	সংবিধানের বিধান মোতাবেক দায়িত্ব গ্রহণ করেন
একাধারে রাষ্ট্র এবং সরকারপ্রধান এবং সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রক	সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত	সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত
নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন	নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন	ভূতপূর্ব সরকার গঠিত নির্বাচন কমিশনের সাথে কাজ করেন
নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আইন সংশোধন করেন	নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধিকরণে আইন সংশোধন করেন	নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধিকরণে আইন সংশোধন করেন

[৬৮৮] এমাজউদ্দীন আহমদ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজস্ব পথে চলতে দিন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ জুলাই, ২০০১, পৃঃ ৫।

[৬৮৯] Muzaffer Ahmed, The caretaker Government for free and fair Selection: Active vents and Challenges; International conference on Electoral Processes and Governance in South Asia, ICSE, Kandy, Colombo,21-23 june, 2002 page 8.

কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ে আমলা এবং পুলিশ প্রসাশনে রদবদল করেন	উচ্চপদস্থ আমলা এবং পুলিশ প্রসাশনে ব্যাপক পরিবর্তন করেন	উচ্চপদস্থ আমলা, পুলিশ প্রসাশন এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন করেন
রাজনৈতিক দলের পরামর্শে উপদেষ্ঠামন্ডলী বাছাই করেন	দলীয় পরামর্শ এবং নিজস্ব রায়ে উপদেষ্ঠামন্ডলী বাছাই করেন	ব্যক্তিগত ও দলীয় পছন্দের ভিত্তিতে অন্যান্য উপদেষ্টা বাছাই করেন
টিমপ্রধান হিসেবে প্রধানত কাজ করেন, প্রয়োজনানুসারে মতামত গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব ক্ষমতা ও পছন্দ প্রয়োগ করেন	টিমপ্রধান হিসেবে নিজস্ব জ্ঞান ও বিচক্ষনতা কাজে প্রয়োগ করেন	প্রশাসনিক রদবদল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করেন
ভোটার তালিকার মৌলিক হালনাগাদ করা হয়	ভোটার তালিকার মৌলিক হালনাগাদ করা হয়	ভোটার তালিকা হালনাগাদ তবে আইডি প্রদান সম্ভব হয়নি
সীমিতত সংখ্যক নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ দান	নির্বাচনী কর্মকর্তগণের বর্ধিত প্রশিক্ষণ, ভোটর শিক্ষায় এনজিও সম্পৃক্ততা	ব্যাপক প্রশিক্ষণ, চলমান ভোটর শিক্ষা, এনজিও সম্পৃক্ততা
নির্বাচনী ফলাফল সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। আওয়ামী লীগ সুক্ষ্ম কারচুপীর অভিযোগ আনে	নির্বাচনী ফলাফল সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। বিএনপি ভোট কারচুপির অভিযোগ আনে	নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগ এর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং স্থুল কারচুপির অভিযোগ আনে
স্বল্প সংখ্যক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে	সীমিত সংখ্যক সন্ত্রাস হয়	ব্যাপক ভাবে নির্বাচন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে
তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হয়	সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশংসিত হয়	প্রধান উপদেষ্টা এবং নির্বাচন কমিশন ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আওয়ামী লীগ উত্থাপন করে

সুত্রঃ Muzaffer Ahmed, The caretaker Government for free and fair Selection: Active vents and Challenges; International conference on Electoral Processes and Governance in South Asia, ICSE, Kandy, Colombo,21-23 june, 2002 page 8

অত্যন্ত আশ্চার্যের বিষয় এই যে, ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরূপ সমালোচনা অব্যাহত রাখে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নীলনকশা তৈরি করে বিশেষ দলকে ক্ষমতায় আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারাতে নীলনকশা তৈরি হতে মদদ দিচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (জনকণ্ঠ, ২৩/০৮/০১)। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, শেখ হাসিনার চিন্তাধারার ফসল তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনার সুন্দর পদক্ষেপকে নসাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রেতাত্মার সঙ্গে তুলনা করেছেন (প্রথম আলো, ২০/০৮/১)।[৬৯০] এ প্রক্রিয়ায় সবাইকে ছাড়িয়ে যান বিদায়ী সরকারের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী, যুবলীগ সভাপতি শেখ সেলিম। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

৬৯০ ড. মুহম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকলাপ প্রসঙ্গ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃঃ ৫।

একজন বাদে সবাই রাজাকার। জনাব সেলিমের এ উক্তিকে প্রথম আলো পত্রিকায় নিম্নমানের মানসিকতা ও দায়িত্বহীনতার প্রকাশ বলে উলেখকরা হয়।[৬৯১]

৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি একই ধারায় একই ধরনের কম-বেশি সমালোচনা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-অনুযোগ করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে, সে রাজনৈতিক দলই তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা এবং অভিযোগ-অনুযোগ করে থাকে। যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণীয় নয় বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্ম হয়েছে, সে দলগুলোর কাছে তাদের স্বার্থে আঘাতকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গুলো কি কোনো দিন গ্রহণীয় হওয়া সম্ভব? রাজনৈতিক দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা করার পূর্বে মনে রাখা ভালো যে, তাদের নানা রকম গৃহীত ও অগ্রহণযোগ্য কাজের জন্যই এ সরকারের জন্ম হয়েছে। কাজেই এ সরকারের কাজকর্ম তাদের স্বার্থহানি হতেই পারে।[৬৯২]

প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়াটি। নির্বাচনের ফলাফল পরাজিত পক্ষের স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে না পারার সংস্কৃতি এ সময় থেকে প্রকাশ্য হতে থাকে । নির্বাচনে হেরে আওয়ামী লীগ সুক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ উথাপন করে। পাশাপাশি সংসদ বর্জন, লাগাতার হরতাল প্রভৃতি কর্মসূচি দিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে বিএনপি তথা জোট সরকার। নানা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দুর্নীতির রাজত্ব গড়ে। দৃশ্যত প্রভাবিত করে তোলে তত্ত্বাবধায়ক কাঠামোকেও। ক্ষতিগ্রস্ত করে এর প্রতিষ্ঠানিক রূপটির। তাবেদার তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তাদের তাবেদার নির্বাচন কমিশন গঠন করে। রেকর্ড তৈরি করে ভুয়া ভোটার তালিকা গড়ার। ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে নির্বাচন খেলার মধ্যদিয়ে সাজানো নাটকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করবে বিএনপি-জামায়াত জোট। আওয়ামী লীগ বিএনপি-জামায়াত জোটের সাজানো নির্বাচনকে মোকাবেলা করার জন্য চরম নৈরাজ্যের অবস্থার সৃষ্টি করে[৬৯৩]। আওয়ামী লীগের সেনারা রাজপথে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক দলের সাতজন কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করে[৬৯৪]। অবশ্য পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার সময় বিএনপি জামায়াত জোট বরুদ্দোজা চৌধুরীকে সরিয়ে তাদের এক নিতান্ত অনুগত লোককে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করে সমগ্র প্রশাসনের এমন ভাবে সাজায় যাতে সরকারী ক্ষমতায় না থাকা সত্বেও প্রশাসনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা তাদের পক্ষে

[৬৯১] প্রাগুপ্ত।
[৬৯২] প্রাগুক্ত
[৬৯৩] এ কে এম শাহনাওয়াজ, সমাজ-রাজনীতির এক দশক, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা,প্রকাশ কাল-ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-২৭৩।
[৬৯৪] শফিক, মাহমুদ, গণতন্ত্রের জামা বহু বর্ণে চিত্রিত, বর্ণবীনা, প্রকাশকালমে-২০০৭, পৃষ্ঠা১৭।

সম্ভব হয়। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন যেভাবে তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন করেছেন তত্ত্বধায়ক সরকারকে পঙ্গু ও প্রায় অচল করে রেখে নিজেই সব সিদ্ধান্ত একতরফা ভাবে গ্রহণ করছেন তাতে তত্ত্বধায়ক সরকার তার আগের চরিত্র সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়েছে[৬৯৫]। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক ফখরুদ্দীন সরকার। এই সেনা সমর্থিত তত্ত্বধায়ক সরকার দীর্ঘ প্রায় দু'বছরের বেশী সময় পর একটি নির্বাচন উপহার দেন।

তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহকে সাধারণ ভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে মনে করা হলেও সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কতখানি নিরপেক্ষ হয়েছে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এমতাবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ত্রয়োদশ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ও সমমনা দলগুলো তা মেনে নেয়নি। তারা তত্ত্বধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে হরতাল রোডমার্চ সমাবেশ , মানববন্ধন, ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করেন। তারা ঘোষণা করেন তত্ত্বধায়ক সরকার ছাড়া অন্য কারও অধীনে নির্বাচনে যাবে না এবং অনুরূপ কোন নির্বাচন হতেও দিবেনা । অপর পক্ষে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঘোষনা করে, কোন অনির্বাচিত ব্যাক্তির হাতে ক্ষমতা দেয়া যাবে না [৬৯৬]। বিদ্যমান নির্বাচিত দলীয় সরকারই অন্তবর্তী কালীন সরকার রূপান্তরিত হবে এবং নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের হাতে। সরকার ও বিরোধী দলের এহেন বিরোধ গণতন্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

---

[৬৯৫] উমর, বদরুদ্দীন, বাংলাদেশের রাজনীতির হিসাব নিকাশ, আফসার ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।
[৬৯৬] হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশ কাল-ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৯৫-১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিক গতিধারা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারগণ নির্ধারণ করেন দেশ কে শাসন করবেন এবং কিভাবে শাসিত হবে। অর্থ্যাৎ নির্বাচন শুধু কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করা নয়, সেই ব্যক্তি বা তার দলের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার ব্যাপার[৬৯৭]।

সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের **১১** অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে " প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে [৬৯৮]। **পেঙ্গুইনের** রাজনীতি বিষয়ক অভিধানে অধ্যাপক ডেভিড রবার্টসন মন্তব্য করেছেন যে, নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটকে আসন বরাদ্দ বা কে বিজয়ী হয়েছে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি[৬৯৯]। অন্যদিকে **নরমান ডি পালমার** নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- Election are particularly conspicuous and revealing aspects of most contemporary political systems. They highlight and dramatise a political system, bringing its nature into sharp relife and providing insights into other aspects of hte system and the basic naturre and actual functioning of the political system as a whole[৭০০]. ।

Jeane Kirkpatricবর্ণনা করেন যে" Democratic election are not merely symbolic ....They are competitive, periodic, inclusive, definitive elections in which the chief decision-makers in a government are selected by citizens who enjoy broad freedom to criticise government, and to present alternatives".[701]

---

[৬৯৭] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারী ২০, পৃষ্ঠা-১৩৩।

[৬৯৮] দেখুন, মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষনাপত্রর ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত গুপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৬৯৯] David Robertson, The penguin Dictionary of Plotics, Middlesex, England, Penguine Books Ltd, ১৯৮৭.

[৭০০] Norrnan D. Oalmer, Election and Political Development: The South asian experience. Vikas, Nwe Delhi, 1976 Page-1

[৭০১] US Department of State, USINFO, State Government, ২০০৮.

গণতন্ত্র বিষয়ে তাত্ত্বিকগণ নির্বাচনকে সরকার ও শাসন ব্যবস্থা বৈধকরণের এক কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন এবং সমাজ ব্যবস্থার সংহতি, ব্যবস্থা ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা, অংশগ্রহণমূলক আচারণ ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭০২]

নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ওপর জনগণ এবং রাজনৈতিক দল সমূহের বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠা হয় এবং এক অভিনব রাজনৈতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে যেখানে নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে ও সংখ্যালগিষ্ঠ পক্ষ পরাজয় মেনে নেয়। এমন ঐতিহ্য গণতন্ত্র বিনির্মাণে সহায়ক এবং সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত হয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে[৭০৩]। বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায় বা এলাকা ভিত্তিক পরিসরের সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন ধরণের নির্বাচন লক্ষ করা যায়। যেমন-

- সাধারণ ও সংসদীয় নির্বাচন
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
- প্রাইমারি নির্বাচন
- স্থানীয় নির্বাচন
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন
- উপনির্বাচন, ইত্যাদি।

সরকার ব্যবস্থার সাথে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ সকল নিবার্চন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। কাজেই। সব ধরণের গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় নির্বাচন তথা সাধারণ নির্বাচন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ[৭০৪]। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের এক অত্যাবশক অংশ হলো নির্বাচন । **গবেষকের মতে-**æ Democracy and elections are the two faces of the same coin, where the is democracy there is election, both are synonym for all practical purposes”[705] | নির্বাচনী কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব। একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হচ্ছে ব্যাপকতর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যা নির্বাচনকালীন সময়ে পরিদৃষ্ট হয় [৭০৬]। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উপধারায় নির্বাচনের প্রয়োজন, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশনার, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ, প্রার্থী যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে। যেমন শাসনতন্ত্রের ৬৬ নং ধারায় বলা হয়েছে নির্বাচনে প্রার্থী হতে একজন প্রার্থীকে ২৫ বছর বয়সী হতে হবে। ১১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন, তার দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় উলেখ্য করা হয়েছে[৭০৭]।

---

[৭০২] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশকাল ২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৭।

[৭০৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮।

[৭০৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮।

[৭০৫]Rehana Ali, Working of Election Commission of India, 1950-2001, New Delhi: Ananada Prokashan (P & D), ২০০১, Page-1.

[৭০৬]Muhammad Yeahia Akhter, Electoral Corruption in Bangladesh, 2001, page 4.

[৭০৭]Mohiuddin Farooque and Rizwana S. Hasan, Essential Election Laws and thier Loopholes in Handbook of Election Reporting, published by society for Environment and human Development. 1995, Page 158.

জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার আদর্শগত ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার। কথাটি বহু পুরানো। আজ সারা বিশ্বে আদর্শগত ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকেই সকলের সেরা সরকার বলে স্বীকার করা হয়।[৭০৮] বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদের বিধানমতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রীতি সর্বজনবিদিত এবং এ রীতি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চালু রয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচ বছর পরপর নিয়মিত ভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে এবং এর মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করবে। বস্তুত সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ হলো সময় অনুযায়ী অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার বদল হয়, নতুন সরকার গঠন হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার হলো 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার'।[৭০৯] স্বাধীনতা উত্তর কালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর ক্রমান্বয়ে জনগণের আস্থা হ্রাস পেতে থাকে। এর মূল কারণ হলো রাষ্ট্রে ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালীদের নির্বাচনে অসুদপায়সহ অনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন। এ অবস্থার অবনতি ঘটে যখন রাজনৈতিক ভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে[৭১০]।

১৯৭৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে ১৫টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ছিল ৯টি সংসদ নির্বাচন , ৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ৩টি গণভোট। এই নির্বাচনগুলোর প্রেক্ষাপট, নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা, প্রক্রিয়া, পরিবেশ, প্রধান ইস্যুসমূহ, ফলাফল ইত্যাদি বিশেষণ করলে আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে[৭১১]।

সারণী ঃ ৩৮

এক নজরে ১৫টি নির্বাচন

১৯৭৩ থেকে ২০০৮ নির্বাচনী বিভিন্ন পর্যায়

নির্বাচনের ধরণ	নির্বাচনের সংখ্যা	নির্বাচনের সময় ও তারিখ
সংসদ নির্বাচন	৯টি	১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালের ৭ মে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালের ১২জুন ২০০১ সালের ১ অক্টোবর

[৭০৮] এ এম আবদুস সাত্তার; দৈনিক ইত্তেফাক, পৃষ্ঠা-৫, তারিখ-২০ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সাল (মতামত)।
[৭০৯] অধ্যাপক আনোয়ার উলাহ চৌধুরী; দৈনিক ইত্তেফাক, পৃষ্ঠা-৫, তারিখ- ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
[৭১০] হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি অব প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশকাল ২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৯।
[৭১১] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৩৪।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৩টি	১৯৭৮ সালের ৩ জুন ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বও ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর
গণভোট	৩টি	১৯৭৭ সালের ৩০ মে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টম্বর

ড. আবুল ফজল হক এর বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বই থেকে প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে
গবেষক কর্তৃক তৈরীকৃত সারণী

প্রথম সংসদ নির্বাচনঃ ৭ মার্চ ১৯৭৩

১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের অধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শাসকদল আওয়ামী লীগসহ ছোট বড় মোট ১৪ টি দল বা সংগঠন এতে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনকে ‘মুজিববাদ’ তথা সংবিধানের ওপর গণভোট বলে ঘোষনা করে[৭১২]। শেখ মজিবুর রহমান তার প্রতিটি নির্বাচনী সভায় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন সমস্ত জনগণ যে তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ এবং সংবিধানের চার মৌল নীতির ওপর বিশস্ত সারা বিশ্বকে তা দেখিয়ে দেবার জন্য এই নির্বাচন দেয়া হয়েছে[৭১৩]।

সারণী ঃ ৩৯

১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল *(দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮৯	২৮২*	৭৩.২০
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	২২৪	-	৮.৩৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল (জাসদ)	২৩৭	০১	৬.৫২
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	-	৫.৩২
বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি	০৪	-	০.২৫
কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.২০
বাঙলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)	০২	-	০.১০
বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি	০৩	-	০.০৬
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	০৩	-	০.০৯
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	০১	-	০.০৪
জাতীয় লীগ	০৮	০১	০.৩৩

[৭১২] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬।
[৭১৩] The Bangladesh Ovserver, দৈনিক বাংলা, পূর্বদেশ, ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ১৯৭৩।

বাংলা জাতীয় লীগ	১১	-	০.২৮
জাতীয় গণতন্ত্রী দল	০১	-	০.০১
জাতীয় কংগ্রেস	০৩	-	০.০২
নির্দলীয় প্রার্থী	১২০	০৫	৫.২৫
মোট	১০৭৮	২৮৯	১০০

সূত্র: বাংলাদেশ, নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

*১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ ২৮৯ টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হয় তার পরিসংখ্যান।

* ১১টি আসনে বিনা আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন

নিবার্চনের সমলোচনায় জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী) সহ বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পাটি (লেনিনবাদী), বাংলার কম্যূনিস্ট পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, প্রভৃতি বাম পন্থী দল বা সংগঠন তারা দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, এবং ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার ' লেজুর বৃত্তির' জন্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। এ ছাড়া তারা ঘোষনা করেন যে, এ নির্বাচন সাধারণ মানুষকে ঠকানোর একটি ফন্দি। এর মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত দাবি আদায় করা যায় না[৭১৪]। বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফ্ফার) আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচী, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতির সমালোচনা করে[৭১৫]। নির্বাচনের পর বিরোধী দল সমূহ অভিযোগ করে যে, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি; আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির মাধ্যমে জয় লাভ করেন। ন্যাপ (ভাসানী) নির্বাচনকে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করে তা বাতিলের জন্য গণ আন্দোলনের ডাক দেয়। বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি ন্যাপ (ন্যাপ মোজাফ্ফর) কতিপয় আসনে অগণতান্ত্রিক ও অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য আওয়ামী লীগের ওপর দোষারোপ করে[৭১৬]। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে বলা হয় কিছু সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ বলপ্রয়োগে ও ভোট জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেন[৭১৭]।

দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

১৯৮৭ সালের গণভোটের নির্বাচনের সাফল্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করে। সুতরাং সেই লক্ষে তিনি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর নিজের

[৭১৪] জাতীয় সমাজতন্ত্রিক দল, ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭৩; শ্রমিক-কৃষক সমাজকবাদী দল, নির্বাচনী ঘোষণাপত্র,১৯৭৩; ন্যাপ (ভাসানী), নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭৩; বাংলদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি(লেনিনবাদী), ঘোষণা পত্র ১৯৭২, কমরেড সংখ্যা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩; বালাদেশ কম্যনিস্ট পার্টি, নির্বাচনী ঘোষণা, ১৯৭৩।

[৭১৫] বাংলদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি, ঘোষণা ১৯৭৩, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭৩।

[৭১৬] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৩৫।

[৭১৭] The Wave (Weekly), ৩১ গধৎপয ১৯৭৩.

নের্তৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে একটি নতুন দল গঠন করেন[৭১৮]। বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী ১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল করা হয় এবং সরকার ও বিরোধীদলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আরো কতিপয় সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এগুলো মধ্যে কয়েকজন রাজবন্দী মুক্তি, সংবাদপত্রের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার। তাছাড়া বিরোধী দলকে নির্বাচনে প্রলুদ্ধ করার জন্য কিছু অভিনব কৌশল গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল যে দল অন্তত ৩০ জন প্রার্থী দিবে সেসব দলের উর্ধ্বতন নেতাদের বিনা ভাড়ায় জল-স্থল-বিমান পথে দেশের মধ্যে ভ্রমণ ও সরকারি রেস্ট হাউসে অবস্থান এবং বিনা খরচে টেলিফোন ও সরকারি গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা প্রদান। এবং মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমক্রিটিক লীগ কে নির্বাচনে রাজি করার জন্য পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করেন[৭১৯]। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫০.৬২%।

সারণী ঃ ৪০

১৯৮৯ সালের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৮৯	২০৭	৪১.১৬
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ	২৬৬	২০	১০.৯৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল (জাসদ)	২৪০	০৮	৪.৮৪
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	০২	২.৭৮
বাংলাদেশ গণফ্রন্ট	৪৬	০২	০.৬০
জাতীয় লীগ	১৩	০২	০.৩৬
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	৮৯	০১	২.২৫
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	২০	০১	০.৩৯
জাতীয় একতা পার্টি	০৫	০১	০.২৩
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন	১৮	০১	০.১৭
ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি)	৭০	০০	০.৮৯
ন্যাপ (নূর-জাহিদ)	৩৭	০০	০.৪৬
বাঙলাদেশ কম্যুনিস্ট পাটি	১১	০০	০.৩৯
অন্যান্য দল	১১১	০০	০.৭৫
নির্দলীয় প্রার্থী	৪২২	১৬	১০.১০
মোট	**২১২৫**	**৩০০**	**১০০**

[৭১৮] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৪১।
[৭১৯] প্রাগুক্ত-১৪২।

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা

বিরোধী দলসমূহ নির্বাচনে অভূতপূর্ব কারচুপির অভিযোগ করে। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের বক্তৃতায় অনুরূপ নীল নকশার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বিরোধী দলের সদস্যদরে কটাক্ষ করে বলেন সরকার চেয়েছিল বলেই তারা সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন[৭২০]।

তাছাড়া বিরোধী দলগুলো প্রমানসহ বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরে বলে যে, বিএনপি প্রার্থী ও সরকারি কর্মকর্তারা এই নির্বাচনে দুর্নীতি, অনিয়ম ও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেন[৭২১]।

তৃতীয় সংসদ নিবার্চন ঃ ৭ মে ১৯৮৬

জেনারেল এরশাদ তার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষনা দেন এবং ২২ মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ধার্য করেন। কিন্তু বিরোধী জোট ও দলসমূহ একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নিবার্চনের দাবিতে ২২ মার্চ হরতালের কর্মসূচী ঘোষনা করে। আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় জোটের বৃহত্তম অংশ ও জামায়াত-ই-ইসলামী তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ১৫ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত ৫টি ছোট বাম দল এবং ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে এবং নির্বাচন প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ বর্ধিত করা হয় এবং পূর্ব ঘোষিত ২৬ এপ্রিল এর পরিবর্তে ৭ মে তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল প্রায় ৬০% যা খুব কম লোকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য ছিল।

সারণী ঃ ৪১

১৯৮৬ সালের তৃতীয় সংসদ নির্বাচন, দলীয় অবস্থান

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
ন্যাপ (ঐক্য)	১০	০৫	১.২৯
বাঙলাদেশ কম্যুনিস্ট পাটি	০৯	০৫	০.৯১
জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)	১৪	০৩	০.৮৭
বাকশাল	০৬	০৩	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি	০৪	০৩	০.৫৩

[৭২০] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক , খন্ড ৩য়, সংখ্যা ২৫ (১৭ মার্চ ১৯৮০), পৃষ্ঠা-২০৮৯।
[৭২১] সংবাদ ও ইত্তেফাক, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯; বিচিত্রা সাপ্তাহিক , ২ মার্চ , ১৯৭৯।

ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১০	০২	০.৭১
গণ-আজাদী দল	০১	-	০.০৮
জামাযাত-ই-ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
জাসদ (রব)	১৩৮	০৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	০৪	১.৪৫
খেলাফত আন্দোলন	৩৯	-	০.৪৩
জনদল	৩৪	-	০.৩৪
বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি	১৪	-	০.২৪
ইসলামী যুক্ত ফ্রন্ট	২৫	-	০.১৮
জাতীয় জনতা পার্টি	০৫	-	০.১৬
সাম্যবাদী দল	০৬	-	০.১৩
অন্যান্য দল	২৪	-	০.১৯
নির্দলীয় প্রার্থী	৪৫৩	৩২	১৬.১৯
মোট	**১৫২৭**	**৩০০**	**১০০**

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা

দেশি-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনে সন্ত্রাস, ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জাল ভোট প্রদান ইত্যাদি ঘটনা আকারে সংঘঠিত হয় এবং এসবের জন্য ক্ষমতাসীন দলই প্রধানত দায়ী। ভোট গ্রহণের দিন হাঙ্গামায় অন্যুন ১৫ ব্যক্তি নিহত ৭০০ ব্যক্তি আহত হন। একটি ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক দল এই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের জন্য এক ট্রাজেডি বলে বর্ণনা করেন[৭২২]।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ৩ মার্চ ১৯৮৮

১৯৮৬ সালে নির্চিত তৃতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১২-২২ জুলাই। বিরোধী দলগুলো ঘোষণা করে যে, সামরিক আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা সংসদ অধিবেশনে যোগ দিবে না। শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে বিরোধী দল দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৮৭ সালে জেলা পরিষদে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে সংসদে একটি বিল পাশ করা হলে , প্রধান বিরাধী দল আওয়ামী লীগ সংসদ অধিবেশন বর্জন করে এবং কিছুদিন পরে জামায়াত-ই-ইসলামীও সংসদ বর্জন করেন । ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদের পদত্যাগের জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখলে পরিস্থিতির অবণতি ঘঠলে পনুঃরায় রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয়। ৬ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দেন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সারণী ঃ ৪২

১৯৮৮ সালের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন, দলীয় অবস্থান

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)

[৭২২] সংবাদ, ৮ মে ১৯৮৬।

জাতীয় পার্টি	২৮০	২৫১	৮৩.৬৬
কপ*	২৬৮	১৯	৬.৩৩
জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)	২৪	৩	১.০০
ফ্রীডম পার্টি	১১১	২	০.৬৬
অন্যান্য দল	৫৯	০	০
নির্দলীয় প্রার্থী	২১৩	২৫	৮.৩৩
মোট	৯৫৫	৩০০	১০০

সূত্র : নির্বাচন কমিশন, ১৯৮৮ ঢাকা। *কপ বা Combined Opposition Parties

বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা সহ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনকে প্রতারাণা বলে প্রত্যাখান করেন এবং অবৈধ এরশাদ সরকারেরর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। মিডয়ার রিপোর্ট ছিল এরূপ- দেশে কোন নির্বাচনী জোয়ার ছিলনা । রাজধানীর প্রায় ৬০০ ভোট কেন্দ্রের প্রায় সব কটিতে অস্ত্রধারীদের সক্রিয় দেখা গেছে। ব্যালটপত্র এবং ব্যালট বক্স ছিনতাই হতে দেখা গেছে এবং কমপক্ষে ৪ জন নিহত ও ১০০ ব্যক্তি আহত হন[৭২৩]।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচন ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক সফল গণঅভ্যূত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী ঐ দিন জেনারেল এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং জাতীয় সংসদও ভেঙ্গে দেন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৭৫ টি দল অংশগ্রহণ করে[৭২৪]।

সারণী ঃ ৪৩

১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১৪০	৩০.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাকশাল	৬৮	০৫	১.৮১
বাংলাদেশ কম্যূনিস্ট পার্টি	৪৯	০৫	১.৯১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	৩১	০১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	০১	০.৪৫
জনতা মুক্তি পার্টি	০৮	-	০.০৯
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
জামায়াত-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	০১	০.৭৯
জাকের পার্টি	২৫১	-	১.২২

[৭২৩] রোববার (সাপ্তাহিক), ৬মার্চ, ১৯৯৮।

[৭২৪] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৫১।

খেলাফত আন্দলোন	৪৩	-	০.২৭
জাসদ (রব)	১৬১	-	০.৭৯
জাসদ (ইনু)	৬৮	-	০.৫০
জাসদ (সিরাজ)	৩১	০১	০.২৫
ওয়ার্কাস পার্টি	৩৫	০১	০.১৯
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	-	০.১০
বাসদ (মাহবুব)	০৬	-	০.০৪
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.০২
ইউনাইটেড কম্যুনিস্ট লীগ	২৬	-	০.৩২
ঐক্য প্রক্রিয়া	০২	-	০.০৩
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	০১	০.৩৬
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	-	০.৩৫
ফ্রিডম পার্টি	৬৫	-	০.২৭
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (চার উপদল)	৮২	-	০.৩৪
অন্যান্য দল	২১৮	-	০.৫৩
নির্দলীয় প্রার্থী	৪২৪	০৩	৪.৩৯
মোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল মোট ভোটর সংখ্যার ৫৫.৩৫%। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৫টি দলের মধ্যে ৬৩টি দল সংসদে একটি আসনও পায়নি[৭২৫]। শেখ হাসিনা নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এবং কালো টাকা, মিথ্যা প্রচারণা, সন্ত্রাস ও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবকে তার দলের বিপর্যয় এর কারণ বলে উলেখ্য করেন[৭২৬]। নির্বাচনে যে কিছু অনিয়ম হয়নি তা নয়। কিন্তু এ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়। দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষগণ এই নির্বাচনকে অনন্য, অত্যন্ত সফল ও চমৎকার বলে বর্ণনা করেন[৭২৭]।

ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন যে আসনটি আওয়ামী লীগের ঘাটি বলে খ্যাত সেখানে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে বিএনপি প্রার্থীকে জয়ী করা হয়। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী ৪টি বিরোধী দলই অর্থ্যাৎ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলাম ও ইসলামী ঐক্যজোট বিএনপির বিরুদ্ধে ভোট সন্ত্রাসীর অভিযোগ আনে। সার্বিক পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রতীতি

[৭২৫] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৫১
[৭২৬] নির্বাচনোত্তর সংসবাদ সম্মেলন-সংবাদ, ১ মার্চ, ১৯৯১।
[৭২৭] সংবাদ, ১ মার্চ, ১৯৯১।

জন্যে যে, বিএনপি সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না। এই লক্ষে ১৯৯৪ সালের ২৭ জুন আওয়ামী লীগ , জাতীয় পার্টি ও জামায়াত-ই-ইসলাম এক যোগে সাংবাদিক সম্মেলনে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপরেখা ঘোষণা করেন এবং তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দলোনের চালানোর ঘোষনা দেন। এই লক্ষে বিরোধী দলগুলো তাদের দাবি আদায়ের জন্য ঘন ঘন হরতাল, ঘেরাও, বিক্ষোভ, রেলপথ-রাজপথ অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে এবং সরকার বিরোধী আন্দলোন তীব্রতর হয়। এরকম পরিস্থিতিতে সরকার উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর ছিল মনোনয়ন জমাদানের শেষে দিন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো উপনির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং পঞ্চম সংসদের চার মাস পনের দিন থাকতে ২৪ নভেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দেন। শত বাধা থাকা সত্বেও ১৫ নির্বাচন ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়[৭২৮]। নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন ১৪৫০ জন তন্মোধ্যে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন ৩০০ জন, নামসর্বস্ব প্রায় অচেনা ৪০টি দলের ৬৯৩ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ৪৫৭ জন। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ২৬.৫৪%, যার মধ্যে বিএনপি প্রায় ৭৭.৬৬% ভোট পায়।

সারণী ঃ ৪৪

১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	২৩০টি নির্বাচিত আসন ৪৯টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়
নাম সর্বস্ব অচেনা ৪০টি দল[৭২৯]	৬৯৩	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৪৫৭	১০

নিবার্চন কমিশন কর্তৃক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এটি গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এই নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। বিএনপি প্রার্থীগণ যেভাবেই হোক নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করেন। এই নির্বাচন সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিকদের কিছু মন্তব্য ছিল নিন্মরূপঃ

[৭২৮] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৫৮-১৫৯।
[৭২৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৩৮।

"নির্বাচনটি ছিল নির্বাচনের নামে প্রহসন। আমি আমার সাংবাদিক জীবনে বিশ্বের কোথাও এমন নির্বাচন দেখেনি। রাজনীতিকরা নির্বাচনের নামে এমনটা করতে পারেন কল্পনাও করা যায় না"[৭৩০]।

১৯৯৬ সালের ১৯ থেকে ২৬ মার্চ বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদের একমাত্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫-২৬ তারিখের রাতে অনুষ্ঠিত শেষ বৈঠক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিধান সংবলিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল তাড়াহুড়া করে পাস করা হয়, যা ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। প্রচন্ড গণ আনন্দলোনের মুখে ৩০ মার্চ বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে এবং রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেন[৭৩১]।

সপ্তম সংসদ নির্বাচন ঃ ১২ জুন ১৯৯৬

ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান মতে রাষ্ট্রপতি ৩১ মার্চ, ১৯৯৬ বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাববুির রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে ৩ এপ্রিল ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ৮১ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। সপ্তম সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পর মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মনোনীত ২৮ জন ও জাতীয় পার্টি কর্তৃক মনোনীত ২জন প্রার্থীর যৌথ প্যানেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়, এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৭৪.১৫%।

সারণী ঃ ৪৫

১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১১৬	৩৩.৬১
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	১৬.৩৯
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩০০	০৩	৮.৬১
ইসলামী ঐক্য জোট	১৬৫	০১	১.০৯
জাসদ (রব)	৬৭	০১	০.২৩
জাকের পার্টি	২৪১	-	০.৩৯

[৭৩০] সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।
[৭৩১] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা-১৫৮-১৫৯।

গণফোরাম	১০৪	-	০.১২
ফ্রিডম পার্টি	৫৪	-	০.০৯
বাংলাদেশ খিলাফত আন্দলোন	৪৬	-	০.০৪
বাংলাদেশর কম্যুনিস্ট পার্টি	৩৬	-	০.১১
বাংলাদেশ ওয়াকার্স পাটি	৩৪	-	০.১৩
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	৩১	-	০.০২
জাসদ (ইনু)	৩০	-	০.১২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২৩	-	০.০১
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৩	-	০.০৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির)	২১	-	০.০১
অন্যান্য দল	২২১	-	০.৪৮
নির্দলীয় প্রার্থী	২৮৫	০১	১.০৬
মোট	**২৫৭৪**	**৩০০**	**১০০**

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে দেশ বিদেশে স্বীকৃত হলেও বিএনপি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। বেগম খালেদা জিয়া বলেন যে, নির্বাচনে বিএনপির বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে বিএনপি বিরোধী দল হিসেবে সংসদে যোগদান করে আওয়ামী লীগের শাসন করার অধিকার কার্যত মেনে নেয়[৭৩২]।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১ অক্টোবর ২০০১

বিএনপি সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল মুক্ত চিত্তে মেনে নিতে পারেনি, তবে দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদে যোগদান করে। কিন্তু তারা সংসদকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু না করে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাবার কৌশল গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ নিজের সুবিধা মত মাঠ সাজিয়ে নীল নকশার নির্বাচন করতে চায়। এ ফাঁদে আমরা পা দিব না”[৭৩৩]। অপরদিকে আওয়ামী লীগ সরকার “পদত্যাগ নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর” এই অবস্থান গ্রহণ করে এবং মেয়াদের শেষ দিন ১৩ জুলাই পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন চালু রাখে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী অষ্টম সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৭৫.৫৯% যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সারণী ঃ ৪৬

২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নিবার্চনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)

[৭৩২] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬২।
[৭৩৩] সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৫২	১৯৩	৪০.৯৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩১	১৭	৪.২৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১১	০৪	১.১২
ইসলামী ঐক্য জোট	০৬	০২	০.৬৮
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	৬২	৪০.১৩
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জাতীয় পার্টি	২৮১	১৪	৭.২৫
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	০১	০.৪৭
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১৪০	০১	০.৪৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭৬	০০	০.২১
বাংলাদেশর কম্যুনিস্ট পার্টি	৬৪	০০	০.১০
বাংলাদেশ ওয়াকার্স পাটি	৩২	০০	০.০৭
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	৩৭	০০	০.০৪
গণফোরাম	১৭	০০	০.০২
গণতন্ত্রী পার্টি	১১	০০	০.০২
বাসদ (মাহবুব)	০৬	০০	০.০০
কম্যুনিস্ট কেন্দ্র	০১	০০	০.০০
সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী)	০৩	০০	০.০০
গণ-আজাদী লীগ (সামাদ)	৯৩	০০	০.০০
কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল	০১	০০	০.০০
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৮	০০	০.০৬
জামিয়াত-ই-উলামা-ই-ইসলাম	০১	০০	০.০৩
বাংলাদেশ খিলাফত আন্দলোন	৩০	০০	০.০২
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	০৩	০০	০.০১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০৩	০০	০.০১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	০২	০০	০.০০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	০৫	০০	০.০০
অন্যান্য দল	৮০	০০	০.০২
নির্দলীয় প্রার্থী	৪৮৬	০৬	৪.০৬
মোট	১৯৩৯	৩০০	১০০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কশিশন, ঢাকা।

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সংবিধান অনুসারে ২০০১ সালের ১৪ জুলাই সংসদের মেয়াদ শেষ হলে সপ্তম সংসদ ভেঙ্গে যায়। রাষ্ট্রপতি সে দিনই সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।[৭৩৪]। বিভিন্ন টানাপড়েনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৩৫ দিন পর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে এবং ১ অক্টোবর ভোট গ্রহণের তারিখ ধার্য হয়[৭৩৫]। চারদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি 'অবাধ, সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন

[৭৩৪] হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০, পৃষ্ঠা: ১৬৩।
[৭৩৫] প্রাগুক্ত ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান" করার জন্য রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনসহ সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অপরদিকে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, এবারের নির্বাচন সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি হয়েছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা হয়েছে। নির্বাচনে জনগণের অংশ গ্রহণ থাকলেও তাদের রায়ের প্রতিফলন ঘটেনি। এ রায় মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না[৭৩৬]।

দেশি-বিদেশি প্রায় সকল পর্যবেক্ষক গ্রুপ তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।"জাতি সংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়", " এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকসন্স", "জাপানি পর্যবেক্ষ গ্রুপ", প্রভৃতি পর্যবেক্ষ বিদেশি মিশন এবং ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট", "অধিকার", "আশা", "খান ফাউন্ডেশন", "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন" , প্রভৃতি দেশি পর্যবেক্ষ গ্রুপ নির্বাচন সুষ্ট হয়েছে বলে রায় দেন।

নবম সংসদ নির্বাচন ঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮

জাতীয় সংসদের ৫ বছরের মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালে ২৭ অক্টোবর সংসদ ভেঙ্গে গেলে সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রায় ২৬ মাস সময় নেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক সহনশীলতা, দূরদর্শিতা, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-জনিত বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক এলিটদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে এই অবাঞ্ছিত বিলম্ব ঘটে। নবম সংসদ নির্বাচনে মহাজোট ভূমিধস বিজয় লাভ করে। তারা পায় প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৫৬% ভোট ও ২৬২ টি আসন। অপরপক্ষে, বিএনপি পায় ৩৩% ভোটসহ ৩০টি আসন লাভ করে।

সারণী ঃ ৪৭

২০০৮ সালের নবম সংসদ নিবার্চনের ফলাফল (দলীয় অবস্থান)

দলের নাম		প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	মহাজোট	২৬০	২৩০	৪৮.২৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)		০৭	০৩	০.৭২
বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি		০৫	০২	০.৩৭

[৭৩৬] প্রথম আলো ১৩ অক্টোবর ২০০১।

জাতীয় পার্টি (এরশাদ)		৪৭	২৭	৬.৪৭
	মোট	**৩১৯**	**২৬২**	**৫৫.৮৫**
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	চারদলীয় জোট	২৫৭	৩০	৩২.৯৫
জামায়াত-ই-ইসলামী		৩৯	০২	৪.৪৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)		০২	০১	০.২৫
জামিয়াত-ই-উলামা-ই-ইসলাম		০৭	০০	০.২৫
ইসলামী ঐক্য জোট		০৪	০০	০.১৫
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি		০২	০০	০.১৫
	মোট	**৩১১**	**৩৩**	**৩৮.২৩**
বিকল্প ধারা বাংলাদেশ	যুক্ত ফ্রন্ট	৬২	০০	০.২১
গণফোরাম		৪৫	০০	০.১০
বাঙলাদেশ কল্যাণ পার্টি		৩৯	০০	০.০২
প্রগোতিশীল ডেমোক্রেটিক পার্টি		২১	০০	০.০২
	মোট	**১৬৭**	**০০**	**০.৩৫**
অন্যান্য ইসলামী দল	অন্যান্য দল	৩০১	০০	১.৩৭
অন্যান্য বামদল		১৬৪	০০	০.২০
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি		১৮	০১	০.২৮
অন্যান্য দল		১২৫	০০	০.২২
নির্দলীয় প্রার্থী		১৪৪	০৪	২.৯৪
“না”		-	-	০.৫৫
	সর্বমোট	**১৫৪৯**	**৩০০**	**১০০**

সূত্র ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

নবম সংসদ নির্বাচন দেশি-বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয়। প্রধান জাতীয় দৈনিক গুলো নির্বাচনী ফলাফলকে মহাজোটের মহা বিজয় বলে অখ্যায়িত করে। একটি নিরপেক্ষ ইংরেজি দৈনিকে তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে “ It Was an election where the people spoke decisively, it was voice of the people”[৭৩৭]। তারা বলেন ভোটার উপস্থিতি ছিল নজিরবিহীন; ভোটারগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে অবাধে ভোট দিয়েছে; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ভাল; সহিংসতা বা সংঘর্ষের তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি[৭৩৮]। শেখ হাসিনা মহাজোটের বিজয়কে জনগণের বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন এবং দেশের উন্নতির জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান। অপর পক্ষে বেগম খালেদা জিয়া এই নির্বাচনকে সাজানো নাটক ও কারচুপির নির্বাচন বলে প্রত্যাখান করেন। বিএনপি সকল নির্বাচনী

[৭৩৭]The Independent, ৩১ December, ২০০৮.
[৭৩৮] যুগান্তর ৫জানুয়ারী ২০০৮।

এলাকায় অসংখ্য অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করলেও তার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করতে পারেননি। তারা যুক্তি দেখায় যে, নির্ধারিত ৮ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৮৭ ভাগ ভোট প্রদান অসম্ভব ব্যাপার[৭৩৯]।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন আই ওয়ালিক ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেন, নির্বাচনী ব্যয়ে বাংলাদেশ শীর্ষে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০০০০ কোটি টাকা যা জিডিপির ৫%। বাংলাদেশে দুর্নীতির অন্যতম উৎস হলো নির্বাচন[৭৪০]। তৎকালীন মন্ত্রীপরিষদ সচিবও দাতাগোষ্ঠীর এক বৈঠকে স্বীকার করেন, বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ভোটকেন্দ্র দখল করার জন্য অনেকে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করেন। আর যিনি প্রচুর টাকা ব্যয় করে নির্বাচিত হন তিনি পরবর্তী সময় ঐ টাকা ওঠানোর চেষ্টা করেন।এত দুর্নীতি বেড়ে যায়[৭৪১]। যা গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়া কে করে জটিল।

শুধু ব্যবসায়ীরা বা ধনী ব্যক্তিরা নন, সাবেক অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অফিসার এবং অনেক সরকারি আমলা রাজনীতিতে আগমন করেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রাক্কালেও এটি প্রত্যক্ষ করা গেছে। একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বিগত সপ্তম সংসদের ৩১৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৫২ জন ব্যবসায়ী, ৪৭ জন আইনজীবী, ২২ জন কৃষি পেশা বা জমিজমার ওপর নির্ভরশীল, ১২ জন ছিলেন শিক্ষক এবং বাকি ৬০ জন সমাজকর্মী, যাদের কোনো সুনির্দিষ্ট পেশা ছিল না। ওই সংসদে ব্যবসায়ীদের অবস্থা কত শক্তিশালী ছিল, তা এ থেকে বোঝা যায়। এই ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যদের পালা ভারী ছিল। এদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ। এর পরের অবস্থান জাতীয় পার্টির শতকরা ৫০ ভাগ। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন ছিলেন ব্যবসায়ী।[৭৪২]অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্ধিতা করেছেন, তাদের পরিসংখ্যান দিলে দেখা যাবে প্রায় কাছাকাছি একই চিত্র ফুটে উঠবে। অতএব, এ ব্যাপারে যত দ্রুত একটি নীতিমালা গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল। তা না হলে রাজনীতি ব্যবসায়ী ও সুবিধাভোগীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

গত নয়টি নির্বাচনের পরিসংখ্যান যদি বিশেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত দুটি বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্ভর হয়ে পড়েছে। এ দুই বড় দলকে দিয়েই রাজনীতির গতিধারা আবর্তিত হচ্ছে। এর বাইরে তৃতীয় ধারার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। এক সময় জাতীয় পার্টিকে তৃতীয় ধারার প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু জাতীয় পার্টি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ায় জাতীয় রাজনীতিতে এর প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই কমে এসেছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জেনারেল

---

[৭৩৯] Daily Star, 1 January 2009.

[৭৪০] Daily Star, 7 January 2009.

[৭৪১] যুগান্তর ১৮ নভেম্বর ২০০৫।

[৭৪২] প্রাগুপ্ত।

এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি রংপুর কেন্দ্রিক একটি আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে। এই তিনটি ধারার বাইরে ইসলামপন্থী দলগুলোও প্রভাব অনেক কমে এসেছে। এছাড়া অন্যান্য যে অসংখ্য দল আছে তারা বর্তমানে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রায় হারাতে বসেছে। ব্যক্তি ইমেজ ছাড়া এসব দলের কোন প্রার্থীই বিজয়ী হতে পারেন না।

বিগত ৯টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিশেষণ করলে বাংলাদেশের রাজনীতির নিম্নলিখিত গতিধারার তথ্যগুলো পাওয়া যায়ঃ

- বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এই দুটি বড় দলের প্রভাব বাড়ছে।
- সরকার গঠনের মতে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা এই বড় দুই দলের মধ্যে ওঠানামা করছে।
- জাতীয় পার্টির তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উত্থানের যে সম্ভাবনা ছিল, এখন দলটি ক্রমেই সে সম্ভাবনা হারিয়ে একটি আঞ্চলিক দলে রূপান্তরিত হচ্ছে।
- সরকার গঠনে ছোট দলগুলোর ভূমিকা বাড়লেও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় তা কিছুটা স্মম্ভিত হয়ে যায়।
- চারদলীয় জোটের নির্বাচনী সফলতা জোট গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি করবে।
- বাম সংগঠনগুলোর নির্বাচনী গণভিত্তি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।
- নির্দলীয় প্রার্থীরা বিগত দিনে বেশ কিছু আসনে বিজয়ী হতেন। বর্তমানে এই প্রবণতাও কমছে।
- ব্যক্তি ইমেজে বেশ কিছু প্রার্থী নির্বাচিত হতেন। এই ধারা অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও টিকে আছে।
- রাজনীতিতে ব্যবসায়ী তথা আমলাদের প্রাধান্য বাড়ছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রায় রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের রাজনীতির কৌশল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা চুড়ান্ত সিদ্ধন্তে উপনীত হতে পারি যে, দ্বিলীয় শাসনব্যবস্থার একটি ভিত্তি বংলাদেশে গড়ে উঠেছে। বিগত সংসদ নির্বাচনগুলোকে সমান রেখে আমরা যে মূল্যায়ন করেছি তাতে দেখা

যায় বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে ৪ থেকে ৫ দলীয় একটি শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই ৪টি অথবা ৫টি দল আগামী নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করবে।এই দল গুলোর গণভিত্তি হবে অনকেটা এরকম:

১. জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে
২. ধর্মের ভিত্তিতে
৩. এক ধরণের প্রেটোনাইজেশনের ভিত্তিতে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকবে দুটো বড় দলের মাঝে

১. আওয়ামী লীগ এবং
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

সর্বশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে নিবার্চনী যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মাধ্যমে গণমানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি এবং তা ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক শাসন তথা পরিবেশের জন্য অনুকূল নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১ গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকার ও রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান যেমন হওয়া উচিত !!!

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কটা মূলত পারস্পরিক সম্পর্ক । সিডনি ভার্বা যুক্তি দেখান যে, রাজনৈতিক বিশ্বাস একদিকে যেমন রাজনৈতিক কাঠামোর কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত কওে এবং এর দ্বারা প্রভাবিতও হয়। অতএব বলা যায় একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানগুলোর বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়ায় সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে একটা সাযুজ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের শক্ত ভিত রচনা করতে হলে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি পর্যায়েই গণতান্ত্রিক আচার-আচারণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন আবশ্যক।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্ঠিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের ভিতর ঐক্যমত্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বপক্ষের শক্তিকে জোরাল করে। অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কাঠামোগত চরিত্র নিয়ে জনগণের ভেতর মতানৈক্য সরকারের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সরকারি ব্যবস্থায় স্থিতিশিলতার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও রাজনৈতিকদের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য।

পাশ্চাত্যের প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতার ওপর জনগণের ব্যাপক আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা সম্প্রদায়িক স্বার্থে নয় বরং জাতীয় স্বার্থে কাজ করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয়। সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে নেতৃবৃন্দের প্রতি বিরাজমান শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক মনোভাবেরই ইঙ্গিত বহন করে। সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না।

সামাজিক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা বিকাশের প্রাথমিক স্তর হলো পরিবার। জীবনের সূচনা লগ্নে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণ পরিণত বয়সে তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও মিথষ্ক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। ফলে সক্রিয় রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধিপায় এবং জাতীয় রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণের পথ সুগম হয়।

ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও আন্তঃব্যক্তিক মিথষ্ক্রিয়াও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের মতো পশ্চাৎপদ সমাজে পোষক-অনুগতের সম্পর্ক বিদ্যমান। সামজিক সম্পর্কের এ অবস্থা আবার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। পোষাক-অনুগতের এ সম্পর্ক রাজনৈতিক দলে পরিব্যপ্ত হলে রাজনৈতিক দল কাঠামোগত ভাবে শিথিল হয়ে পড়ে। এ ধরনের শৈথিল্য থেকে সৃষ্টি হয়

উপদলীয় কোন্দল। কোন্দল থেকে সহিংসতার সুত্রপাত ঘটে। পোষণের রাজনীতিবিদদের সমর্থনে গড়ে ওঠে মাস্তানী বাহিনী। ক্ষমতার বলয়ে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সংকীর্ণ ভিত্তিতে নিজেকে সংগঠিত করতে গিয়ে পোষকেরা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের এ ধরণের প্রবণতা গণতন্ত্র চর্চার পথ রূদ্ধ করে দেয়।

গণতাতিন্ত্রক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় গৌরববোধ। জাতীয় গৌরববোধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন প্রধান উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয় তখনই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিবীদদের প্রতি মানুষের আস্থা গড়ে ওঠে। রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকার ব্যবস্থার মধ্যে যত বেশী সুষম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তত উন্নত হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষ দায়িত্বশীল প্রতিনিধি বেছে নিতে পারবে। বেশী লোককে বেশী বার বোকা বানানো যায় না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই মানুষকে সংস্কৃতিবান করে তোলে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অস্তিত্বের চিন্তা মানুষের সংস্কৃতি গঠনে প্রভাব ফেলে। যেমন ফেলে ভাষা, ধর্ম, জাতিসত্তা এবং অর্থ -বিত্ত।

রাজনৈতি সংস্কৃতির অপর গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা,আস্থা ও বিশ্বাস। মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের কথাই জোরদিয়ে বলা হয়েছে। যখনই এলিটদের পারস্পরিক বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয়। তখনই রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে স্থবিরতা, অস্থিরচিত্ততা, পারস্পরিক কলহ, খুন-জখম। পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে একদল অপর দলের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের প্রভাবকে হুমকি হিসেবে মনে করে। একে-অপরের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। সার্বক্ষণিক বিরোধীতায় লিপ্ত থাকে।

বিরোধীতা ভাল। কিন্তু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করা নয়। বিরোধীতা হবে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর এবং গঠনমুলক যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা- ব্যক্তিকেন্ত্রীক নয়। নীতির প্রশ্নে আপোস নেই। সর্বজনীন কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সমঝোতা ও সহযোগিতা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচায়ক।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি স্বীকৃত। তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ কাঙ্খিত। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের সকল মতামতই গ্রহণযোগ্য নয় এমনটি কিন্তু যৌক্তিক নয়। শান্তি পূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা বহাল রাখার জন্য

সরকারি দল বিরোধী দলের মধ্যে আলাপ আলোচনা, মত বিনিময় রাজনীতির স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক,যা উন্নত রাজনৈতক সংস্কৃতির পরিচায়ক।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত প্রবাসী সরকারেও গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যবস্থার কথা ছিল এবং দেশ স্বাধীন হলে প্রথম গঠিত সরকারও ছিল সংসদীয় সরকার । তারপর ৭৫ সালে বাকশাল গঠন, দীর্ঘদিনের সামরিক শাসন প্রভৃতি কারণে গণতন্ত্র বিকশিত না হয়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসন জেতে বসে। তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন করে গণতন্ত্র এর উত্তরণ ঘটে। ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এ গণতন্ত্রের ভিত আর একটু মজবুত হয়। তারপরও বাংলাদেশের গনতন্ত্র সুসংগঠিত রূপ পেয়েছে এমন বলা যায় না। কারণ এখন গণতন্ত্রের মূলধারার সাথে সাথে জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে। কারণ-

- সরকারি ও বিরোধী দলের সহনশীলতা ও সহাবস্থান গণতন্ত্রের একটি উলেখযোগ্য শর্ত। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে যেন বিরোধ ও অসহনশীলতা মূল বিষয়।
- সর্বক্ষেত্রে জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন যদিও গণতন্ত্রের মূল বিষয় কিন্তু বাংলাদেশে এটির চর্চা এখন পুরোপুরি চালু হয়নি।
- দায়িত্বশীল ও সচেতন বিরোধী দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সে রকম বিরোধী দল গড়ে ওঠেনি।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তথ্য প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অবাধ তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়।
- জনগণকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে কখনোই গণতন্ত্র সুসংগঠিত রূপ লাভ করতে পারে না। অথচ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অর্ধেকেরও বেশী লোককে শিক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হয় না।

রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সৌজন্যের মাত্রাও রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনীতিকদের মধ্যে সৌজন্যবোধ বিদ্যমান থাকলে অনৈক্য ও মানসিকতা,আত্ম-স্বার্থ ও হীনমন্যতা পরিহার করে নিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির যথার্থ চর্চা করতে হবে।

৯.২ গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দল সমূহের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক দলসমূহের সমোয়িচিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরর্ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

রাজনৈতিক দল বলতে ক্ষমতাসীন সরকার এবং বিরোধী সব দলের কথাই বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের জন্য পালনীয় কর্তব্য নিচে আলোকপাত করা হল:

- ✓ সরকারি দলের সহনশীলতা।
- ✓ বিরোধী দলের দায়িত্বশীল সম্পর্কে ।
- ✓ উভয়ের সার্বিক পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(ক) সরকারি দলের সহনশীলতা ঃ

বাংলাদেশের মত দেশের নবিন গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের নিম্নোক্ত সহনশীল বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে:

নমনীয়তা ঃ সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে, শুধু তাদের নিয়ে নয়, বরং তাদের ও বিরোধী দল উভয়কে নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার এবং এটিই গণতন্ত্রের শিক্ষা। সুতরাং সরকারি দলকে গণতন্ত্র মানতে হবে, হতে হবে অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু এবং তাদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে।

দমননীতি পরিহার করা ঃ বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় নির্বাচনোত্তর সরকারি দল বিরোধী দলের ওপর অন্যায়ভাবে অহেতুক দমননীতি প্রয়োগ করে থাকে, যা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে যেমন সরকারি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় তেমনি গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যহত হয়।

একচেটিয়াত্ব বর্জন করা ঃ বাংলাদেশে প্রায়শ নির্বাচনোত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল রাষ্ট্রের সর্বত্র একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। এতে করে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারি দল গণতন্ত্র থেকে বহু দুরে সরে যায়। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমসমূহকে তারা নিজস্ব দলীয় সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। বিগত সরকারের ভালো-মন্দ সকল কাজকর্মকে মুছে দিয়ে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ প্রচারে ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্রীয় সকল প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ‘বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার’ বাক্যটি উচ্চারিত হয়। এর দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চায় যেন অতীতের কোন সরাকারই গণতান্ত্রিক ছিল না। এর দ্বারা তাদের নিম্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতির (low political culture) পরিচয় পাওয়া যায় এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়।

(খ) বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা ঃ

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিরোধী দলসমূহকে নিম্নোক্ত দায়িত্বশীল বিষয়সমূহের ওপর গুরত্ব দিতে হবে:

গঠনমূলক সমালোচনা ঃ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিশেষত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার বলা যায়। এ দলের প্রধান কাজ সারকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশিল রাখা। বিরোধী দল সরকারি দলের গঠনমূলক সমালোচনা না করলে এবং সরকারি দলের ভুল ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে না ধরলে সরকারি দল নিজস্ব দলীয় স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় জনগণের সর্বজনীন কল্যাণ ব্যহত হয় এবং গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয় না।

বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয় ঃ বিরোধী দল বলেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। ফলে সরকারি দল বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়ন করতেও উৎসাহিত হতে হবে এবং এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

(গ) উভয়ের সার্বিক পালনীয় দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের সহনশিলতা এবং বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:-

আপোষকামী মনোভাব ঃ গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলকে আপোষকামী মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উভয় দল বা দলগুলোকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। অনমনীয় মনোভাব নিয়ে আলোচনা করলে কোন লাভ হবে না। তাই উভয় দলকে আপোষকামী মনোভাব নিয়েই আলোচনায় বসতে হবে। এতে সমস্যার যেমন সমাধান হবে, তেমনি গণতন্ত্রের বিকাশও তরান্বিত হবে।

পরমতসহিষ্ণুতা ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতি মাত্রায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক হওয়ায় এখানে পরমতসহিষ্ণুতাও যুক্তিসংঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার সফলতার এবং বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কেবল তখনই কাজ করতে পারে, যখন রাজনৈতিক নেতারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং যুক্তিসঙ্গত সমযোতায় রাজি থাকেন। তাই বাংলাদেশের সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহকে আরো অধিকমাত্রায় পারস্পরিক মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করা ঃ সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দলসমূহকে পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে গঠনমূলক সমালোচনার আশ্রয় নিতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তি জীবন নিয়ে গবেষনা না করে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সমালোচনা করতে হবে। এতে করে প্রতিটি দল তার নিজেদের কার্যক্রমের ও দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হবে এবং সুচিন্তিত জনহিতকর পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত হবে, যা গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজন।

সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা ঃ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বসেই সরকারি এবং বিরোধী দলের সকল বিরোধ-বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে জাতীয় সংসদ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের কোনো যৌক্তিক দাবি আগ্রহ করলে চলবে না। বরং বিরোধী দলকে সম্পৃক্ত করতে হবে সকল জাতীয় কর্মকান্ডে। সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে হবে। এক কথায় একটি সুস্থ সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

ঐকমত্য অর্জন করতে হবে ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধীতা সহ্য করার মতো ধৈর্য ও পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারি দল বিরোধী দলকে পাশ কাটিয়ে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহন করছে এবং কোনো কোনো সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। আর বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করা যে কোন বিরোধী দলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। তাই ক্ষমতাসীন দলকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বিরোধী দলকে সাথে নিয়ে জাতীয় স্বার্থ সংশিষ্ট ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আরো সহনশীল হতে হবে। তদ্রুপ সংসদকে প্রাণবন্ত করতে এবং জাতীয় ইস্যুতে বিরোধী দলকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ও সফলতার জন্য আদর্শিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মডেল হবে নিন্ম রূপ:

সারণী ঃ ৪৮

আদর্শিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মডেল

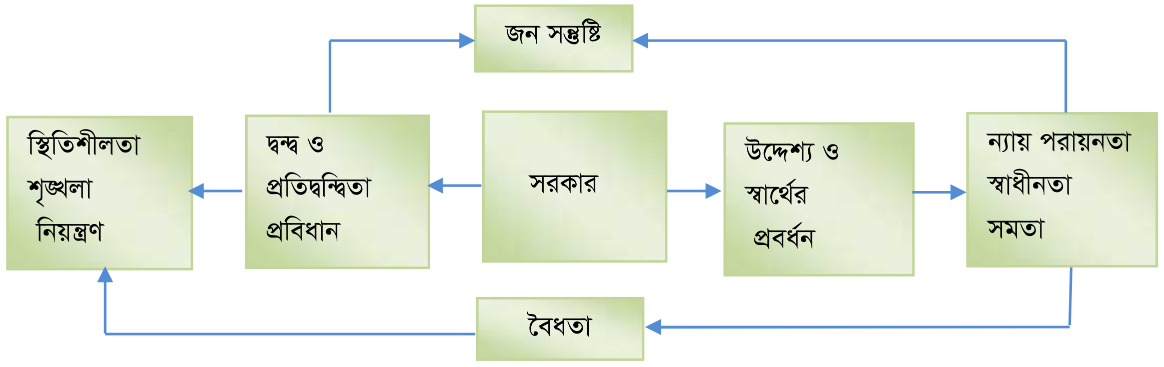

Dhaka University Institutional Repository

Source: D. E. Apter, Introduction to Political Analysis: India Prentice Hall, 1981, Page: 170.

সুতরাং বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলেরই সমগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই উভয় দলকে দলের অভ্যান্তরে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে। উভয় দলকে রাজনৈতিক সহিংসতা বর্জন করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। সর্বোপরি উভয় দলকে

দশম অধ্যায়
উপসংহার

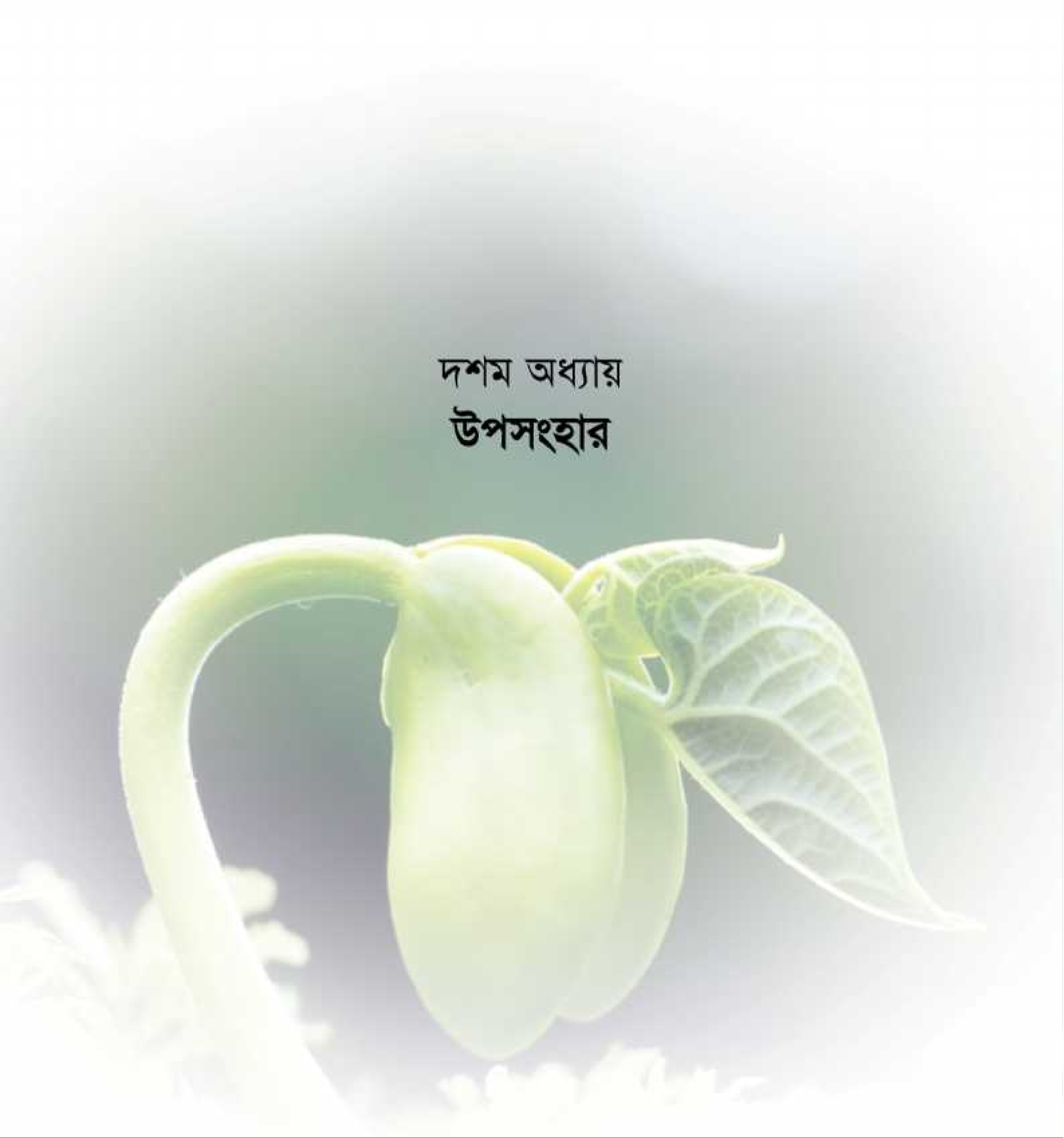

১০.১ উপসংহার

গণতন্ত্র তথা সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙক্ষা ও আন্দোলন দীর্ঘ দিনের। বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চার আচরণগত বা সাংস্কৃতিক দিক বিশেষণ করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায়।

- রাজনৈতিক আচারণ
- রাজনৈতিক অনুশীলন
- রাজনৈতিক প্রথা বা পদ্ধতি

যা যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আর তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এ বিষয় গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণতন্ত্র মানে শুধু রাজনেতিক জোরাল ভাষণ নয়। সত্যিকার গণতন্ত্র হচ্ছে অর্জন ও অনুশীলনের বিষয়। অথচ বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বক্তৃতা- বিবৃতি শুনে মনে হয় গণতন্ত্র ইতোমধ্যে ষোল আনাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিংবা গণতন্ত্র আতুর ঘরে মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ আমাদের নেতা-নেত্রীরা যখন বলেন তখন চরমের প্রান্তসীমায় অবস্থান করেন। অবশ্য তাদের ধারণা অনুযায়ী এটাও এক ধরণের Political Policyকিন্তু এ ধরণের রাজনৈতিক কলাকৌশলের মারপ্যাচে আমাদের কাক্ষিত গণতন্ত্র সত্যিই বিপদাপন্ন, যার ফলে রাজনীতির মান নেমে গিয়ে পৌঁছেছে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। দু'শ বছরেরও বেশী সময় ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসক ও শোষনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের বহুদিনের কাঙ্খিত শাসন ব্যবস্থা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রের আকাঙ্খায় এদেশের মানুষ গণআন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছে বারবার। এ গণআন্দোলন পরিচালিত হয়েছে কখনও কখনও দেশীয় স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আবার কখনও কখনও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। তাই বলা যায় বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, অনেক পুরাতন উনিশ শতকের শেষ ভাগ হতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এক অর্থে ছিল বাঙালীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এ সকল আন্দোলনের ফল স্বরূপ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় এ দেশের জনগণ ও নেতৃবর্গ কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার ধারণা লাভ করে উপনিবেশিক কায়দায়। এর পর ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখানো হলেও তৎকালীন পাকিস্তানী নেতৃত্ব স্বাধীন পাকিস্তানের গণতন্ত্র কায়েম সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পূর্ব বাংলার জনগণকে গণতন্ত্রের প্রতি অনেক বেশী আশান্বিত করে তুলে ছিল। পাশাপাশি লাহোর প্রস্তাবের ফলেই পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার শক্ত ভীত রচিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের যে সব আন্দোলন দানা বাধে তার প্রত্যেকটি

আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল এদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানি রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৪ সালের ২১ দফা ইশতেহার, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচী ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে। কেননা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ৭টি দফাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ক্ষমতা ও সংসদীয় গণতন্ত্র বাস্তবায়ন সম্পর্কিত। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবির প্রথম দফাই ছিল এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের রুপরেখা সম্পর্কে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রচলন, জনগণের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জবাবদিহিতা মূলক একটি মন্ত্রীপরিষদ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও এ ধরনের দাবির সংশিষ্টতা রয়েছে। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদীয় গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারের প্রতিফলনও ঘটেছে। এই নির্বাচনের শুধু আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ই হয়নি, এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এরপর ১৯৭১ সালের রক্ষক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম নেতৃত্ব প্রদান করে আওয়ামী লীগ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়।

অতঃপর আওয়ামী লীগ এদেশে প্রথম বারের মত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এদেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের কাঙ্খিত সংসদীয় গণতন্ত্র কতৃত্ববাদীদের রোষানলে পড়ে। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধণীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের স্থলে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্যু, হত্যা ও সামরিক ও আধা সামরিক শাসন জনগণকে পুনরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। মূলতঃ সমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুপস্থিতি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রথম স্তর বিপর্যস্ত হয়। ১৯৯১ সালের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার হস্তাতান্তর সাধিত হলে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রায় ২৪ বছর অতিক্রম করেছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন, স্বতন্ত্র জাতীয় সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় কমিটি সমূহের গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিককরণ ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাঠামো বিনিময়ে বিভিন্ন আমলে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সমূহ জাতীয় সংসদকে কতটুকু কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয়।

পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের সংসদীয় বিশেষণ করলে দেখা যায়, বিগত পঞ্চম সপ্তম ও অষ্টম সংসদের তিনটি মেয়াদে সরকার ও বিরোধীদলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ কার্যকর হতে পারেনি। আবার বিরোধীদলীয় সদস্যগণ উপস্থিত কার্যদিবসে জাতীয় সংসদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে একক কিংবা সম্মিলিত ওয়াক আউট করেছেন। বর্তমান নবম সংসদেও এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচটি অধিবেশনের ছিল ২০১০ পর্যন্ত। এর মধ্যে বিরোধীদল দুইটি অধিবেশন সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করেছে। বাকি গুলিতে কয়েকবার ওয়াক আউটও করেছে। ওয়ার্ক আউট যদিও সংসদীয় রীতির পরিপন্থী নয় তথাপি মাত্রারিক্তি ওয়াক আউট সংসদীয় সংস্কৃতির জন্য কখনও ইতিবাচক হতে পারে না। কেননা বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদ অধিবেশন সমূহে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ না করা ও দলগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ না থাকা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক করণের অন্যতম প্রতিবন্ধক ।

বর্তমানে হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস সহ নানা প্রকার সহিংস ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ও অনিবার্য ব্যপার হয়ে দাড়িয়েছে। এদেশের ক্ষমতাসীন দল অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্ন দল। জনগণকে তাদের মনে থাকে না জনস্বার্থ তাদের কাছে তখন গৌণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ বাস্তবায়নে তারা অধিক তৎপর হয়ে উঠে। জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন খাদ্য সামগ্রী ঔষধপত্র সরবাাহ এমনকি জরুরী রোগীদের চিকিৎসা পর্যন্ত করানো সম্ভব হয়ে উঠে না। হরতালের কারণে প্রত্যক্ষ ভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায় খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর কোন পরিবর্তন নেই, নেই কোন উন্নতি। রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে যখন তখন হরতাল, ধর্মঘট, আহবানের ফলে বিদেশীরাও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করছে। আর এ অবস্থায় কোন দেশেই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে না। বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্য একটানা ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। অথচ বিগত তিনটি সংসদ মেয়াদের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার জন্য কোন কোন সংসদ সদস্য বছর দেড়েক পর নব্বই কার্যদিবসের পূর্বে সংসদ অধিবেশনে অল্প সময়ের জন্য যোগাদান করে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে গিয়েছেন। সপ্তম সংসদে সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মাত্র ৩ কার্যদিবস এবং অষ্টম সংসদে আলতাফ হোসেন গোলান্দাজ মাত্র ১৭ কার্যদিবস সংসদে উপস্থিত থেকে সদস্যপদ বহাল রাখেন। আবার বিভিন্ন ইস্যুতে ওয়াক আউট পূর্বক সংসদ বর্জন সংস্কৃতি চর্চায় বড় দু'দল একে অপরকে অনুসনরণ করেছে। একজন সদস্যের এরকম সক্রিয়তাকে উপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা এ বিষয়টি সংবিধান ও কার্যপ্রণালীতে সুস্পষ্ট ভাবে উলেখ না থাকার কারণে হাজিরা থাকায় স্বাক্ষর না করেও সদস্যগণ বেতন তুলে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এজন্য জাতীয় সংসদে নৈতিক মুল্যবোধ, গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা চেতনা, দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছলতা গুণ সম্পন্ন রাজনীতিবিদদের আশানুরূপ অংশগ্রহণের অভাবই দায়ী। জাতীয় সংসদের উক্ত চারটি নির্বাচনের ফলাফল বিশেষণে দেখা যায় প্রত্যেকটি নির্বাচনেই ব্যবসায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে অন্যান্য পেশাধারীদের হারের তুলনায়। জাতীয় সংসদে বিভিন্ন পেশা বা শ্রেণীর অসম ভারসাম্য থাকার কারণে জাতীয় সংসদ কখনই প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেনি । উন্নত গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে পার্লামেন্টে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশার মধ্যে সমতা খুজে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার ৩৬ তম ফেডারেল পার্লামেন্টের কথা বলা যায়। কেননা এই পার্লামেন্টে ব্যবসায়ী ১৯.৪৫% আইনজীবি ১৭.২৫% আমলা ৬.৬৩% বিশেষজ্ঞ ২১.২৩% স্থানীয় সকরার কর্মকর্তা ২০.৩৫% এবং বাকীরা অন্যান্য পেশার ছিলেন। অর্থাৎ পার্লামেন্টের কোন শ্রেণীর সংখ্যা একক গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে বিগত তিনটি ও বর্তমানের নবম পার্লামেন্টের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্য হলেন ব্যবসায়ী। এছাড়া অবসর প্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের রাজনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত অংশগ্রহণের ফলশ্রুতিতে রাজনীতিতে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণের হার দিন দিন হ্রাস পেয়েছে। ফলে এ সকল ব্যবসায়ী ও আমলা শ্রেণীর সদস্যদের দ্বারা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। **গবেষণার চতুর্থঅধ্যায়, গণতন্ত্র ঃ একটি তাত্ত্বিক আলোচনা; পঞ্চম অধ্যায়, রাজনৈতিক দল ও বিরোধীদলীয় গতি-প্রকৃতি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়, সরকার ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সরকার ও বিরোধী দলের অসহিষ্ণু মনোভাবের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশের পথে অন্তরায় সমূহ স্পষ্ট করে গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য গণতন্ত্র বিকাশের পথে অন্তরায় গুলো স্পষ্ট করেছে এবং গবেষণার প্রথম অনুমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার ও বিরোধী দলের গণতন্ত্র চর্চা যে নিন্মমানের তা প্রতিয়মান হয়েছে। ফলশ্রুতিতে যাবতীয় নেতিবাচক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার ও বিরোধী দলীয় কর্মসূচী ও আচারণ গণতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী কাঠামোয় রূপ দিতে বাধাগ্রস্থ করছে প্রমাণিত হয়।**

গবেষণার অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি ও প্রবণতার বিভিন্ন দিক বিশদ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে নেতিবাচক চিত্র প্রতিফলিত হয় তাতে করে গবেষণার দ্বিতীয় অনুমান বাংলাদেশের সরকার ও বিরোধী দলের কর্মসূচীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক উপাদান যে দুর্বল তা স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয় এবং গবেষণার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতরূপ নিরূপিত হয়েছে।

গবেষণার অষ্টম অধ্যায়ের সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক দোষারোপের রাজনীতি, দলবাজি ও আমলাতন্ত্র, নির্বাচনে মনোনয়ন বেচা-কেনা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছবির রাজনীতি, বাংলাদেশের ব্যক্তি

প্রধাণ্যের রাজনীতি, নামকরণ ও নাম কর্তনের রাজনীতি, ববসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব ইত্যাদি শিরোনামে তথ্য ভিত্তিক আলোচানায় গবেষণার তৃতীয় অনুমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চেয়ে দল বা ব্যক্তির প্রাধান্য বেশী তা প্রমাণিত হয়েছে । সাথে সাথে গবেষণার তৃতীয় উদ্দেশ্য ১৯৭১-২০১০ এই দীর্ঘ সময়ে সরকার ও বিরোধী দল গণতন্ত্রে স্বার্থের চেয়ে স্বার্থ গোষ্ঠীর স্বার্থকে যে প্রাধাণ্য দিয়েছে আর এই প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

গবেষণার নবম অধ্যায়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দল সমূহের ভুমিকা ও দায়িত্ব সমূহের ক্ষেত্রে উভয়ের সুচিন্তিত ও সময়োচিত পদক্ষেপ কি কি হতে পারে তার একটি দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরাধী দলের কার্যকর ভূমিকা অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণার সবশেষ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

এছাড়া চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনৈতিক দল ও দল ব্যবস্থাপনা ও সরকারের তাত্ত্বিক দিক সহ বিভিন্ন সময়ে কিভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক পথচলা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্থান-পতন তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে উলেখিত বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যা গবেষণায় গৃহীত অনুকল্প সমূহ প্রমাণে সহায়ক হয়েছে। মূলত সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল গুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহনশীলতার মনোভাব সংসদনেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে ১৯৯১ সালে এক সাপ্তাহিকীতে বলা হয় দুজন দুজনকে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা বৈরী মনে করেন। সংসদ অধিবেশনে এক নেত্রী থাকলে আর এক নেত্রী থাকে না। এক নেত্রী বক্তব্য দিলে আর এক নেত্রী মুখ ঘুরিয়ে রাখেন। সংসদে দুজন সামনাসামনি বসেন , কিন্তু কোনদিন চোখে চোখে হতে দেখা যায় না। দুজন তাকিয়ে থাকেন দুদিকে (দৈনিক খবরের কাগজ, ১৮ জুলাই ১৯৯১)। তখন থেকে বর্তমানে ২০১০ উনিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে, দুনেত্রীর আসন পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। দু নেত্রীর সংসদে উপস্থিতির ক্ষেত্রে একে অপরকে অনুসরণ করেছেন। দু'জনই বিরোধীনেত্রী হিসেবে কখনও সংসদে উপস্থিত থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেননি। বিরোধীদলীয় নেতা যখন সংসদে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক মত শোনেন না। অপরদিকে সংসদ নেতার ভাষণ শুরু হওয়ার আগেই বিরোধীদলীয় নেতা সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। অর্থাৎ দুই নেতা বিগত ২৫ বছরের সংসদে উপস্থিত থেকে একে অপরের বক্তব্য শ্রবণ ও জবাবদিহিতার সংসদীয় সংস্কৃতি অর্জন করতে পারেননি। গণতন্ত্রের স্বার্থে দু'দলের নেত্রীর মধ্যকার এ অনাস্থা ও অবিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙ্গা প্রয়োজন । তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদ কার্যক্রমে সংসদীয় আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সংসদের প্রথম বৈঠক হতে সংসদ বর্জন, কারণে অকারণে দফায় দফায় ওয়াক আউট, সংসদে হৈচৈ, ফাইল ফাটানো, অন্যকে

কথা বলতে বাধা দেওয়া, ফ্লোর না পেয়ে অন্যের মাইক ব্যবহার করা, স্পীকারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেওয়া, কালো পতাকা প্রদর্শন, রোস্টাম তছনছ করা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, স্পীকারের অপিস ঘেরাও সমালোচনার ক্ষেত্রে একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, ইত্যাদি বিষয় সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। এছাড়া সদস্যগণ পয়েন্ট অব অর্ডার দাড়িয়ে কার্যপ্রণালী বিধির বর্ণনা, আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ, অধিকার ক্ষুন্ন বা কথা বলার সুযোগ না পাওয়া এক্সপাঞ্জ ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে অনির্ধারিত বিতর্কে লিপ্ত হন। অনির্ধারিত বিষয়ে কথা বলতে নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করেন, আবার কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান যা কার্য প্রণালী বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ্যনয়। এ সবই পরিহার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

এগার অধ্যায়

গবেষণা সহায়ক সমূহ

১১.১ সহায়কগ্রন্থ

১. ওয়ালিউলাহ, মোহাম্মদ	আমাদের মুক্তি সংগ্রাম(১৫৯৯-১৯৪৭), পৃষ্ঠা: ১৭, প্রকাশ-১ডিসেম্বর ১৯৬৯ প্রকাশক, নাসাস, ঢাকা।
২. রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ড: এবিএম ;	বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, চতুর্থদশ সংস্করণ ২০১০, ঢাকা।
৩. শরীফ, আহমেদ	বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য(ঢাকা ঃ বর্ণমিছিল,১৯৭৮ ইং) ১ম খন্ড,পৃ.১।
৪. আহমেদ,তোফায়েল	যুগে যুগে বাংলাদেশ (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান,১৯৭৭ইং) পৃঃ১৪।
৫. উদ্দিন, ড. আ. ই. ম. নেছার	ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ:২৫।
৬. হক, ড. আবুল ফজল,	বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, প্রকাশ- সপ্তম মুদ্রণ- জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৮০।
	বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশ কাল-ফেব্রুয়ারী ২০১৪।
৭. আব্দুল মান্নান তালিব,	বাংলাদেশে ইসলাম, (ইফাবা , ১৯৮০ খৃ.) পৃ. ১৫।
৮. চৌধুরী,মোয়াজ্জেম হোসাইন	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল, (ঢাকা-১৯৯৮ খৃ.) পৃ. ২২-৩১।
৯. মোঃ জাকারিয়া,	বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (ঢাকা, ১৯৭২ খৃ) পৃ.-১৮ ও মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন (ঢাকা,১৯৭২ খৃ.) পৃ. ২৮।
১০. দেওয়ান, মোঃ ইফনুস আলী,	পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশ; চতুর্থদশ সংস্করণ ১৫ জুলাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৯৪।
১১. ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ,	বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা,

প্রকাশকাল; প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৯৫।

তুলনামূলক রাজনীতি ও সমকালীন পদ্ধতি, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮২, ঢাকা, ।

সরকারের সমস্যাবলী, গোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড; প্রকাশ , প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১২৮, ঢাকা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৯২, ঢাকা, ।

১২. রশীদ, ড. হারুন-অর, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭ - ২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি২০০১।

১৩. উমর , বদরুদ্দীন, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৪।

১৪. চৌধুরী, সরদার আলী, কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি অব পাকিস্তান (১৯০৯- ১৯৭২) দ্বিতীয় খন্ড, এডুকেশনাল বুক কোম্পানি, পৃষ্ঠা- ৩৭

১৫. শফিক, মাহমুদ, বাংলাদেশের সংবিধান ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, বর্ণবীনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ; মে ১৯৯৩।

জনগণ সংবিধান নির্বাচন, অনন্যা, প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর-১৯৯৬।

গণতন্ত্রের জামা বহু বর্ণে চিত্রিত, বর্ণবীনা, প্রকাশকাল মে-২০০৭, ঢাকা।

১৬. আহমেদ, আবুলমনসুর , আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোজরোজ কিতাব মহল, দশম সংস্করণ, জুলাই-২০০২, ঢাকা।

১৭. আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রজো, ২১ দফা থেকে ৫ দফা , পৃষ্ঠা- ১৩৬-৩৯, ঢাকা।

১৮. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৬, ঢাকা।

১৯. আহাদ, অলি রাজনীতি ১৯৭৪ থেকে ৭৫, খোজরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ২০০২।

২০.মহাপাত্র,ড. অনাদিকুমার রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশকাল; প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা;৫২০।

২১.ড. আহমদ, এমাজউদ্দীন গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মৌলি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি২০১০; পৃষ্ঠা : ১৬-১৭।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংকট, শিকড়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯১।

বাংলাদেশ : সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতি প্রকৃতি, হাসি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ -সেপ্টেম্বর ২০০০।

বাংলদেশের সমাজ ও রাজনীতি, দীপ্তিত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী-২০০২।

সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, ১৯৯৩ইং, ঢাকা।

বাংলাদেশের রাজনীতি সমস্যা ও সম্ভবনা, শিকড়,প্রথম প্রকাশ , একুশ বইমেলা ২০১৪, ঢাকা।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি, জ্ঞান বিতরণী, ২০০১, ঢাকা।

তুলনামুলক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক বিশেষণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৭৮, ঢাকা।

২২.হসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭। দি ইউনিভার্সিটি পেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭০।

২৩.হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশ কাল-ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

বালাদেশের রাজনীতি: সংস্কৃতির স্বরূপ, অনন্যা, ২০০৮, ঢাকা ।

২৪.হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম খন্ড, ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

২৫.হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা. ২৫২-২৫৩।

বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল; ফেব্রুয়ারি, পৃষ্ঠা;২০৬

২৬.নাথ, বিপুল রঞ্জন, সরকারের সমস্যাবলী, বুক সোসাইটি, প্রকাশকাল- পঞ্চম সংস্করণ-জুন ২০০২, ঢাকা।

২৭.মুরশিদ, গোলাম হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ২০১০, পৃষ্ঠা-১৩, ঢাকা।

২৮.হাবিব, আহসান রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, গ্রন্থকুটির, ২০০৮, ঢাকা।

২৯.হালদার, গোপাল, সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা, ।

৩০.মূসা, আহমেদ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ(সম্পাদিত), কেন বাংলাদেশী কেন ‘বাঙালী নই, শেখ নূরুল ইসলামএর প্রবন্ধ, দিব্য প্রকাশ, প্রথম সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ : বাংলাদেশী না বাঙ্গালী , রুহুল আমিন এর প্রবন্ধ, দিব্য প্রকাশ, প্রথম সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪,

৩১.আরা, প্রফেসর ড. শওকত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ রাজনীতি বিকাশ ও জনপ্রিয়তা, কমল কুড়ি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ একুশ বইশেলা ২০০৩।

৩২.বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

৩৩.মামুদ শাহ কোরাইশী ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি (রাজশাহী ১৯৭৯)। (সম্পাদক)

৩৪.জাতীয় সংসদ, বির্তক, খন্ড ১, সংখ্যা ৬ (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা ২৯২।

৩৫.গণপরিষদ, বিতর্ক , খন্ড ২, সংখ্যা ৯ (২৫ অক্টোবর, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৬।

৩৬.আহমদ. মওদুদ, গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ পেক্ষাপট : বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামিরক শাসন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথমপ্রকাশ- ২০০০।

৩৭.রহমান, মতিউর, মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি বাংলদেশ ১৯৯২-২০১২, প্রথমা

প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ অমর একুশ বই মেলা-২০১৪ ।

৩৮.রশীদ, হারুনুর, গণতন্ত্র বনাম দলতন্ত্র, অফসার ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৩। রাজনীতি কোষ, মাওলা ব্রাদ্রার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

৩৯.মনিরুজ্জামান, তালুকদার, বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০১।

৪০.মিঞা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা : সেকাল ও একাল, শিকড়,প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫৫।

৪১.মিন্টু, আবদুল আউয়াল, বাংলাদেশের পরিবর্তনের রেখাচিত্র, ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ-২০০৪।

৪২.রেহমান, তারেক শাসুর বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক,(সম্পাদিত) প্রথম খন্ড, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ন: পেক্ষাপট বাংলাদেশ, লেখক তারেক এম তরফীকুর রহমান। শোভা প্রকাশ, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৪।

বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড (সম্পাদিত)। প্রবন্ধ, বাংলাদেশের দুর্নীতি: একটি পর্যালোচনা, লেখক আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান। শোভা প্রকাশ, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৫৭।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত) প্রথম খন্ড, শোভা প্রকাশ,প্রকাশকাল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯৩। জোহরা আখতার এর প্রবন্ধ, সন্ত্রাসবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃষ্ঠা-২০১।

৪৩.আখতার,মুহাম্মদ ইয়াহইয়া দুর্নীতি নির্বাচন ও রাজনীতি : স্বরূপ বিশেষণ-সংকট উত্তরণ, (ঢাকা :পরমা, ২০০৩), পৃষ্ঠা,৫৫।

৪৪.শরীফ, আহমদ, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা, মহাকাল,প্রথম প্রকাশ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

৪৫.শাহনাওয়াজ,এ কে এম সমাজ- রাজনীতির এক দশক, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৪৬.ইসলাম, ড. নজরুল, বাংলাদেশ সন্ত্রাস, রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, মৌলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০।

৪৭.নাথ, বিপুল রঞ্জন, সরকারের সমস্যাবলি, বুক সোসাইটি,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭৫।

৪৮.কবির, হোসাইন আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদক মুস্তফা মজিদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, এপ্রিল।

৪৯.আসাদুজ্জামান ,মোহাম্মদ, ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাঠামো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, উত্তরণ, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর-আগস্ট-১৯৯৯।

৫০.সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আমলাতন্ত্র ও গণতন্ত্র (প্রবন্ধ), বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা মুস্তফা মজিদ।

৫১.মজিদ, মুস্তফা লোক আমলাতন্ত্র ঃ তাত্ত্বিক ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, নিবন্ধ সম্পাদনা মুস্তফা মজিদ, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র।

৫২.আবু তাহের খান, ম্যাক্সওয়েভারের আমলাতন্ত্রঃ একটি পর্যালোচনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৪।

৫৩.ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, কলাম, আমলাতন্ত্রের আমলনামা, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি২০০২।

৫৪.আজাদ, হুমায়ুন, রাজনৈতিক প্রবন্ধসমগ্র, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম,রাজনৈতিক প্রবন্ধ সমগ্র, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৬১০।

৫৫.শরীফ, আহমদ; অপ্রকাশিত রানৈতিক ও অন্যান্য রচনা রাজনীতির সঙ্কট;মহাকাল; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

৫৬.সিদ্দিকি, ড. রেজোয়ান, গণতান্ত্রিক পরিবেশ আওয়ামি লীগের রাজনীতি, মনি পাবলিশার্স,প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টম্বর ১৯৯৫।

৫৭.ছফা, আহমদ, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি -২০১১।

৫৮.আরেফিন, এ কে. এম. সামসুল, ২০০৩, বাংলাদেশর নির্বাচন, ১৯৭৩-২০০১, বাংলাদেশ রিসোর্স এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৫৯.মালেক, ডা. এস এ,	বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা,২০০৯, ।
৬০.শফিক, মাহমুদ	জনগণ সংবিধান নির্বাচন, অনন্যা, বাংলাবাজার , ঢাকা,প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৬।
৬১. হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আবুল	বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, '৯১, ঢাকা।
৬২.মাসুম , প্রফেসর ড.আব্দুল লতিফ	জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট, পৃষ্ঠা ১৪৮, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ২০০২ইং।
৬৩.সাঈদ , আবু আল	আওয়ামী লীগের ইতিহাস , ১৯৯৬, ঢাকা।
৬৪.উমর, বদরুদ্দীন	পূর্ব বাংলার রাজভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৭০।
	পূর্ব বাঙার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫।
	বাংলাদেশের রাজনীতির হিসাব নিকাশ, আফসার ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-এপ্রিল ২০০৮।
৬৫.রহমান, মোঃ এখলাছুর	২০১০, বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যাসিক ও সাম্প্রতিক প্রবণতাঃ একটি বিশেষণ, বাংলা ভিশন, ভল্যুয়ুম ঃ ১, ১ মে, ২০১০।
৬৬.মনিরুজ্জামান, তালুকদার,	বাংলদেশের রাজনীতি সংসকট ও বিশেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০১।
৬৭.ড. এনামুল হক,	ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।
৬৮.স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান,	বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন শোগান প্যাকার্ড ও পোস্টার, বাংলাদেশ চর্চা; প্রথম প্রকাশ :মে ২০০৮।
৬৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত,	বাংলাদেশের ইতিহাস , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০০।
৭০.বিপান চন্দ্র,	স্বাধীনতা সংগ্রাম ; ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট অব ইন্ডিয়া; দিলী , ১৯৭২।
৭১.কামরুদ্দিন আহমেদ,	বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা,

১৩৮২।

৭২.আহমেদ আলী , আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ঢাকা।

৭৩.মাযহারুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

৭৪.এ এফ এম আব্দুল জলিল, পাঁচ হাজার বছরের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, কাকলি পাবলিসার্শ,খুলনা, ১৯৭৫।

৭৫.ডঃ মোহাম্মদ হাননান, হাজার বছরের বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৭।

৭৬.খান, আবু সাঈদ, স্লোগানে স্লোগানে রাজনীতি, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

৭৭.হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশর স্বাধীনতার যুদ্ধ দলির পত্র, (সম্পাদিত,)২য় খন্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের তথ্য মনত্রণালয়।

৭৮.কৃত্তি রাজ ওং, আমি শেখ মুজিব বলছি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৭৯.আসাদ, আবুল, একশ, বছরের রাজনীতি, বিসিবিএস , ঢাকা, ২০০৫।

৮০.হোসেন, ডা. শাহাদাত , জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৃতীয় সংস্করণ ; সেপ্টম্বর ২০০৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৮১.মোহাম্মদ, ড. হাসান, বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থ মেলা, ঢাকা, ২০০৩।

৮২.রবার্ট এ. ডাল, আধুনিক রাষ্ট্রনীতি বিশেষণ, গোলাম মঈনউদ্দীন অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

৮৩.মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, রাজনৈতিক সংঘাত, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬।

৮৪.সাহাবুল হক ও বায়েজীদ আলম , বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪, , অবসর, প্রকাশ; বইমেলা ২০১৪ ।

৮৫.আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫।

৮৬.শ্যামলী ঘোষ, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১, দি ইউনিভর্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০১৩।

৮৭.মুসা আনসারী, বামপন্থী রাজনীতি, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১

(সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রথম খন্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫২৩।

৮৮.ফায়েক উজ্জামান, মোহম্মদ — মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮।

৮৯.রহমান, মাহবুবুর — বাংলাদেশের ইাতহাস ; ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশ, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০।

৯০.সরকার, মোনায়েম — সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

৯১. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, — রাজনীতির তিনকাল, হাফেজা মাহমুদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০০।

৯২.সালাহউদ্দীন, আহমদ মোনায়েম সরকার এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর — বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১,(সম্পাদিত) আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্র্ য়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা : ১৬৯।

৯৩.হাসান মোহাম্মদ, — বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থমেলা, ঢাকা, জুন ২০০৩।

৯৪.খসরু আমির — সামরিক শাসন এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, এফ. রহমান প্রকাশিত, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

৯৫.রহিম, খন্দকার আবদুর, — শতাব্দীর জননেতা মাওলানা ভাসানী, ৪র্থ খন্ড, খন্দকার প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৩।

৯৬.হাননান, মোহাম্মদ, — বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : বঙ্গবন্ধুর সময়কাল, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০০।

৯৭.সাহা, অসীম কুমার, — বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৯৮.আলী রিয়াজ, — শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি২০০১।

১০০.দাস ,নিতাই ও ফরহাদ, মোহাম্মদ — জীবন ও সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১০১.জিবলু রহমান, ভাসানী -মুজিব-জিয়া (১৯৭২-১৯৮১), শুভ প্রকাশন, ঢাকা, মে ২০০৪।

১০২. আজাদ, আবদুর রহিম শাহ, ও আহমেদ রেজা, বাংলাদেশ রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবণতা (২১ দফা থেকে ৫ দফা) সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, জুন ১৯৮৭।

১০৩.খান,এম সলিমুলাহ চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশের বাম রাজনীতি, সরকার ও রাজনীতি, গোলাম হোসেন সম্পাদিত, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা।

১০৪.হোসেন, আমজাদ, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, পড়ুয়া, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৬।

১০৫. রহমান, তারেক মুহাম্মদ তরফীকুর বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২- ২০০১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৮।

১০৬.আমিন ,রহুল খালেদা জিয়া: স্বৈরাচার বিরোধী আন্দালন ও মূলধারার নেতৃত্ব, হীরা বুকমার্ট, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

১০৭.হোসেন ,গোলাম ও তৌফিক আহমদ, নির্বাচন ও গণতন্ত্র, সরকার ও রাজনীতি, গোলাম হোসেন সম্পাদিত, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ২৫৯।

১০৮.মাহমুদ, মো: সুলতান বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমস্যা একটি পর্যবেক্ষণ মুলক সমিক্ষা।

১০৯. রহমান, এম টি তারেক বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

১১০. পাটোয়ারী, মমতাজউদ্দীন ফখরুদ্দীন সরকারের ২ বছরের খন্ডচিত্র, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

১১২. করিম, রেজাউল আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কিছু কলাকৌশল, প্রথম আলো, ২০ মে ২০০১।

১১৩. আকতার, মুহাম্মদ ইয়াহিয়া অভিনব সরকার ব্যতিক্রম নির্বাচন, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৯।

১১৪. খান, মিজানুর রহমান সংবিধান ও তত্ত্বধায়ক সরকার বিতর্ক, ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১১৫.আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ, ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাঠামো প্রেক্ষিত বালাদেশ, উত্তরণ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯।

১১৬. আব্দুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

১১৭.খান,আতাউর রহমান স্বৈরাচারের দশবছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০, ঢাকা।

১১৮. বঙ্গমান, আবদুল আজিজ স্বাধীনতার স্বপ্ন, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, ঢাকা।

১১৯. মুকুল,এম আর আখতার ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯, ঢাকা।

১২০. চৌধুরী, আব্দুল গাফফার "বাংলাদেশ কথা কল্প" মুক্তধারা, ১৯৭১, ঢাকা।

১১৩. এম এম আকাশ, ভাষা আন্দোলন শ্রেণী ভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবনতামূলক, ইউনিভার্সিটি, প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০, ঢাকা।

১১৪. ওয়াকিদা আহমদ, বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ঢাকা।

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ঢাকা।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা।

১১৫. ওয়ালি উলাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, ঢাকা।

১১৬. জেমস ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ, মুদ্রণ এনা প্রিন্টার্স লিমিটেড, ১৯৯৮, ঢাকা।

১১৭. কামরুদ্দীন আহমদ, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর কিতাবিস্তান, ১৯৮২,ঢাকা।

১১৮.কৃত্তিবান ওঝা, আমি মুজিব বলছি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২, ঢাকা।

১১৯.তোফায়েল আহমদ, যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২, ঢাকা।

১২০. নওহরি কবিরাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামের বাংলা, বাণী প্রকাশ, ১৯৭৬, ঢাকা।

১২১ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ঃ সমাজ ও রাজনীতি, মৌল প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা।

বাংলাদেশ ঃ অন্য আলোয় দেখা, মৌল প্রকাশী, ২০০১, ঢাকা।

১২৩. নুরল ইসলাম মঞ্জুর, বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধাক্কা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, ঢাকা।

১২৪.অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ মিঞা, অনুদিত, রুশোর, সমাজ সংস্থা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, ঢাকা।

১২৫. এস এম বিপাশ আনোয়ার, জিয়াউর রহমানের নির্বাচিত ভাষণ, ধারনী সাহিত্য সংসদ, ২০০২, ঢাকা।

১২৬. বদরুদ্দীন আহমদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬, ঢাকা।

১২৭. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ জাতীয়তাবা এবং মৌলবাদ, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, ঢাকা।

১২৮.মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতাদি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২, ঢাকা।

১২৯.মাহফুজ উলাহ, অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩, ঢাকা।

১৩০.মাযহারল ইসলাম, বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, ঢাকা।

১৩১.মোহাম্মদ মনিরজ্জামান মিঞা, রাজনিতির বাইরে নয়, কাকলী প্রকাশনী, ২০০০, ঢাকা।

১৩২. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, ঢাকা।

১৩৩.মোস্তফা কামাল, ভাষা আন্দোলনের ডায়েরী, শতদল প্রকাশনী লিঃ, ১৯৮৯, ঢাকা।

১৩৪.আর এম ম্যাকাইভার; আধুনিক রাষ্ট্র, এমাজউদ্দীন আহমদ অনুদিত, বাংলা একাডেমী,

১৯৭৭, ঢাকা।

১৩৫.রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

১৩৬.রীতা পারভীন, ‘বালাদেশের গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৮৬, ঢাকা।

১৩৭.শাহরিয়ার কবির, বাংলাদেশ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, অনন্যা, ১৯৯৭, ঢাকা।

১৩৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙালির জাতীয়তাবাদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০, ঢাকা।

১৩৯. সাঈদ উর রহমান, অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশ, মৌলি প্রকাশনী, ২০০০, ঢাকা।

১৪০.সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার ইতিহাস ওপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, ঢাকা।

১৪১. সিরাজুর রহমান, ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, শিকড়, ২০০২, ঢাকা।

১৪২. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, ঢাকা।

১৪৩. সৈয়দ আলী লাকী, সমাজবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি, মৌলি প্রকাশনী, ১৯২৬, ঢাকা।

১৪৫. প্রফেসর সালাউ উদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, নুরল ইসলাম, বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১৪৬. সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, কলিকাতা, জি, এই পাবলিশার্স, ১৯৬৮।

১৪৭. সুকান্ত একাডেমি সম্পাদিত, ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তধারা, ১৯৭৮, ঢাকা।

১৪৮. সাঈদ-উর রহমান — (সংকলন ও সম্পাদনা), মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভাষণ ও বিবৃতি, জাগৃতি প্রকাশনি, ২০০০, ঢাকা।

১৪৯. সিরাজুল ইসলাম — বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৬, ঢাকা।

১৪০. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, — সমাজ পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

১৪১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান, — বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, সিটি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯১, ঢাকা।

১৪২. হাসানউজ্জামান, — সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, নলেজ ভিউ, ১৯৭৮, ঢাকা।

১৪৩. হারন-অর-রশিদ, — স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট এবং কিছু তথ্য, আফসার ব্রাদার্স-২০০১, ঢাকা।

১৪৪. মোঃ হাবিবুর রহমান খান, — বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, সিটি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯১, ঢাকা।

১৪৫. হ্যারল্ড লাসকি, — রাজনীতির গোড়র কথা, এম এ ওয়াদুদ ভুইয়া অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, ঢাকা।

১৪৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, — নির্বাচিত প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ, ২০০০, ঢাকা।

১৪৭. মেজর জেনারেল (অবঃ) এম এ মতিন বীর প্রতীক, পিএসসি — আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যূত্থান, ৯৬, জ্ঞান বিতরণী, ২০০১, ঢাকা।

১৪৮. আখতার হামিদ খানে — পলী উন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, (বক্তৃতা সংকলন) সম্পাদনায় মোহাম্মদ লুৎফল হক, মুক্তধারা, ১৯৭৭, ঢাকা।

১৪৯. গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান পানিং বোর্ড, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৫৪ ৬০ (খসড়া)

১৫০. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আবু সাইদ, রফিক আজাদ, সেলিম হোসেন, সম্পাদনা পরিষদ, ১৪০০ সাল বাঙালি বাংলাদেশ শতাব্দীর পরিক্রমা, ঢাকা, ১৪০০ সাল উদযাপন পরিষদ, ১৪০০।

151. A F Salauddin Ahmed, Bangladesh Tradition and Transformation, Dhaka. U.P.L.1982.

152. Dilara Choudhury, Constitutional Development in Bangladesh : Stresses and Strains, Dhaka, University Press Limited, 1995.

153. Emajuddin Ahmed, Military Rule and the Math of Democracy, Dhaka University, Press Limited, 1988.

------------ Society and Politics in Bangladesh, Dhaka, Academic publishers, 1989.

154. Golam Hossain, General Ziaur Rahman and the BNP, Dhaka, UP-1988.

155. Maniruzzaman, Millitary with drawal from politics : A Comparative Study. Dhaka, Ballinget Publishing Company.

156. Md. Abdul wadud Bhuiyan, Emergence of Bangladesh and Role of Awami League, Dhaka. University Press Limited, 1982.

157. Moudud Ahmed, Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy, Dhaka University Press Limited, 1991.

158. Muhammad Abdul Wahhad, æThe Rural Political Etite in Bangladese, A study of leadership patterns in six union porishads of Rangpur district.

159. Ranglal Sen, Political Elites in Bangladesh, Dhaka. University Press Limited, 1986.

160. Talukder Maniuzzaman, Miltary with drowal from Politics : 4 Comparative Study, Dhaka, University Press Limited 1988.

161. Rounaq Jahan, Bangladesh Politics : Problems and Issue, Dhaka : UPL 1980

162. Rounaq Jahan , Bangladesh Politics : Problems and Issue, Dhaka : UPL 1980,

163. Al Masud Hasanuzzaman, Registration and Reforms of Political parties in Bangladesh, MSS/SRG/LSSP, Dhaka, October, 2003.

164. Shamsul I. Khan, et.al., Political culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh, Dhaka : UPL, 2008.

166. Tusar Kanti Barua, Political Elites in Bangladesh; A Socio-Anthropological and Historical Analysis of thier, Formation, Bern: Peter Lang, 1978.

167. Najma Chowdhury, The legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Leslature, 1947- 1958, The University of Dhaka

Haq, Abul, 2009, The Ninth Parliament Electtion: A Socio-Political Analysis, Dhaka.

168. Talukder Maniruzzaman, cited in Military Withdrawal from Politics: Acomparative Study (cambridge, Massachusetts, 1987).

169. Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal from Politics : A Cpmparative Study, Dhaka, University Press Limited, 1988.

170. Moudud Ahmed, Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy, UPL, Dhaka, 1999.

171. Ahmed, Moudud, Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL, Dhaka , January, 1991.

172. Talukder Maniruzzaman, Group Interest and Political Changes: Studies of Pakistan and Bangladesh, Sucheepatra 2004.

173. Moudud Ahmed, Democracy and challenge of development, Dhaka: The University Press limited ,1995.

174. Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and The Emergence of Bangladesh, Mowla Brothers, Dhaka, February 2003.

175. Mizanur Rahman Shelley, Emergence of New Nation in a Multi-Polar World Bangladesh, Academic Press and Publishers Library, Dhaka 2000.

176. Talukder Maniruzzaman. The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, UPL, Dhaka- 2003.

177. Al Masud Hasanuzzaman, Rol of Opposotion in Bangladesh Politics,UPL, P-49

178. Gabriel Almond and G. Bingham Powell, Jr. Comparative Politics. A Development Apploach. Boston, Little Brown and Co 1966.

179. Gabriel Almond adn Sidney Verba, The Civic Culture Praceron University Press 1963.

180. Gabriel Almond, Comparative Political System Icarnal of Politics, 1956.

181. Hendrik Van Dalen, Introduction of Political Science, Lamon Zeigier University of Oregon.

182. James S. Coleman, Education and Political Development, Princeon University Press, 1965.

183. K.Ali. Bangladesh A New Nation, Dhaka, Ali Publications, 1982.

184. Lawrence Zring, Bangladesh From Mujib to Ershad An Interpretive Study, Dhaka, University Press Limited, 1992.

185. Mauriice Duverger, Political Parties, London, Methuon and co. 1954.

186. Myron weiner, 'Political Integration and political development' Annals, 1965.

187. Qutoed in white stephen, Political Culture and Soviet Politics, London, The Macmillan Press Ltd, 1979.

188. Richard R. Ragen, The Transformation of Political Culture in Cubu California, StamfordUniversity, StamfordUniversity, Stamford, 1969.

189. Samuel H. Beer, 'The Analysis of Political System' in Samuel 11 Race and

190. Alam B Ulam (eds), Patterns of Government 2nd Ed. N.Y Randon House 1962.

191. H. S. Maine, Popular Government

192. J. Bryce, Mordern Democracies, Vol. 1

193. C. E. Marriam, The New Democracy and The New Desposition

194. Walter Lippmann , Public opinion

195. A. D. Lindsay, Essentials of Democracy

196. H. J. Laski, Democracy, in Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 5

197. Professor Maclver, The Web of Government

198. S. P. Huntington, Plitical Order in Changing Societies, New Haven : London: Yale University press , 1968

199. John Locke, of Civil Government (Chicago, 1962), Chapter 19.

200. J. S. Schumpeter, Captalism, Socialism and Democracy, 1951

201. H. J. Laski, Parliamentary Government in England, 1951

202. C. J. Freiderich, Constitution, Government and Democracy.

203. R. M. Maclver, The Modern State , Ch. 13.

204. R. M. Maclver, The Modern State

205. Almond Gabrial, Comparative Political Systems; Journal of politics

206. L. W. Pye and Verba, end. Political Culture and Political Development, princeton University. 1965 ,

207. Noman Wilding and Philip Laundy, An Encyclopedia of Parliament, London: Cassel,1968

208. S.E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, London 1962;

209. Morris Janowitz, The military in the political Development of new Nations, Chicago 1964;

210. John Johnson (ed), The Role of the Military in Underdeveloped ountries,Princeton 1962;

211. Alan R Ball, Modern Politics and Government, London 1978.

212. S. E. Finer, The Man on Horseback (London, 1968).

213.S. P. Huntington, Political Order in a Changing Society (London, 1968)

214. Shymamali Ghosh, The Awami league 1949-1971, Dhaka 1990.

215. Norrnan D. Oalmer, Election and Political Development: The South asian experience. Vikas, Nwe Delhi, 1976.

১১.২ জার্নাল

Larry Dimond,	Three Pradoes of Democracy, Journal of Democracy, Summer, 1990
Samuel P. Huntington	Democracy's Third Wave (1991), Journal of Democracy, Spring , 1991.
Md. Ataur Rahman	A Turning Point for the Military' Asian survey, vol 24, No. 2, February, 1984
Hakim & Huque	Constitutional Amenments in Bangladesh; Regional Vol,12, Spring, Studies, 1999,
Abul Fazal Huq	Contemoporary Politics and the radical left in bangladesh, The journal of the institute of bangladesh studies vol. 111, 1978.
Golam Hossain,	Bangladesh in 1995 : Politics of Intransigens, Asian survey, vol:36, No:2, ,(February 1996), p: 196-203.
M Rasiduzzaman	Bangladesh in 2000 : Searching for Better Governance, Asian Survey, Vol. 31 No. 1, January-February , 2001) p: 122-130.
M Rasiduzzaman	Bangladesh in 2000 : Searching for Better Governance, Asian Survey, Vol. 31 No. 1, (January-February , 2001) p: 122-130.
A. Rob Khan & F Kabir	Civil Society in Bangladesh and its Empowerment, Dhaka.
Chowdhury Najma	The legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Leslature, 1947-1958, The University of Dhaka, 1982.
Talukder Maniruzzaman	cited in Military Withdrawal from Politics: Acomparative Study, Cambridge Massachusetts, 1987 , p.1-2.
Choudhury and Hasanuzzaman	Constructive Alternatives to Hartal; Beyond Hartals Towards a democratic Dialogue in Bangladesh, UNDP, Dhaka-2005, Page -69-70.

Ahmed Imtiaz (ed)	Understanding Terrorism in South Asia : Beyond Statist Discourse, Manohar , 2006, Page – 18.
Abul Barakat in Harun-or-Rashid(ed).	"Economics of Fundamentalism and the growth of political Islam in Bangladesh", Social Science Review, vol.23, Nor 2, December 2006 Page 24-25
Imtiaz Ahmed	On the Brink of precipice : Contemporary Terrorism and the limits of the stares, Bangladesh Foundation for development Research, Dhaka, 25.
Zohra Akhter,	Trends in Militancy in Bangladesh, August 2007- May 2008, The Paper Presented in a National Seminar on Trends in Militancy in Bangladesh : Possible Responses by Bangladesh Enterprise Institute, , on 11 June 2003.
Mussarat Jabeen, Amir Ali Chandio and Zarina Qasim.,	Language Controversy : Impacts on National Politics and Secession of East Pakistan, South Asian Studies Vol. 25, No. 1 (2010), pp; 99-124
S.A . Aakanda	The Working of the Ayub Constitution and the People of Bangladesh, The Journal of the institution of Bangladesh, Vol. 4(1979-80), Page; 91.
মোঃ মেফতাউল করিম, রহমান মোঃ শফিকুর (সম্পাদনায়),	" দক্ষিণ-পশ্চিামঞ্চালে চরমপন্থী তৎপরতা । র‍্যাবের কার্যক্রম", র‍্যাব প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জার্নাল,২০০৮ (ঢাকা : ২০০৮),পৃষ্ঠা ৩৭।
মোঃ সুলতান মাহমুদ	বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমস্যা একটি পর্যবেক্ষণ মুলক সমিক্ষা, evelopment Compilation, Vol. 07. No. 01 (June 2012), পৃষ্ঠাঃ ১৪.

The Fate of Human Right in the third World', World World Politics Vol. XXVII, 1975, P. 208

Bhuyan, M. Sayefullah,Political Culture in Bangladesh, Dhaka University Journal.

Muniruzzaman, Talukder, The politics of Development the case of pakistan 1947-1958, Green Book House Limited, Dhaka.

Dilara Choudhury, Constitutional Development in Bangladesh: Stresses and Strains, Dhaka: UPL , 1995.

১১.৩ নির্বাচনী ইশতিহার

- ✓ জাতীয় সমাজতন্ত্রিক দল, ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭৩;
- ✓ শ্রমিক-কৃষক সমাজকবাদী দল, নির্বাচনী ঘোষণাপত্র,১৯৭৩;
- ✓ ন্যাপ (ভাসানী), নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭৩;
- ✓ বাংলদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি(লেনিনবাদী), ঘোষণা পত্র ১৯৭২, কমরেড সংখ্যা, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩;
- ✓ বালাদেশ কম্যনিস্ট পার্টি, নির্বাচনী ঘোষণা, ১৯৭৩।
- ✓ বাংলদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি, ঘোষণা ১৯৭৩,
- ✓ ন্যাপ (মোজাফ্ফর), নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১.৪ পত্র পত্রিকা ও সায়য়িকী

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ নবেম্বর, ১৯৯১
ইত্তেফাক, সংবাদ, ৫ এপ্রিল, ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ এপ্রিল, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মার্চ, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ৪, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ১৩, ২০০২
ইত্তেফাক রিপোর্ট, মার্চ ৪, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ০৯ জুলাই ১৯ ৯৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ আগস্ট ১৯৯৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মে, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, চতুরঙ্গ, ৩০ জানুয়ারী ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি২০০২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর,
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মে ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ২০১১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ডিসেম্বর, ২০০১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ডিসেম্বর, ২০০১

দৈনিক সংবাদ

দৈনিক সংবাদ, ৫ এপ্রিল, ১৯৭৮
দৈনিক সংবাদ, ৫ মে, ১৯৭৮
দৈনিক সংবাদ, ৫ নভেম্বর, ১৯৭৮
দৈনিক সংবাদ ১১ নভেম্বর, ১৯৯১
দৈনিক সংবাদ ৩১ মে, ১,২,৩, জুন ১৯৮১
দৈনিক সংবাদ, ১ মার্চ, ১৯৯১
দৈনিক সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯
দৈনিক সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০১
দৈনিক সংবাদ, ১৯ মার্চ, ২০০২
দৈনিক সংবাদ, ১ মার্চ, ১৯৯১
দৈনিক সংবাদ, ৮ মে ১৯৮৬

দৈনিক যুগান্তর

দৈনিক যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ২০০৫
দৈনিক যুগান্তর, ৫ জানুয়ারী ২০০৮
দৈনিক যুগান্তর, ৩০ আগস্ট, ২০০৫
দৈনিক যুগান্তর. ১৮ নভেম্বর ২০০৫
দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ আগস্ট, ২০০১
দৈনিক যুগান্তর , ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০০৩
দৈনিক যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩
দৈনিক যুগান্তর, ২৭ আগস্ট , ২০০৩
দৈনিক যুগান্তর, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৩
দৈনিক যুগান্তর ,৭ও ৮ আগস্ট, ২০০৪
দৈনিক যুগান্তর , ১ নভেম্বর ২০০৫
দৈনিক যুগান্তর, ১৯ মার্চ, ২০০২

দৈনিক প্রথম আলো

দৈনিক প্রথম আলো ১৩ অক্টোবর ২০০১
দৈনিক প্রথম আলো, ঈদ সংখ্যা-২০০৪
দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯
দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন, ২০১০
দৈনিক পথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯
দৈনিক প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০৯
দৈনিক প্রথম আলো, ৭,অক্টোবর ২০০৯
দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মে, ২০০২

দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুলাই,২০০৪
দৈনিক প্রথম আলো, ১৩, মার্চ, ২০০২
দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ জুন ১৯৯৯

The Daily Star

The Daily Star, 10 May,1996
The Daily Star, 12 March,1996
The Daily Star, 25 August, 2011
The Daily Star, 19 March, 2012
The Daily Star , 26 April,2011
The Daily Star, 1 January 2009
The Daily Star, 7 January 2009

The Bangladesh Observer, 9 March, 1973

The Independent, 31 December, 2008

Banladesh Time, 26 June, 1980

New Age, February 13, 2007

দৈনিক জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মে, ২০০২
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ অক্টোবর, ২০১১
দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ মার্চ, ২০০২

দৈনিক আজকের কাগজ

দৈনিক আজকের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১
দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ মে, ১৯৯৬
দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ মে, ১৯৯৬
দৈনিন আজকের কাগজ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০১
দৈনিক ইনকিলাব ৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

দৈনিক বাংলা, ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৮
দৈনিক খবরপত্র, ৫ জানুয়ারি, ২০১০

দৈনিক খবরের কাগজ, ১১ জুলাই, ১৯৯১
দৈনিক আমার দেশ, ২০১০, জানুয়ারি ২৬
দৈনিক মানবজমিন, ৩০ সেপ্টম্বর , ২০০০

Magazine

Holiday,, 21 Ocyober,1988

Holoday, 16 November 1975

Holoday 21 December, 1975

Dhaka Courier, 18, February , 2000

Dhaka Courier, 12, March ,1993

Weekly Satyakatha, October 27, 1972

সাপ্তাহিক

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৪১ সংখ্যা, ১৯ মার্চ, ১৯৮৮

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ নভেম্বর , ১৯৯১

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯ নভেম্বর, ১৯৯১

সিলেটের ডাক, ১৭ অক্টোবর ২০০৬

আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১২ মার্চ ১৯৪৮

সৈনিক , ৯মার্চ ১৯৫২

রোববার (সাপ্তাহিক), ৬মার্চ, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

১১.৫ জরিপ, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন

১. বাংলাদেশে দুর্নীতি : একটি খানা জরিপ, ২০০৫, টিআইবি

২. দি স্টেট অব গর্ভনেন্স ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ২০০৮

৩. করাপশন ডোঁবেজ রিপোর্ট, ২০০৫

৪. Bangladesh Parlament : A handbook(ঢাকা, ১৯৭৪),

৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সদস্যদের বৃত্তান্ত (ঢাকা,১৯৮১); মোস্তফা হারুন (সম্পাদক), Who's Whoin Parliament (Dhaka,1979),

৬. আহমদ উলাহ, পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য : প্রামান্য গ্রন্থ (ঢাকা, ১৯৯২);

৭. Transperancy International Bangladesh (TIB), Report : Parliament Watch (Dhaka, 18 December,2003);

৮. নবম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

৯. Abul Haq, The Ninth Parliament Electtion: A Socio-Political Analysis, 2009, Dhaka, P-22.

১০. Bomb & Grenda Explosions : And other Forms of violence by Religiou Militants in Bangladesh,(South Asians for Human Right) Nov. 2006, Page 33-34.

১১. Muzaffer Ahmed, The caretaker Government for free and fair Selection: Active vents and Challenges; International conference on Electoral Processes and Governance in South Asia, ICSE, Kandy, Colombo, 21-23 june, 2002 page 8.

১২. আদমশুমারী রিপোর্ট ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১০,৬৩,১৪,৯৯২ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫,৪৭,২৮,৩৫০ জন, হমিলা ৫,১৫৮৬,৬৪২ জন। **বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো,** (আদমশুমারী রির্পোট ১৯৯১ খৃ.) মে ১৯০৪ খৃ. প্রকাশিত।

১১.৬ অভিধান এবং প্রবন্ধ

❖ ড. এনামুল হক, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১০৫৯।

❖ The Random house Dictionary of the English langage

❖ A.T. Dev Student Favourite Dictionary, Dev Sahitya Kutir, Kolkata, 1997

❖ Sailendra Biswas, Samsad English-Bangla Dictionnary, Sahitya Samsad, Kollata, 1959, P-1059

❖ বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলনে জেনারেল এম. ইউ. আহমদ উপাস্থাপিত মূল প্রবন্ধ “The Challenging Interface of Democracy and Society” (ঢাকা,২ এপ্রিল, ২০০৭), থেকে উদ্বৃত।

❖ বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলনে রাষ্ট্রজ্ঞিান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আতাউর রহমানের স্বাগত ভাষণ।

❖ সভাপতি কাজী ফজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নামে প্রচারিত ” প্রশাসন সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ” ১৭.০১.১৯৮৮ শীর্ষক লিফলেট অবলম্বনে।